মৈত্রেয়ী দেবী

আরোগ্য নিকেতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচেনা চীন

মৈত্রেয়ী দেবী

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণীয়

শ্রীমান প্রিয়দর্শীকে

'মা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ সপ্তাহের জন্য মাত্র চীন দেশে গিয়েছিলাম। ঐটুকু সময়ের মধ্যে একটা দেশ সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানা যায়? বিশেষত যে দেশ স্থানেকালে বহুবিস্তৃত। যে দেশের ইতিহাস যত পুরনো সে দেশের সমাজসংস্কার সব কিছুই তত জটিল। বোঝা কঠিন। শুধু তাই নয়, সেই অতিপ্রাচীন চীন নতুন হয়েছে যে মন্ত্রে সে মন্ত্রে দীক্ষিত নই বলে সে নূতন ভাষার সম্পদও আমার নেই। অর্থাৎ পুরাতন ভাষাও জানি না, নূতনও নয়। এ গেল জীবনের ভাষার কথা, আবার মুখের ভাষাও তো একেবারে অন্য—দোভাষীর সাহায্য ছাড়া একটি বাক্যও বুঝতে পারব না, একটি লাইন পড়তে পারব না—এ অবস্থায় আমাদের দেখা যেন একটা ঝাপসা কাঁচের আবরণের মধ্য দিয়ে দেখা। অন্তত প্রথম সাতদিন সেইরকমই অসহায় মনে হয়েছিল আমার। তারপর আস্তে আস্তে কখন চোখের আবরণ কাটিয়ে মনের দরজার উপস্থিত হতে লাগল নানা ভাব, নানা চিন্তা, কখন থেকে আমার মনে হল আমি খানিকটা চিনতে পারছি, বুঝতে পারছি—তা সঠিক বলতে পারব না।

আজ এই পথের শেষে এসে সামনের দিকে তাকাতে গেলে শুধু সামনের দৃশ্যই চোখে পড়ে না, বারবার ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অতীতের দৃশ্যও ভেসে ওঠে, মিলে মিশে যায়। অনেক দেশ দেখেছি আমি, যদিও একসঙ্গে দীর্ঘদিন কোথাও থাকিনি। আমেরিকায় তিন মাস ছিলাম, এর চেয়ে একসঙ্গে বেশীদিন ইওরোপেও থাকা হয়নি। যখন যেখানে গিয়েছি, আমি চেষ্টা করেছি তার 'পজিটিভ' দিকটা দেখতে, 'নেগেটিভ'টা নয়। 'মিস মেয়ো' হবার চেষ্টা করিনি তবে মন্দটাও মাঝে মাঝে চোখে পড়েছে। আজকে তাই লিখতে গেলে কতগুলি তুলনা স্বাভাবিকভাবেই মনে এবং কলমে এসে যাবে। তার কতটা গ্রাহ্য কতটা অগ্রাহ্য আমার চেয়ে অভিজ্ঞ পাঠকেরা মনে মনে বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করবেন।

দু'বার সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়েছিলাম—প্রথম ১৯৫৫ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৬২ সালে। ১৯৫৫ সালে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট-ভীতি ছিল প্রচণ্ড। 'রাশিয়ার চিঠি' লেখার পঁচিশ বছর পরেও। এই ভীতির প্রচণ্ডতর রূপ দেখে এসেছিলাম পশ্চিম ইওরোপে ১৯৫৩ সালে। ভীতি নিয়েই রাশিয়ায় ঢুকেছিলাম আমি। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রীতির বন্যায় সে ভয় খড়কুটোর মত মুহূর্তে ভেসে গিয়েছিল। মস্কো স্টেশনে ফুলের তরঙ্গে আমরা ভাসতে ভাসতে চলেছি, এক বৃদ্ধা আমার শাড়ির জরির পাড় চুম্বন করে বলেছিলেন, "কতদিন আমরা বিদেশের মানুষ দেখিনি—You have walked out of fairy tales, you have walked out of Arabian nights"

ফিরে এসে আমি 'মহা সোভিয়েত' বই লিখেছিলাম। খুব সাহস সঞ্চয় করেই লিখতে হয়েছিল। রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ-প্রচেষ্টার প্রশংসা করে যখন লিখি তখন 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদক লিখেছিলেন, কমিউনিস্ট দেশের বড় বেশী প্রশংসা হয়ে গেছে—একটু কমিয়ে দেবেন কি? আমি কমাইনি। পরে রুশ দেশের সঙ্গে যখন সরকারী সদ্ভাব ঘটল তখন অন্যরা সেটা বাড়িয়েছিলেন যখন অনুবাদকারিণী ভেরা নভিকভা রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন। ভেরা নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ করেছিলেন। নভিকভা তখন ভাল বাংলা জানতেন না, অনেক মজার মজার 'হাউলার' তৈরী হত। প্রথম যেদিন পৌঁছলেন—দোকানের গায়ে "এখানে স্নেহপদার্থ বিক্রয় হয়" পড়ে চমকে উঠেছিলেন। ক্যাপিটালিস্ট দেশের কেনাবেচা সম্বন্ধে তাঁর কিছু তথ্য জানা ছিল, তবে এতটা নয়। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমাদের দেশে স্নেহও বিক্রয় হয়?" ছয়-সাত মাস ধরে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদের কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তুমি বিনামূল্যে এ কাজ করবে কেন? আমি বলেছিলুম, সেটাও তোমাকে বুঝতে হবে—নইলে তুমি ভারতবর্ষকে বুঝতে পারবে না। আমি তো তোমাকে সাহায্য করছি না। এ আমার গুরুপ্রণাম। এই মূল্য এবং অমূল্যের বোধটা পাশ্চাত্ত্য দেশে বড়ই কম। যা হোক, আমার সেই প্রচেষ্টার কথা কোথাও স্বীকৃত হয়নি। ১৯৬২ সালে লেনিনগ্রাদে আবার নভিকভার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে দেখা হয়, তিনি লজ্জিত হয়ে বলেন যে, এতে তাঁর কোনো হাত ছিল না; তিনি বারবার বলেছিলেন, কিন্তু ওটা তখন 'পলিসি' ছিল না।

১৯৬২ সালে রাশিয়ায় কিছু কিছু জিনিস আমার লক্ষ্য হয়েছিল, যেসব কথা এখন শুনছি ও চীনে বিস্তারিত শুনলাম। কিন্তু তাই বলে আমি যা দেখেছিলাম তা আমার কাছে অন্তত মিথ্যা হয়ে যায়নি। বারবার সরকারের পরিবর্তন হয়, 'পলিসি'র পরিবর্তন হয়, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়, তাই বলে এক দিনের সত্য অন্য দিনে মিথ্যা হয়ে যায় না। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল যদি অনেক দূরে চলে এসেও থাকে, তা হলেও ১৯৫৫ সাল তো ছিল! তা ছাড়া সরকারের রীতিনীতির পরিবর্তন হলেও মানুষ অন্তরে মোটামুটি একই থাকে। চীনের কথা লিখতে বসে বারবার ১৯৫৫-র সোভিয়েত ভ্রমণ মনে পড়ে। তার প্রধান কারণ এই পরিবর্তনশীল জগতে ভারতের মানুষই বোধ হয় সবচেয়ে অপরিবর্তনীয়। 'মহা সোভিয়েত' লেখার পর সবাই বলতে লাগল, তোমাদের চোখ বেঁধে ঘুরিয়ে দিয়েছে। মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জি হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, আপনাদের দু'-তিনটে রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। আপনাদের চোখ বেঁধে ঘুরিয়েছে। আমাকেও ডেমোক্রেটিক জার্মানীতে ঐরকম করেছিল! তখন তাঁকে বলিনি যে, মন্ত্রীদের লোকে যত ভয় পায় সাধারণ লোককে তত পায় না। আমরা মেঠো রাস্তায়ও ঘুরেছি। তা ছাড়া কোনো নতুন দেশ দেখতে গেলে শুধু বাইরের চোখ দুটোই সব নয়—তৃতীয় চোখটিকেও উন্মুক্ত রাখা চাই। তাকে তো কেউ বাঁধতে পারে না।

চীন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এখনও সেই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। কেউ কেউ বলেছেন ঐ একই কথা—চোখ বেঁধে ঘুরিয়েছে। নিজের এবং পরের বুদ্ধিবৃত্তির উপর আস্থা না থাকাটা এদেশে একরকম দেশপ্রেমের লক্ষণ। অর্থাৎ, আমরা যা পারিনি, অন্য কেউ তা পারতে পারে না। এটা দীনতা, তার চেয়ে বরং যেখানে যে মানুষ যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তাকে গ্রহণ করা, বোঝা এবং সেটা আমারই জিনিস এই শ্রদ্ধা করাই মনুষ্যত্ববিকাশের পথ।

"যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞ যাগ
আমি তার লভিয়াছি ভাগ
যেখানে নিঃশব্দ বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে
স্থান মোর সেই ইতিহাসে"—

এই রবীন্দ্রবাণী আমরা গ্রহণ করিনি।

আমরা অল্প বয়সে যে চীনের কথা জানতাম, সে হিউয়েন-সাংএর চীন, ফা হিয়েনের চীন। আমার পিতার লাইব্রেরীতে শামন হুয়াই লি (Shaman whi li)-এর লেখা ও স্যামুয়েল বীল বি এ, ডি সি এল, লনডন ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসর অব চাইনীজ কৃত অনুবাদ—'দি লাইফ অব হিউয়েন সাং' নামে একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ পড়েছিলাম। এই বই পড়ে চীনের মানুষের কষ্টসহিষ্ণুতা, দার্ঢ্য ও নিখুঁত ঐতিহাসিক চেতনার নিদর্শন পেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম। ঐ সব ঐতিহাসিকদের ভারতের প্রতি গভীর ভালবাসার ও শ্রদ্ধার পরিচয়ও শত শত বছর ধরে চীনের প্রতি আমাদের প্রীতি অটুট রেখেছে। প্রত্যেক বালকবালিকাকে ইতিহাসের প্রথম পাতায় চীনের কথা জানতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে যান তখনকার কথা আমার ভালমত স্মরণ নেই। তবে ১৯৩৮ সালে চীনে জাপানী আক্রমণ চলছিল, যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু জাপানী কবি নগুচিকে ধিক্কার দিলেন তখন দেখেছি তাঁর চীনের প্রতি সহানুভূতি ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপের অনুসরণকারী প্রচেষ্টার প্রতি ঘৃণা। আর সেই সময়ে 'প্রবাসী'তে নিয়মিত ছবি সহকারে চীনের খবর প্রকাশিত হত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোথা থেকে সেসব ছবি যোগাড় করতেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সেই ছবিগুলি আমার মনে চিহ্ন রেখে গেছে—অধিকাংশ ছবিতেই দেখা যেত কোয়োমিনটাঙরা কমিউনিস্টদের মাথা কেটে সারি সারি দেয়ালের উপর সাজিয়ে রেখেছে, কিংবা জনপথের উপর সারি সারি কমিউনিস্টদের মৃতদেহ। সেই সময়ে বলা বাহুল্য, আমাদের সমবেদনা তাদের প্রতিই যেত, যাদের কাটা মাথা বা শবের সারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজানো আছে। এই ভয়াবহ নৃশংসতা যারা করেছিল জগতে কিন্তু তারা নিন্দিত হল না। নিন্দিত হল অপর পক্ষ। চিয়াং-কাই-শেক মুক্ত দুনিয়ার মুক্তহস্তের দানে স্ফীত হতে লাগলেন।

আজকে নতুন চীন দেখে পুরোনো চীনের কথা ফিরে ফিরে মনে আসে—আমি তো পুরোনো চীনকেও জানি না। পার্ল বাকের বই আর কাগজপত্রের ছেঁড়া খবরে যেটুকু জানা যায় আমরা তখন তারই উপর নির্ভর করে নানারকম ধারণা করেছিলাম। মাদাম চিয়াং-কাই-শেক ছিলেন এশিয়ার জাগ্রত নারীশক্তির প্রতিমূর্তি। চীনের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রতি আমাদের দেশের মানুষ ছিল সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল, চিয়াং-কাই-শেককেই তারা বরণীয় নেতা মনে করেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প পরেই তিনি সপত্নীক ভারতে এসেছিলেন। পরাধীন ভারতে ভারতের পক্ষে বড়লাট তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার সময় চীনের মানুষের দার্ঢ্য, চরিত্রবল ও ঐক্যের কথা বলেন। তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে হয় লিখেছিলেন যে, আমরা সচরাচর আমাদের ইংরাজ শাসকদের সঙ্গে একমত হই না ; কিন্তু এই বিষয়ে আমরা বড়লাটের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। চিয়াং-কাই-শেকও বড়লাটের ভাষণের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুন্দর উক্তি করেন। সেটি আমার খাতায় লেখা আছে:

I am appreciative of your excellency's reference to the cultural background between the two peoples. Without doubt it was partly owing to its existence that the Indian nation was moved to express deep sympathy with us from the moment that we began our war of resistance. The enemy—now a common enemy—tried every expedient to divert that sympathy to himself. India was not misled for a moment. When Japan made perfidious offers of friendship the illustrious poet Tagore in noble language voiced the burning indignation which India felt in being asked to grasp in amity the blood-stained hand....

এই প্রসঙ্গে সেদিনের একটা ঘটনা মনে পড়লে আজও আমোদ পাই। সপত্নীক চৈনিক নেতা শান্তিনিকেতন এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন নেহরু। উদয়ন গৃহের পশ্চিমের বারান্দায় মাটিতে আসনে বসে পাথরের জলখাবার উপরে পাথরের বাসনে প্রত্যেকের আহার্য পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল দেশীয় পদ্ধতিতে। তাই সকলকেই জুতো খুলে বসতে হয়েছিল। ভোজনান্তে যখন মাদাম চিয়াং-কাই-শেক জুতো পরতে যাচ্ছেন তখন ক্ষিপ্রগামী নেহরু দ্রুতপদে এসে তাঁকে জুতো পরতে সাহায্য করলেন। শিভালরিতে (এইখানে বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় 'শিভালরি'র অনুবাদ করেছিলেন 'দুর্বলবৎসল', আমি বলি 'অবলাবৎসল' এ স্থানে প্রযোজ্য।) দক্ষ অন্যান্য মহাজনও কেউ কেউ ওই কর্মটি করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতজীর মত ক্ষিপ্রতা তাঁদের ছিল না। এই নিয়ে আমরা তখনকার অল্পবয়সীরা অনেক দিন পর্যন্ত ঠাট্টা-তামাশা করতাম। এসব কথা মনে আসছে এইজন্য যে, যখন চীন জাপানীদের আক্রমণ থেকে মুক্ত হতে চাইছিল তখন তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটা কত সর্বব্যাপী ছিল তা আমরা অনেকেই জানতাম না। আমাদের কাছে চিয়াং-কাই-শেক স্বাধীনতাকামী চীনের প্রতীক ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শুধু কাঠামো, শুধু 'ফর্ম'; মূল বস্তু ছিল চীনের আপামর জনগণ, যাদের অধিকাংশই তখন কমিউনিস্ট মতে আস্থাবান। তাদের নেতা মাও-সে-তুং-এর কাছে তখন স্বাধীনতা বস্তুটি কি, সে কথা স্পষ্ট ছিল বা হচ্ছিল। অবশ্যই এক দিনেই তিনি নিশ্চয় সর্বজ্ঞ হননি। ক্রমে স্বাধীনতার অর্থটা তিনি নিজের ও দেশের লোকের কাছে স্পষ্ট করতে পেরেছিলেন। আজ ভাবি, আমাদেরও স্বাধীনতা-যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু বিদেশী তাড়ানো ছাড়া মানুষকে স্বাধীন করবার কথা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী ছাড়া আর ক'জন ভেবেছিলেন? এবং তাঁরাও বহুজনের মধ্যে তাঁদের মতকে দৃঢ় করতে পারলেন না কেন? তাঁদের কি বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না, বাক্যে জোর ছিল না? তা নয়, আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা শৃঙ্খলাবোধের অভাব—তা কখনই আমাদের কোনো বিষয়ে একমত হতে দেয় না। কোনো যুদ্ধেই অন্তর ও বাহিরের শৃঙ্খলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া জয়ী হওয়া যায় না।

১৯৪৯ সালে চীন স্বাধীন হল। তার কয়েক বছর পরে, আমার যতদূর মনে হয় ১৯৫২ কি '৫৩ সালে একজন ইংরেজ মহিলা, তাঁর নাম ডঃ স্পস্টন, বছর দুই আমার বাড়িতে ছিলেন। ভারত সরকার কোনও জীববিজ্ঞানের অভিযানে তাঁকে একটি অধ্যয় লিখতে দিয়েছিলেন। ইনি তখন সদ্য চীন থেকে এসেছেন, অর্থাৎ চীনের কমিউনিস্ট সরকার তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সবসুদ্ধ সাত-আট বছর চীনে ছিলেন। তিনিই প্রথম আমাকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেন। তাঁর কাছেই প্রথম শুনি যে, মতাদর্শে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হলেও জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা কোয়ামিনটাঙকে সাহায্যদানে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ঈর্ষা ও জিঘাংসোপরায়ণ কোয়ামিনটাঙরা সুযোগ পেলেই এদের হত্যা করছে। ইনি দুই রাজত্বেই বাস করেছেন এবং সকালবেলা উঠে গলির মোড়ে খাদ্য আনতে গিয়ে সারি সারি নরমুণ্ড দেখা এঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। তিনি তখন আমায় বলেছেন, কিভাবে নতুন চীনের কর্তৃত্বশক্তি বছর দুই-এর মধ্যে দেশে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ ফিরিয়ে এনেছে। ছেলে-বুড়ো সবাইকে দেশ গঠনের কাজে লাগিয়েছে। তখনই তিনি বলেছেন যে, যেসব জায়গায় মাছি ভন ভন করত সেসব জায়গায় একটি মাছি দেখলে ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে—কোথা থেকে এই মাছি এল, কার বাড়ি ময়লা জমা হয়েছে! গ্রামের মধ্যেও ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে পরিচ্ছন্ন করছে, মাছি তাড়াচ্ছে—এটা একটা মুভমেণ্ট।

আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম—মাছি তাড়ানোও একটা মুভমেণ্ট? আমার কাছে মুভমেণ্ট অর্থ তখন প্রসেশন, জিগির, চিৎকার, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও পুলিস ভ্যান। ডঃ স্পস্টন বলেছিলেন, 'অবশ্যই মাছি তাড়ানোর জন্য মুভমেণ্ট চাই। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, নোংরা ফেলা, সব কিছুর বিরুদ্ধেই আন্দোলন চাই—নইলে সাধারণ মানুষ বুঝবে কি করে? সজাগ হবে কেন?' তখন আমার মনে পড়ল, একবার রাজপুতনায় শ্রীনাথদ্বার নামে একটি তীর্থে গিয়েছিলাম। খুব নামকরা তীর্থ—কুবেরের মন্দির। বাসে আমাদের সঙ্গে দুজন ধপধপে খদ্দর পরিহিতা কংগ্রেস-কর্মী মহিলা ছিলেন। বাস থেকে নেমে দেখি, পাণ্ডারা ঘিরে ধরে একটি দেহাতী মেয়েকে শাসাচ্ছে যে, অন্তত এক শ' টাকার পূজা না দিলে তার পুত্রটি আরোগ্য হবে না। বেচারা টাকা না থাকায়, কাঁদতে কাঁদতে কোমরের গোট খুলে দিচ্ছে। এই প্রতিহিংসোপরায়ণ দেবসেবকদের উপর মনটা বিরূপ হয়ে গেল। শ্রীনাথও তখন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। দরজা বন্ধ। তাই দর্শনের বাসনা ত্যাগ করে প্রসাদের দোকানের দিকে গেলাম। সেখানে পাত্রে পাত্রে নানাবিধ মেঠাই সাজানো আছে, কিন্তু তার উপর হাজার হাজার মাছি বসে কালো হয়ে আছে। আমি পাণ্ডাকে বললাম, "খাবারের উপর এত মাছি বসছে কেন?" পাণ্ডা প্রথম থেকেই আমার মেজাজের তল পাচ্ছিল না, এবার তার বিস্ময় মাত্রা ছড়িয়ে গেল। সে বিস্ফারিত চোখে বললে, "মিঠাইতে যদি মাছি না বসে, তবে মাছি কি বসবে বালুড়ে?" আমাদের সঙ্গী সেই কংগ্রেসকর্মী মহিলারাও তাতে সায় দিলেন। মশা-মাছি, ইঁদুর-ছারপোকা উৎখাত বিষয়ে মুভমেণ্টের কথা তখন আমি শুনিনি, মনেও হয়নি। ডঃ স্পস্টন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। আমার কাছে তিনি যতদিন ছিলেন, পুরাতন চীনের তুলনায় নূতন চীনের প্রশংসায় তিনি এত উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে, আমার ঠিক বিশ্বাস হত না এত অল্প সময়ে এত পরিবর্তন কি করে হতে পারে। তিনি আমায় বলতেন, ঠিকভাবে মানুষকে যদি বোঝানো যায় তা হলে মানুষ স্বার্থত্যাগ করে, পরিশ্রম করে—এটা কিছু অসম্ভব নয়। চীনে ফিরে যাবার জন্য তিনি ছটফট করতেন। ঐ দেশের প্রতি তাঁর এত আকর্ষণ দেখে আমি বিস্মিত হয়ে একদিন তাঁকে বলেছিলেন যে, "তুমি যাদের এত প্রশংসা করছ তারা তো তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।" একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি বলেছিলেন, "বেশ করেছে। আমরা ইংরেজরা শুধু নয়, সমস্ত ইউরোপের মানুষ চীনকে যেভাবে শোষণ করেছে তাতে তারা যদি বিদেশীদের প্রতি আস্থা হারিয়ে থাকে তবে দোষ দেব না। তোমরা এখানে ইংরেজের যে মূর্তি দেখেছ, চীনে তার চেয়েও অনেক বেশী জঘন্য। খালি লুঠই করেছে তারা।" চিয়াং-কাই-শেক সম্বন্ধে একটা গল্প বলেছিলেন তিনি। দেশে তখন ভীষণ ইনফ্লেশন, একটা তরকারী খাবার জন্য হোটেলে এক থলি টাকা নিয়ে যেতে হয়। চিয়াং-কাই-শেক বিশ্বাস করতেন না যে, সত্যিই এরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থা হয়েছে। কারণ, তার চারপাশের মানুষ তা তাঁকে বুঝতে দিত না। একদিন তিনি বললেন, "আজই অমুক হোটেলে গিয়ে খেয়ে দেখব কি রকম ইনফ্লেশন।" হোটেলে গেলেন ও আমাদের হিসাবে চার আনা দিয়ে পুরো পেট খেয়ে এলেন। তখন মনে খুব ফুর্তি—"দেখ কোনো ইনফ্লেশন নেই—শত্রুর মিথ্যা প্রচার।" এটা খুবই সম্ভব। সর্বোচ্চ পদের চারপাশে এত গণ্ডি যে, নিম্নভূমি দৃশ্যমান হওয়া সম্ভব নয়। বোধ হয় ১৯৫৮ সালে পি ই এন সম্মেলন হয় ভুবনেশ্বরে। সেই সময় পণ্ডিত নেহরুকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম তিন দিন। একসঙ্গে কোনারক যাওয়া হল। এক বিরাট গাড়ির মিছিল। তার দু-চার মাস আগে ঐ পথে কোনারক যাবার সময় খানাখন্দের ধাক্কায় গা-ব্যথা, আর ধুলোয় ধূসরিত হয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন দু পাশের ঘরবাড়ি লেপামোছা আলিম্পনে সজ্জিত—পথ মসৃণ, জলসিক্ত, সুখকর। "পথে সেচন কর গন্ধ বারি, যেন মলিন না হয় চরণ তারি।" এঁদের পক্ষে বোঝা কঠিন সাধারণ মানুষ কি অবস্থায় বাস করে।

ভদ্রমহিলা আমার কাছে বছর দুই ছিলেন। ক্রমাগত চেষ্টা করেছিলেন চীনে ফিরে যাবার, তাঁর সে ইচ্ছা সফল হয়নি। এখানকার কাজ শেষ হলে কলম্বোতে একটা কাজ নিয়ে চলে যান। তিনি বলতেন, "আমি চেষ্টা চালিয়েই যাব।" এখন আমার মনে হচ্ছে, চীন তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে বেশ করেনি। যদি তিনি সেখানে থাকতেন তবে অ্যানা লুই স্ট্রং বা রুথ আলির মত ইনিও 'হাণ্ড্রেড পার্সেণ্টার' হতেন। অর্থাৎ সর্বতোভাবে চীনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

এ কথা মানতেই হবে যে, ডঃ স্পন্টন আমার মনকে নতুন চীনের প্রতি অনুকূল করেছিলেন এবং সে ভাবটা স্থায়ী হয়েছিল। চীন যখন তিব্বতে প্রবেশ করল তখন স্বাধীনতাপ্রিয় আমাদের দেশের অনেক মানুষই ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কোনো দেশের স্বাধীনতা হরণ করা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। কিন্তু দীর্ঘদিন কালিম্পং-এ মংপুতে তিব্বতের প্রতিবেশী হয়ে বাস করেছি, তাই তিব্বতবাসী বহু লোককে চিনেছি। কালিম্পং ছিল তিব্বত ও ভারতের বাণিজ্য পথ। যারা যাতায়াত করত এমন বহু লোকের কাছে বহু তথ্য জেনে আমি জানতাম তিব্বতে কেউই সুখী ছিল না, স্বয়ং দালাই লামাও নয়। চক্রান্তে বন্দী, কুসংস্কারে বন্দী এবং শতকরা নব্বইজন লোক দারিদ্র্যে বন্দী। সে বন্দী-দশার রূপ যে কি ভয়ানক তা ১৯০৫ সালে লেখা জাপানী শ্রমণ একাই কাবাগুচি-রচিত 'তিব্বতে তিন বৎসর' বইটি পড়লে বোঝা যায়। সে কথাই বোঝাবার জন্য এই বইটি আমি অনুবাদ করি। তা অবশ্য আমার প্রকাশিত ক্ষুদ্র দ্বিমাসিক পত্রিকা 'নবজাতকে'র পাতার লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে।

ঐ সময়ে সতানারায়ণ সিংহ নামে এক ব্যক্তি একটি বইতে লিখেছিলেন তাঁর একাকী প্লেন নিয়ে তিব্বতে গিয়ে চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কাহিনী—তাঁর সঙ্গে রোমাঞ্চও ছিল। সেখানে নৃশংসতার বোমা বিধ্বংসের যে বর্ণনা পড়েছিলুম তার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করছিলাম দালাই লামার লাসা পরিত্যাগের চিত্র। অত জিনিসপত্র সোনাদানা ও দলবল নিয়ে দীর্ঘ পার্বত্য পথ দিয়ে কি করে তিনি চলে এলেন? চীনারা তাঁকে ধরতে পারল না কেন? মারলই বা না কেন? বোমা ফেলতে বাধা কি ছিল? সতানারায়ণ সিংহ-র সেই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার আমাকে তত ভাবায় নি, যত ভাবিয়েছিল চীনাদের দুর্বোধ্য ব্যবহার।

১৯৬২ সালের জুনে আবার সোভিয়েট ইউনিয়নে যাই, তখন সেখানে স্টালিনের প্রভাব প্রতিপত্তি অস্তমিত। তবে সে সম্বন্ধে কেউ কোনো কথা বলে না। রাতারাতি তাঁর মূর্তি ছবি অন্তর্হিত। কেবল আমাদের কবি সমর সেন আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি 'বাকু' রেস্তোরাঁয় বসে অনেক চেঁচামেচি করেছিলেন, 'তোমরা অকৃতজ্ঞ' বলে। তা তাঁকে এরা কেউ কিছু বলেনি। আমরা যারা রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ বুঝি না, তখনও বুঝতে পারি নি যে, এর ফলে বা অন্য কোনো কারণে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার সৌভ্রাত্রে চিড় খেয়েছে। তাই ১৯৬২ সালেরই শেষ দিকে ভারতের সীমান্তে যখন যুদ্ধ লাগল তখন সেটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই মনে হয়েছিল। এদিকে বান্দুং কনফারেন্স হয়ে গেছে পঞ্চশীলের মন্ত্র জপা হয়েছে। চৌ-এন-লাই বেশ কয়েকবার ভারত ঘুরে গেলেন। 'হিন্দি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিনি ভাই ভাই' ধ্বনি মুখরিত হয়েছে। হঠাৎ এ কি কাণ্ড! কোথায় তুষারমেরুতে সীমারেখার একটি আঁচড়ের জন্য কি এতদিনের সৌহার্দ্য ধ্বসে হয়ে যাবে! যারা তখন চীন ও রাশিয়ার মতান্তরের কথা জানত না, তারা ভাবছিল কমিউনিস্টদের বিশ্বাস নেই। আর যারা জানত, তারা ভাবছিল অন্য কথা। সারা দেশে তাই কমিউনিস্ট-বিরোধিতার একটা তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল। সেটা উত্তাল তরঙ্গ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যেমন হয় তেমনি। 'মহা সোভিয়েট' লেখার ফলে আমার কমিউনিস্ট বলে অখ্যাতি হয়েছিল, তাই আমার অবস্থা শত্রুপক্ষের মত হয়ে দাঁড়াল। তার উপর যুদ্ধের সময় নীরব ছিলাম। কেন, তা জানি না। চেষ্টা করছিলাম মুখর হতে কিন্তু ভিতর থেকে সাড়া পাচ্ছিলাম না। আমার স্বভাবই এই। যখন কোনো এক বিষয়ে জনমত উত্তাল হয়ে ওঠে, আমার মনে হতে থাকে, অন্য পক্ষেরও কিছু বলবার আছে—সেটা শোনা দরকার। কিন্তু ব্যান্ডেজ বাঁধার মহড়ার যোগ না দেওয়ায় আমার কম খেসারত দিতে হয়নি। একজন মহিলা বাড়ি এসে আমায় খুব বকাবকি করলেন, "আপনারাই দেশে কমিউনিস্টদের বাড়িয়ে তুলেছেন; তারাই চীনেদের ডেকে আনছে।" আমার অশীতিপর স্বশ্রূমাতা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, "হ্যাঁ গা, তা চীন যদি ভারত আক্রমণ করে তো বউমা কি করবে?" সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছিলাম চীন যখন তার বিজয়ী সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে গেল। কেন এল, কেন গেল, সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। এই অজ্ঞেয় চরিত্র হলদে জাতির রহস্য (ওরা কেন হলদে কে জানে। আমি তো ওদের চেহারায় হলুদের চিহ্নমাত্র দেখিনি।) বুঝবার চেষ্টা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন একদিন ট্রেনে একজন ক্যাপ্টেন কিংবা আর একটু উচ্চপদের এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি চীনে বন্দী ছিলেন। তারপর মুক্তি পাবার পর তাঁদের কোনো একটা ক্যাম্পে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। সেই ক্যাম্পটার নাম মনে আসছে না। যাই হোক, সেখান থেকে দার্জিলিং মেইলে কলকাতা যাচ্ছিলেন। কলকাতা থেকে পাঞ্জাব ফিরবেন রাঁচি হয়ে। তখন বোলপুর থেকে আমি তাঁর সহযাত্রিণী হলাম। প্রথমেই লক্ষ করছিলাম, তাঁর কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন আছে কি না। দেখতে পেলাম না। এমন কি, পরাজয়ের গ্লানির চিহ্নও দেখলাম না। তাঁকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট প্রফুল্ল দেখে বন্দীশিবির থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে মনে হল না। তিনি আমাকে সবিস্তারে চীনা খাদ্য থেকে তাদের আচার-ব্যবহার দ্রষ্টব্যস্থানের এমন বর্ণনা দিলেন যাতে মনে হল তিনি বিদেশ ভ্রমণ করে ফিরছেন। পরে আরো কয়েকজনের কাছে তা শুনেছি। তা ছাড়া সেনা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পত্নী কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, ধৃত সৈনিকদের এমন মগজ ধোলাই হয়েছে যে, তারা শত্রুর উচ্চ প্রশংসা করছে। এজন্য আমরা বিপন্ন হয়ে পড়েছি। অর্থাৎ এ-রকম হলে শত্রুতা টিকিয়ে রাখা শক্ত! আমি সেই ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওরা আপনাকে বেয়নেট দিয়ে খোঁচায়নি? হাত-পা ভেঙে দেয়নি; কিছুই করে নি? চীনা খাদ্যই আপনার মন জুড়ে আছে?" তিনি খুব চটে উঠলেন, "খোঁচাবে কেন? ঠ্যাংই বা ভাঙবে কেন? রাজনীতি বদলায়, রাষ্ট্রনীতি বদলায়, আমরা যখন যে সরকার থাকে তার হুকুম তামিল করি, আমাদের কি দোষ?" কথাটা খুব ঠিক, কিন্তু যুদ্ধের সময় সে কথা কে মনে রাখে? আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করছি—বাংলা দেশের যুদ্ধের পর পাকিস্তানী সৈন্যদের সম্বন্ধে আমরা সে কথা মনে রেখেছিলাম। অবশ্য সে জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের উপর সন্তুষ্ট হননি। তাদের বক্তব্য ছিল, অন্তত একটা পাঞ্জাবীকে আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা 'জবা' করে দিই। কিন্তু ভারত সরকার এ বিষয়ে সাবধান ছিলেন।

ভারত-চীন যুদ্ধ সম্বন্ধে আধুনিককালে অনেক লেখা হয়েছে—ভারতীয়রাও লিখেছেন, অন্যরাও লিখেছেন। সে সম্বন্ধে আলোচনার মত উপযুক্ত জ্ঞান আমার নেই ; শুধু এবার চীন ভ্রমণের সময় কথাপ্রসঙ্গে দু-একবার সে কথা যখনই উঠেছে, আমি প্রায় একই উত্তর পেয়েছি। তা এই: "ব্রিটিশের কৃত সীমানা আমরা মানি না। সব সমস্যারই সমাধান আলোচনার মাধ্যমে করা যায়। বিশেষত সীমান্তরেখা প্রতিবেশীদের মধ্যে আলোচনার দ্বারাই স্থির করা উচিত—সে উদ্দেশ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ছয়বার ভারতে গিয়েছিলেন। (অবশ্য আমার মনে পড়ল না যে, অতবার এসেছিলেন। দুবারের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে ছিল।) যা হোক, সে সমস্যার সমাধানের জন্য যুদ্ধ একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল। আর ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের জয়-পরাজয় নেই। কারণ, ভারতের মানুষ আমাদের মতই দীর্ঘকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদী বলদর্পিত মানুষের অত্যাচার সহ্য করেছে। কাজেই, এ যুদ্ধের জয় নিয়ে আমরা গর্ব করি না। ওটা একটা অবাঞ্ছনীয় কর্ম, আমরা দুঃখের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ করেছিলাম। যতটুকু প্রয়োজন তার থেকে একটুও বেশী এগুইনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে অত ভালো ব্যবহার করলে কেন? মগজ ধোলাই করবার জন্য—আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যাকে ইংরাজী ভাষায় বলা যায় 'নলেজেবল'। তিনি বললেন—বেশ কথা—সৈন্যদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব কেন? তারাও সাধারণ মানুষ, তারা নিজের ইচ্ছায় কোনো অন্যায় করেনি, তাদের নির্দিষ্ট কাজ করেছে। সুযোগ পেলেই কারো উপর অত্যাচার করব সে শিক্ষা আমাদের নয়, তার চেয়ে বেশী পলিটিক্যাল এডুকেশন আমাদের আছে।—

এই পলিটিক্যাল এডুকেশনের কথাটা পরে আরো বিস্তারিত বলব—এটা সে-দেশে এত জীবনব্যাপী শিক্ষা যে, আমার এই ক্ষুদ্র রচনার মধ্যে দিয়ে ক্রমে যতটুকু প্রকাশ পাবে তার বেশী বোঝাবার বিদ্যা আমার হবে কি না সন্দেহ।

যা হোক, আমার তখন তিব্বতের কথা মনে পড়ল। শুনেছিলাম যে, তিব্বতে চীনারা ভীষণ অত্যাচার করেছে এবং তাও সৈন্যের ওপর নয়, ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের উপর। এবং এই অত্যাচার ধর্মের কারণেই। যুগে যুগে ধর্মের কারণে ধার্মিকেরা অনেক রক্তপাত করেছেন, তার নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে কার বেশী আছে? একটা এত বড় দেশ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আজও আয়ারল্যান্ডে ধর্মযুদ্ধ চলেছে—সমস্যাটা ভিন্ন, ধর্মযুদ্ধ নয়, ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ। আমি তখন অনেক ভেবেছি যে, অধার্মিকেরা সেটা করবে কেন? তারা হয়তো অন্য কিছু করেছে, যেটা তিব্বতীদের কাছে ঘোর নিপীড়ন মনে হয়েছে। যেমন, তারা হয়তো ধর্মগ্রন্থ (পুঁথি) ভেঙে খলে ছেড়ে খাওয়া বন্ধ করেছে। আমি আগেও জানতাম অর্থাৎ মংপুতে বাসকালে শুনেছিলাম, পরে তিব্বত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নলিনাক্ষ দত্ত তিব্বত ঘুরে এসে সংস্কৃত কলেজে একটি মিটিং-এ বলেছিলেন যে, তিব্বতীরা ভাল ভাল ম্যানাসক্রিপটের অনেকখানি খেয়ে ফেলেছে। কারণ অসুখ হলে লামারা ওই সব সদ্‌গ্রন্থের এক টুকরো ভেঙে ঔষধের মতো ব্যবহার করতে দিতেন ধর্মপ্রাণ শিষ্যদের। তা ছাড়া, শ্রমণ একাই কারাগুচি লিখিত 'তিব্বতে তিন বৎসর' গ্রন্থে পড়েছি যে, দালাই লামার বিষ্ঠাও বড়ি করে রোগীকে খাওয়ানো হত। এ কথা আমার অবিশ্বাস হয়নি; কারণ, বহু দিন আগে মংপুতে বুধি লামা তিব্বতে শিক্ষালাভ করে লামা হয়ে এসেছিল—নানারকম সাধনপ্রক্রিয়ার মধ্যে একটার কথা শুনেছিলাম যে, তাকে তিন মাস হাত-পা বেঁধে একটা বাক্সে রাখা হয়েছিল। শারীরিক গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার জন্য সেই বাক্সে গর্ত ছিল, আর সেইভাবে থেকে তাকে মন্ত্র জপ করতে হত। যে মন্ত্রের মানে অবশ্য সে জানে না। এইভাবে যে এই নির্দিষ্ট সময় কাটিয়ে দিতে পারল সে একটা পরীক্ষা পাস করল। এটা অবশ্য একেবারেই অত্যাচার নয়; কারণ ঐ হবু লামারা স্বেচ্ছায় এই কৃচ্ছ্রসাধন বরণ করেছে। কিন্তু যারা ধর্মের ধার ধারে না তারা অবশ্যই এইসব ধর্মকর্মকে আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করতে বলে থাকবে। অসুখ হলে তারা হাসপাতালে নিয়ে যাবে। চীনের একটি চলচ্চিত্রে তিব্বতে প্রতিষ্ঠিত একটি আধুনিক হাসপাতালের দৃশ্য দেখে বারবার মনে হয়েছিল চীন ও-দেশে প্রবেশ করবার আগে আমরাও তো ওখানে হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি স্থাপন করবার চেষ্টা করতে পারতাম। ওদের ধর্মচর্চা অব্যাহত রেখে খানিকটা তো করা যেত। অন্তত যতটা আমাদের হয়েছে। সাত শো আট শো লামা একেকটা লামা-সারিতে বসে দিনরাত মন্ত্র জপ করে। তাতে যারা ধর্মের চেয়ে কর্মকে প্রাধান্য দেয় তারা ক্ষিপ্ত হতে পারে, কিন্তু আমরা যারা এখনও লৌকিকের চেয়ে অলৌকিকের দিকেই বেশী আকৃষ্ট, আমরা কখনই তা হতাম না। এফ আর সি এস ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে ওঝারা বা অদ্ভুতকর্মা গুরুদেবেরা তাঁদের কাজ করে যেতেন।

তিব্বতে চীনা হামলার রাজনৈতিক দিকটার ভালোমন্দের বিচার আমি করছি না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যেখানে মুষ্টিমেয় লোকের তাঁবেদারি করে এবং অন্ধবিশ্বাসে যুক্তিহীন সংস্কারের জালে বেষ্টিত বুদ্ধিযুক্ত মানুষের চিরবন্ধনদশা সেখানে স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রশ্ন ওঠে না। যাই হোক, আমাদের এই ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত আমরা সিকিমে করতে পারব। সেখানে ভালো হাসপাতাল, ভালো স্কুল এবং ভালো কার্পেট ফ্যাক্টরী করা যেতে পারে। ভালো কার্পেট তিব্বতে ও সিকিমে হয়। একবার সিকিমে একটা কার্পেট কিনতে গিয়েছিলাম। অর্ডার দিলে কত দিন লাগবে জিজ্ঞাসা করায় ওরা বলে, তিন মাস থেকে এক বছর—।

"সে কি?"

"ইচ্ছা হলে বোনে, ইচ্ছা না হলে বোনে না। তাই সময় বলা যায় না।"

"যখন বোনে না তখন খায় কি?"

"ঐ কোনো দিন জোটে, কোনো দিন জোটে না। তাই বলে রোজ রোজ নিয়মিত খাটাখাটনি আমাদের পোষায় না।"

এখন দেখলুম তিব্বতে কার্পেট ফ্যাক্টরীতে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে—গোছা গোছা কার্পেট বোঝাই হয়ে রয়েছে। আর শুধু কার্পেটের ফ্যাক্টরী নয়—হাইড্রোইলেকট্রিক প্ল্যান্ট থেকে শুরু করে নানা কলকারখানায়, বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরা দিতে হচ্ছে। 'মণিপদ্মে হুঁ'র চক্র ঘুরিয়ে ভিক্ষা করা একেবারে বন্ধ।

সিকিম তিব্বত থেকে অনেক উন্নত ছিল। অন্তত সেখানে রাজার ছেলে রাজা হত। জন্মান্তরের দালাই লামাকে জন্মে জন্মে খুঁজে বার করে তক্ততাউসে বসানো হত না। যাই হোক, তবু আমি তিব্বতের কথাটা তুলব ভেবেছিলাম। সেখানের সীমান্ত সমস্যাটার সমাধান শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে হয়েছিল কিনা জানবার জন্য, কিন্তু তুললাম না। ভাবলাম, কি জানি, যদি তিক্ততা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। কারণ, ওরা পলিটিক্যাল তর্ক খুব শান্তভাবে করে। যুক্তির দ্বারা যুক্তি খণ্ডন করে কথা বলে, এতটুকু উত্তেজিত হয় না; কারণ, ওদের পলিটিক্যাল শিক্ষা আছে। কিন্তু আমি তা নই। আমার তো আর পলিটিক্যাল শিক্ষা নেই। চেঁয়াড়া উত্তর দিলে আমি রেগে উঠি। রাজনৈতিক তর্কে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। যা হোক, আমার তিব্বতের কথা না তোলবার আসল কারণ হল একটা কবিতা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সেই কবিতাটা কোথায় যেন কোন্ মস্তিষ্কের টাঙানো আছে তা ভাবতে ভাবতে আমাদের যাত্রার সময় এসে গেল, এ প্রসঙ্গ শেষ হল না।

তিব্বতের কথার রেশ ধরে আমার যে কবিতা মনে পড়ে গেল তা 'সময়ে বর্ষণ' ('টাইমলি রেইন') নামে একটা বইতে পড়েছি। স্টুয়ার্ট গেল্ডার বলে একজন বিখ্যাত জার্নালিস্ট, যিনি একদা ভারতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গও করে গেছেন, তিনি ১৯৬২ সালে অনেক তদ্‌বির করে তিব্বত গিয়েছিলেন—সেখানে কমিউনিস্টদের অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ জানবার জন্যই। যেমন গিয়েছিলেন 'মণিকা ফেল্টলন' কোরিয়ায়। স্টুয়ার্ট গেল্ডার তাঁর বইতে চতুর্দশ লামা 'দানৎ সেন জালটসো' ১৯৫৪ সালে যখন পিকিং যান তখনকার রচনা একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছিলেন। কবিতাটি পিকিং-এ কোনো বৌদ্ধ মন্দিরে টাঙানো আছে। সে মন্দিরের নাম 'গ্রড চেরিটি' (প্রশস্ত করুণা)। পরে বুঝেছি এটি নিষিদ্ধ নগরীর ভিতরে একটি গৃহ—কিন্তু সে গৃহে যখন গিয়েছিলাম তখন প্রচণ্ড শীতের কষ্টে এই কবিতার কথা আমার মনে পড়েনি। এবং তিব্বতের কথাও পিকিং-এ থাকতে আমার মনে পড়েনি, তা হলে অবশ্য সেটি আমি দেখতে চাইতাম। এ বইতে মাও-সে-তুং-এর কথা অনেক লিখতে হবে, তাই প্রারম্ভে চতুর্দশ দালাই লামা কর্তৃক তাঁর স্তবগান ব স্তোত্রটি অনুবাদ করে দিচ্ছি। কবিতাটি খুব দীর্ঘ, তাই আমি কয়েকটি শ্লোক মাত্র অনুবাদ করব। স্টুয়ার্ট গেল্ডার ও মেরী গেল্ডার ইংরাজ। স্টুয়ার্ট 'নিউজ ক্রনিক্যাল'-এর রিপোর্টারের কাজ তখন বিশ বৎসর যাবৎ করেন। তিনি ভারতের মুক্তিযুদ্ধের রিপোর্টিং করেছিলেন এবং সেই সূত্রে এসে গান্ধীজীর বন্ধু ও ভক্ত হয়ে পড়েন। ইনি কোনো পলিটিক্যাল দলভুক্ত নন বলে এবং কবিতাটির সত্যতার প্রমাণ কবিতাটির মধ্যেই এত প্রকট বলে কবিতাটি আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। দালাই লামার মত পরিবর্তনের কারণ কি, তাও তিনি লিখেছেন। কিন্তু সে বৃত্তান্ত আমি এখানে পুনরাবৃত্তি করব না;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ, আমি তো তাঁর বই অনুবাদ করছি না। দালাই লামা লিখছেনঃ—

"কেন্দ্রীয় জনসরকারেরর মহান জাতীয় নেতা মাও-সে-তুং অপার সুকর্মজাত চক্রবর্তী। বহু দিন ধরেই তাঁর দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করে একটি স্তোত্র লিখব মনে করেছিলাম। ইতিমধ্যে অন্তর্মঙ্গোলিয়ার কানংসু বৌদ্ধ মন্দিরের লামা ব্লাংসুয়াংকেরগাম আমাকে প্রণাম জানিয়ে বহু দূর থেকে একটি কবিতা লিখতে অনুরোধ করলেন। তাঁর অনুরোধ পালন করতে রাজী হলাম। কারণ, এটি আমার ইচ্ছার অনুকূলঃ—

চতুর্দশ দালাই লামা নরবুলিন-সেন ক্ষু প্রাসাদ হইতে ১৯৫৪

হে ত্রিরত্ন (বুদ্ধ ধর্ম সংঘ), যাঁরা এই পৃথিবীর উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন
আপনাদের অতুলনীয় চিরমঙ্গলালোকে আমাদের রক্ষা করুন।
হে চেয়ারম্যান মাও! তোমার উজ্জ্বল কর্ম এ জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা ও মহাসম্পতের তুল্য।
এ পৃথিবীর উপর আলোবিকীরণকারী সূর্যের মতন উজ্জ্বল,
তোমার মত নেতা অসীম পূণ্যকর্মের ফলেই জন্মগ্রহণ করে।
তোমার রচনা মুক্তার মত মূল্যবান, জোয়ারে উত্তাল আকাশ-ছোঁয়া সমুদ্রের মত শক্তিশালী।
হে মহামাননীয় চেয়ারম্যান মাও, তুমি দীর্ঘজীবী হও।
আমাদের বিরাট দেশ ছিল দুঃখভারে নত, অন্ধকারে আবদ্ধ,
তোমার দীপ্তিতে হল তার মুক্তি, এখন দেশবাসী সুখে ও মঙ্গলে পূর্ণ।
তোমার শান্তির পথ শ্বেতমণিখচিত ছত্রের মত
স্বর্গ, মর্ত্য ও মানবের উপর হয়ে আছে ছায়াময়।
তোমার যশ ঐ ছত্রের চারপাশের ঘুঙুর, আকাশে সতত মুর্ছমান ও ঝংকৃত।
আমাদের শত্রু রক্তপিপাসু সাম্রাজ্যবাদীরা বিষাক্ত সর্পের মত সরীসৃপ শয়তানের দূত—
তুমি নির্ভীক পর্বতের মত, বিষাক্ত সর্পজয়ী তোমারই অজেয় শক্তি।
শাক্যমুনির শ্রেষ্ঠ ধর্ম মুক্তার প্রদীপে চন্দ্রালোকের মত উজ্জ্বল
সুগন্ধি মুক্তার অলঙ্কারের মত বিনা বাধায় আমরা ধারণ করে গর্বিত।
তোমার ইচ্ছা পুঞ্জীভূত মেঘের মত, বজ্রের মত তোমার আহ্বান।
ঐ মেঘ হতে যথাসময়ে বর্ষা নামে, নিরবধি ধারায় পৃথিবীকে করে পুষ্ট।
যেমন পরম মূল্যবতী গঙ্গাধারা সর্ব দিকে ধাবিত
তেমনি শান্তি ও সুবিচারে বয়ে আনে সকল মানুষের সীমাহীন আনন্দ।
এই পৃথিবী যেন স্বর্গের মত সুখকর হয়, আমাদের মহান নেতা যেন চিরজীবী হন।
ধর্মরক্ষক দয়াময় বোধিসত্ত্বের শক্তিতে
ও মহর্ষিদের বাক্যে আমাদের আশা পূর্ণ হয়।

চীনের তিব্বত অধিরোহণের পর থেকেই (অধিরোহণ কথাটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য। কারণ, তিব্বত বোধ হয় দশ থেকে পনেরো হাজার ফুট উঁচু, ওটা তো পৃথিবীর ছাদ।) মনটা বিমুখ ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত দালাই লামা যখন বললেন ধর্মত্যাগ করাবার জন্যই সহস্র সহস্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই সারা ভারত গর্জন করে উঠেছিল। মানুষ মারা আমরা কোনোদিনই অনুমোদন করি না; দরজা খুলে দিই—দলে দলে শরণার্থী আসে বারবার। এদেশে মোগল-পাঠানেরা জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করেছিল শুনেছি। কিন্তু যদি সত্যই তা হত তা হলে উত্তর ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকত না। কাজেই, খুব স্বল্পসংখ্যক লোককে গরু খাইয়ে মুসলমান করলেও হাজার হাজার লোককে করা যায় না। তবু যদি-বা ধর্মান্তরিত করা যায়—মেরে ফেললে প্রাণত্যাগ হয়, ধর্মত্যাগ হয় না। দালাই লামার এই কবিতাও অবশ্য আমার সন্দেহ দূর করেনি। কারণ, একদা ভালো ভেবেছিলেন বলেই পরে তা খারাপ হবে না, এও কোনো কথা নয়।

চীনের সম্বন্ধে আসল বিরূপতা আমার মনে এল নকশাল আন্দোলনের সময়। যে ছন্নছাড়া ছিন্নমস্তা রাজনীতি তখন বাংলায় ও অন্ধ্রে পাইকারী হারে, অন্যত্র খুচরোভাবে

তাণ্ডব শুরু করল তাতে চীনের প্রভাব আছে এ-কথা স্পষ্ট হল, যখন দেওয়ালে লেখা পড়ল—'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। মত ধার করা যেতে পারে, অর্থাৎ এক দেশে উদ্ভূত মত অন্য দেশে সফল হতে পারে তার সহস্র প্রমাণ আছে; কিন্তু এক দেশের নেতা অন্য দেশের নেতা হতে পারেন না, বিশেষত যে দেশের মানুষের কাছে তিনি একটি নাম মাত্র। আমরা ভাবছিলাম আমাদের ভালো ভালো ছেলেগুলিকে খেপিয়ে দিয়ে চীন কি আমাদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে? তখন বুঝিনি এ-দেশের অনুকরণপ্রিয় অল্পবুদ্ধি 'এ্যাডভেনচারিস্ট' কতিপয় নেতা 'কালচারাল রেভলিউশন'-এর নাটক করতে গিয়ে আমাদের আত্মত্যাগের, বীরত্বের উপকরণে পূর্ণ কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিষ্ফল চেষ্টার দিকে শুধু নয়, অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাদের ধ্বংস নয়, ধ্বংস হয়েছিল আমাদের সকলের সাহস—আমরা মেরুদণ্ডহীন জীবে পরিণত হয়েছিলাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সনৎবাবুর দুর্দশা যাঁরা ঘটাচ্ছিলেন, তাঁরা সম্ভবত সিংহুয়া ইউনিভার্সিটির অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু সনৎবাবুও জানতেন না, তারাও জানত না তার প্রকৃত অর্থ কি। কারণ সেটা অনেকটা 'তামাসারি'তে মন্ত্র জপার মত হচ্ছিল। তেমনি মূঢ়, তেমনি ব্যর্থ। সে সময় অসীম চ্যাটার্জীর সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা করেছি, দীপাজনের সঙ্গেও কথা হয়েছে কিন্তু কেউই আমাকে বোঝাতে পারেননি তাঁরা কি চাইছেন। কারণ, নিশ্চয় তাঁদের কাছেও 'কালচারাল রেভলিউশন'-এর অর্থ স্পষ্ট ছিল না—যেহেতু, তাঁরা এক ধাপ এগিয়ে লাফ দিচ্ছিলেন। যে দেশে না সামাজিক, না রাজনৈতিক রেভলিউশন হয়েছে সেখানে হঠাৎ 'কালচারাল রেভলিউশন'-এর কল্পনা অলীক। অসীম (কাকা) যেদিন কলকাতা ছেড়ে গেলেন সেদিন রাত্রি এগারোটায় আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি বললেন, "আপনি আমাকে স্নেহ করেছিলেন তাই যাবার আগে আপনাকে বলে গেলাম।" তাঁর গলা ভারি ছিল, আমারও মনটা ভারি ছিল। তাঁর সততায় আমার অবিশ্বাস ছিল না। আমি রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন স্মরণ করলাম, 'ধন্য তোমা দাসে, সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।'

এর পরে আন্দোলন যখন উগ্র, ফলে চারদিকে একটা আতঙ্ক তখন তৎকালীন হোম সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি আর গুপ্তের অনুমতি নিয়ে আমি, গৌরকিশোর ঘোষ, জ্ঞানাঞ্জন পাল, নির্মল চট্টোপাধ্যায় বন্দী ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, সে সময়ে বারবার বিপ্লবী হালিম প্রভৃতিকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ব্যাপারটা কি? বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে বন্ধ্যা তা আমরাও বুঝতে পারছি—এতে খালি বেকার তৈরী হচ্ছে। কিন্তু ভাই, কিভাবে ব্যবস্থা করলে ভালো হয় তার কি কোনো ব্লু-প্রিন্ট তোমাদের কাছে আছে? সেই ব্লু-প্রিন্টটা দাও—যদি আমাদের মনোমত হয়, সর্বতোভাবে সহায়তা করবো। তোমাদের দলে ভিড়ব আমরা। আমরা মিত্র হতে চাই, আমাদের শত্রু করে লাভ কি? কিন্তু কোনো ব্লু-প্রিন্ট তাঁরা দিতে পারেননি। তারপর যাদবপুরে ভাইস চ্যান্সেলর গোপাল সেনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর ঐ আন্দোলনের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে সমস্ত আলোচনা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু চীনে গিয়ে ব্লু-প্রিন্টটা পেয়ে গেলাম। সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। মাও-সে-তুং-এর চতুর্থ পত্নী ও তাঁর অনুচরবর্গ বিপ্লবের নামে যে সব বাড়াবাড়ি করেছিলেন শুনলাম, তা নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পনার অঙ্গ কিন্তু পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন অন্ধ অনুকরণ এদেশে শুধু মূঢ়তা প্রসব করল।

যতই মনে মনে চীন সম্বন্ধে সন্দেহ থাক, সে দেশে যাবার আগ্রহ আমার প্রবল ছিল; ভেবেছিলুম একবার সেই দেশ দেখতেই হবে, যে দেশ আমাদের পাশে থেকেও এত অজ্ঞাত। যে দেশের নেতা সর্বোচ্চ পদে বসে থেকে নিজেই নাকি নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছেন (কালচারাল রেভলিউশনকে এইরকমই অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমাদের) তা শুধু অজ্ঞাত নয় দুর্জ্ঞেয়ও। যাঁরা চীনপন্থী তাঁদের কাছ থেকে রুশবিরোধী কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তা দিয়ে ঠিক চীনকে বোঝা যায় না।

১৯৭৪ সালে আমি শ্রীমতী গান্ধীকে চীনে ডেলিগেশন পাঠাবার কথা লিখেছিলাম। তখন একটু সম্ভাবের আলো দেখা গিয়েছিল। তারপর প্রথম সূচনা চীনের টেবিল টেনিস টীম যখন এলো। ঢাকুরিয়া লেকের প্রাঙ্গণে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ও তাঁদের লীডার একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই সময় দিল্লী থেকে তাঁদের ফার্স্ট সেক্রেটারী লী-ও এসেছিলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক। টেবিল টেনিস দল একটি ভারী সুন্দর ঘোষণা নিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছিল—'ফ্রেন্ডশিপ্ ফার্স্ট কম্পিটিশন সেকেন্ড' কথাটা যেমন সুন্দর তেমনি বহুপ্রসারিত এর অর্থ। এইরকম ছোট্ট এক একটি বাক্যকে অর্থগর্ভ করে বলা এরা এদের নেতার কাছ থেকে শিখেছে—তা এখন বুঝতে পেরেছি। কথাটির ভারতের প্রসঙ্গে একটি অর্থ আছে। এটি বলছে, আমরা বন্ধুত্বের বাণী এনেছি, দুর্যোগের পর প্রথম মৈত্রীর বাণী। আবার ভারতের প্রসঙ্গ ছাড়াও খেলার প্রসঙ্গেও এর সার্থকতা কম নয়। আজকের দিনে যখন খেলার ক্ষেত্রটাও কলুষিত, জাল-জুয়াচুরি নেপটিজমের রাজত্ব —যখন 'স্পোর্টিং স্পিরিট' শব্দটাই অর্থহীন হয়ে গেছে তখন খেলার প্রসঙ্গে এ-কথা বলা যে হারজিতই বড় কথা নয়, বড় কথা খেলোয়াড়দের মধ্যে সম্প্রীতি—এ একটা পরিচ্ছন্ন সভ্য মানুষের ঘোষণা, যা আমাদের পৃথিবীতে লুপ্তপ্রায়।

চীনের সম্বন্ধে আমার মন দোটানায় থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতি সমিতির অনেক সভায় আমি গিয়েছি। এই সমিতি ডাঃ কোটনিসের খবর আমাদের দেশে প্রচার করেছে, নইলে ভারতের ওই বীর সন্তানকে আমরা মনেই রাখতাম না। সারা ভারত ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটির সভাপতি হিসাবে ডাঃ বিজয় বসু সপত্নীক মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে চীন গিয়েছেন কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিকূল থাকার সময়েও। এবারে চীনে হোপেই প্রদেশে সিজিয়াচুয়াং শহরে যেখানে ডাঃ কোটনিসের সমাধি তার নিকটে একটি স্মৃতিমন্দির অর্থাৎ মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছে। তারই উদ্বোধন উৎসবে ন'জন ভারতীয়কে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন চীনের রাষ্ট্রদূত। ২৮শে নভেম্বর এই ডেলিগেশন রওনা হবার কথা। ৯ই ডিসেম্বর উদ্বোধন-দিবস। নভেম্বরের মাঝামাঝি জানলাম আমাকেও দলে নেওয়া হয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস আমার নাম উত্থাপিত করেছেন ও সেটা গৃহীত হয়েছে। তারপর চলল ভারত সরকারের ছাড়পত্রের সাধনা। অবশেষে ছাড়পত্র নিয়ে যখন দিল্লী পৌঁছলাম তখন শুনি শেষ দিন পর্যন্ত কোনো কেরানিকের নিজস্ব মতের প্যাঁচে পড়ে আমাদের যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর কি। যা হোক, ২৮ তারিখে যাওয়া গেল না।

আমরা চার তারিখ শেষ রাত্রে দিল্লীর দিকে রওনা হলাম। দিল্লী হয়ে বম্বে যাওয়া, বম্বে থেকে সুইস এয়ারে সোজা পিকিং আর থামা নেই। যাওয়া কি না-যাওয়ার দ্বন্দ্বে ক'টা দিন কি উদ্বেগে কেটেছে কি ভাব! দলপতি বিজয়বাবু বলেছিলেন তাঁকেই চীন নিমন্ত্রণ করেছে সে-ক্ষেত্রে তাঁদের পাসপোর্ট যদি সরকার আটকে রাখেন তা হলে ডাঃ কোটনিসের ভ্রাতা-ভগ্নী ও আমার ছাড়পত্র পাওয়া না-পাওয়া সমান—কেউই যাবে না। সে তো ঠিকই। চীনারা ওঁদের চেনে, ওঁরা তো তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমি যে যেতে চাই যদি এতটুকুও ভালো দেখতে পাই (কারণ, অনেকের মত আমারও সন্দেহ ছিল সেখানে খালি বন্দুক-বেয়নেটের রাজত্বই দেখব।) তা হলে দেশে এসে বলব। অবশ্য আমি জানতাম যে, সেটা বলা বা বলার চেষ্টা করাটাও হবে একটা যুদ্ধ। এশিয়ার এই দুই বৃহৎ ভূখণ্ড, এই দুই বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর কিছু না হোক শত্রুতা ও অবিশ্বাসের ভাবটাও যদি দূর হয় তা হলে যে বিপুল শক্তি ও বল লাভ হবে তাকে ভয় করবার অনেক দেশ ও গোষ্ঠীর কারণ আছে।

যাবার আগেই ভেবেছিলাম সুযোগ পেলে সে-দেশে রবীন্দ্রনাথের কথা বলব। ইতিহাসের শাক্যসিংহ বুদ্ধ ও মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের মত এ-যুগে দেশে দেশে সেতু বেঁধেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এশিয়া বা য়ুরোপের যে-কোনো দেশেই যাই না কেন, সে-দেশ সম্বন্ধে তাঁর কিছু বক্তব্য আছে, যা সর্বদাই প্রগতিশীল অর্থাৎ সামনের দিকে মুখ ফেরানো। নানা দেশ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ভবিষ্যৎবাণীর মত সফল হয়েছে। কিন্তু ঐ যা বললাম, যাওয়া হবে কি না হবে, ঠিক না হওয়ায় গরম কাপড়চোপড়ও কেনা হয়নি, বইপত্রও গোছানো হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'টক্‌স ইন চায়না' বইখানা নিলাম ও শেষ মুহূর্তে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত জাপানী কবি নগুচিকে লেখা কবির ধিক্কারবাণী (উত্তর-প্রত্যুত্তর সমেত) একটি ছোট গ্রন্থ আমাকে সোমেন দিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা আমার নিজের কয়েকটি বইও নিলাম। বাক্সর ওজন কুড়ি কেজির বেশী হওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলবে না। সামান্য গরম কাপড়েই ওজন ভারী হয়ে যায়। এয়ারপোর্টে বিজয়বাবু বললেন, ওজন আরো খানিকটা কম নিতে হবে, কারণ বম্বে থেকে একখানা ভাল মার্বেল পাথর মুগ্ধেশ কোটনিসরা নিয়ে যাবেন। চাংসার কাছে সাওসান নামক স্থানে মাও-সে-তুং-এর যে স্মৃতিমন্দির তৈরী হচ্ছে সেখানে তাঁর মরদেহ রক্ষিত হবে। সেই অট্টালিকার এক পার্শ্বে ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটির শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপ ঐ প্রস্তরটি সংলগ্ন করা হবে। আমার ইচ্ছা ছিল এক কবির স্মৃতির উদ্দেশে আর এক কবির একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে দিই। ইংরাজীতে দেওয়া যেত—নানা কারণে তা হল না। যা হল তা মামুলী বাক্য। যাই হোক, এয়ারপোর্টে তাড়াহুড়ো করে ওজন কমাতে গিয়ে বইগুলিই বের করে দিলাম। তার মধ্যে অনবধানে 'টকস্ ইন চায়না'-ও পড়ে রইল।

চীন সরকার কলকাতা থেকেই তাঁদের দাক্ষিণ্য শুরু করলেন। আমাদের যার যার বাড়ী থেকে পিকিং যাওয়া, এক মাস চীন ঘুরে ঘুরে দেখা—সমস্ত খরচ তাঁরা বহন করবেন।

দিল্লী এয়ারপোর্টে নেমে প্রথম জনাব লতিফের সঙ্গে দেখা হল। অনেক দিনের পুরোনো কমিউনিস্ট, খঞ্জনাসা, সুদর্শন পুরুষ। ইনিই আমাদের চীনযাত্রা সফল করবার জন্য দিল্লীতে হোম ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। ইনিও চীনের পুরোনো বন্ধু, কত পুরোনো তা জানি না। এয়ারপোর্টে ফার্স্ট সেক্রেটারী লী ছিলেন—ইনি কলকাতায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে পার্টিতে এসেছিলেন। কাজেই পরিচিত ব্যক্তির মত কথা বলেছিলেন। আমার যেমন ব্যাপার, মুখ মনে থাকে না, নাম মনে থাকে না। আমি ভাবছি এটাই বোধ হয় চৈনিক রীতি, অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিতের মত কথা বলা। অনেক পরে বুঝেছিলাম রহস্যটা কি—উনি আমার চিনতে পেরেছিলেন! ইনি ইংরেজী বলেন, তা সত্ত্বেও দু'জন দোভাষী এসেছিল। সেদিন এয়ারপোর্টে ডেলিগেশানের অন্য ক'জন সদস্য, দিল্লীর ল' কলেজের অধ্যাপক দীনেশ পাণ্ডে, চণ্ডীগড়ের জার্নালিজমের অধ্যাপক তারাচাঁদ গুপ্ত, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট শিখ নেতা জগৎসিং ধিংড়া—এঁরা এসেছিলেন। শুধু দক্ষিণ ভারত থেকে যে মহাকবি শ্রী শ্রীর আসবার কথা ছিল তাঁর স্পেন কুয়াশার জন্য ফিরে গেছে। মহাকবি শ্রী শ্রী অর্থাৎ তেলেগু ভাষার তাঁর কবিতা এত ভাল যে, তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে 'মহাকবি' উপাধি দিয়েছে। আমরা মহাকবি সচরাচর ব্যবহার করি না। এক বাল্মীকি ও মধুসূদন দত্ত আর ইংলণ্ডে শেকসপীয়র মহাকবি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। শেলী কি মহাকবি? ওয়ার্ডসওয়ার্থ? টেনিসন? না, আমরা তা বলি না। কিন্তু এই মহা অর্থাৎ বিরাট ভারতভূমির সমস্যা এই যে, এক দেশের লেখক যত বড়ই হোক, অন্য দেশে তাকে চেনেই না। যাই হোক, হোটেলে এসে খেয়েদেয়ে আমরা তৈরী, এমন সময় মহাকবি শ্রী শ্রী এসে পৌঁছলেন।

সেইদিন বিকালে একটি প্রেস কনফারেন্স ছিল। লতিফ বলতে লাগলেন যে, শেষ পর্যন্ত অনিশ্চয়তা ছিল বলে বেশী কাউকে খবর দেওয়া যায়নি। দিল্লীর বিরাট বিরাট সভাগৃহের কাছে স্থানটি খুবই গরীব চেহারার। দেখে আমার প্রথম যুগের ইসকাস-এর সভাগুলির কথা মনে পড়ে একটা নস্‌টালজিয়া হল। তারপর সেখানে সভা যখন বেশ জেঁকে উঠেছে তখন থেকে আর আমি যাই না। গরীবের দলে থাকাই ভাল। প্রেস কনফারেন্সে ভিয়েৎনামের অ্যামবাসাডর ও চীনের রাষ্ট্রদূত চিন চাও ইয়েন উপস্থিত ছিলেন। চিন চাও ইয়েন মিষ্টভাষী সুশ্রী। তাঁর ভাবে অ্যামবাসাডরিয়ল হিজ একসেলেন্সী ভাব একেবারে নেই। সঙ্গে বেশী খিদমদগারও নেই। সকলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আলাপ করলেন। ঐ সভায় ডাঃ কোটনিসের আন্তর্জাতিকতার কথা আলোচনা হল। আলোচনা-প্রসঙ্গে একবার মাত্র রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখিত হয় ও আমাকে তাঁর ভাগ্নী বা ভাইঝি অর্থাৎ 'নিস্' বলা হয়। আমি আর তাতে আপত্তি করলাম না, ভাগ্নী হওয়া বা না-হওয়ার আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কিছু ইতরবিশেষ হয় না। যা হোক, আমি তখন থেকেই ভাবছি আমি যে চীনদেশে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা বলব তার সূত্রটা কই? অথচ সেটা দরকার। কারণ, জওহরলাল যতই আন্তর্জাতিকতার কথা বলে থাকুন তা হল রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকতা। রাজনৈতিক জগতে তার মূল্য অন্যান্য ঘটনার উপর নির্ভরশীল। তাঁর জীবদ্দশাতেই তো তার প্রমাণ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তার চেয়ে অনেক মৌলিক, তা মানবজীবনের গভীরতর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ডাঃ কোর্টনিস মেমোরিয়াল কমিটির একটি অনস্বীকার্য দান যে, চীনের সঙ্গে শত্রুতার দুর্যোগের মধ্যে একটি সূত্র ধরে ক্ষীণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে। ডাঃ বিজয় বসু অনেককে আকুপাংচার শিখিয়ে সে বন্ধনকে দৃঢ় করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুটি দেশের মধ্যে মিত্রতার প্রশ্নে তাকে আরো বহু দিকে বিস্তৃত করতে হবে। আকুপাংচার একটি চৈনিক বিদ্যা বটে, কিন্তু সেইটুকু পর্যাপ্ত নয়। তাই সেদিন কেবলই ভাবছিলুম যে, চীনে গিয়ে কি রবীন্দ্রনাথের কথা আর বলা যাবে? এখানেই তো পারলুম না। কারণ, বাংলাদেশ (দুই বাংলা নিয়ে) ছাড়া ভারতের অন্য প্রদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই এবং বাংলাদেশের কোনো প্রচেষ্টাই নেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বিস্তৃত করবার। চীনের চেয়ে পশ্চিমের ইংরেজীভাষী দেশগুলো আমাদের অনেক কাছে। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ প্রায় বিস্মৃত।

আমেরিকায় ডাঃ অণিমা বসু উরস্টার কলেজে বক্তৃতা দিতে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রথম দিন একটি বাড়িতে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলব শুনে তিনি জানতে চাইলেন, রবীন্দ্রনাথ কে? আমি বললাম, আপনি কি রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেন নি?—তিনি বললেন, না, ঐ শব্দটা কি বোঝায়—এ প্লেস অর এ পারসন? তারপর আমার বিস্ময় দেখে তিনি বললেন—না, পারহেপস আই অ্যাম নট কালটিভেটেড্ এনাফ! (আমি হয়তো যথেষ্ট শিক্ষিত নই)।

আমি বললুম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে একমত হতে হচ্ছে।

প্রেস কনফারেন্সের পর আমরা যাত্রীদলের একসঙ্গে বসে দু-একটি কথা আলোচনা করলাম। তখনই মহাকবি শ্রী শ্রী জানালেন যে, তাঁর কোনো এক সিনেমা ডিরেক্টরের সঙ্গে কনট্রাকট রয়েছে যিনি তখন বিদেশে। কিন্তু দিন দশেকের মধ্যে ফিরে আসবার কথা। ফিরে যদি তিনি টেলিগ্রাম করেন তাহলে মহাকবিকে দশ দিন পরই চলে আসতে হবে। আশ্চর্য কথা এই যে, তাতেই সকলে রাজী হয়ে গেলেন। আমি ভাবলুম এত খরচ করে যারা নিয়ে যাবে মধ্যপথে ফিরে আসলে তারা কি ভাববে। অনেক ডেলিগেশনেই দেখেছি সব সময়ই এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।

রাত্রে চীন দূতাবাসে একটি বিরাট পার্টি ছিল, শতাধিক মানুষ হবেন! এই নিমন্ত্রিতের নির্বাচন কিভাবে হয়েছিল জানি না, কারণ এর মধ্যে কমিউনিস্ট মতাবলম্বীর সংখ্যা বেশী নয় বলেই মনে হল। তবে বর্ণচোরা আম কত থাকে! আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে, তথা সব মতের নেতাদের সম্বন্ধেই শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি আমরা। এটা দুঃখের। অথচ কি আগ্রহ নিয়েই না কমিউনিস্ট দেশে চলেছি।

ঐ যা বলছিলাম—নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নাভার মহারানী ছিলেন। নাভা পাঞ্জাবের একটি এস্টেট। স্বাধীনতা-যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য নাভার মহারাজকে ইংরেজরা জেলে রেখেছিল। তবে নিশ্চয় রাজকীয় জেল। কারণ, বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি জেলে গেলে মহারানীও গিয়ে তাঁর সঙ্গে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর সন্তানাদির জন্ম হয়। তারপর মহারাজাকে ইংরেজরা কোথায় সরিয়ে ফেলে তার পাত্তা নেই। এঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, চীনের সঙ্গে তাঁর কি সংযোগ? তিনি এই দূতাবাসে নিমন্ত্রিত কেন? তাতে তিনি বললেন, ভারত-চীন সম্পর্ক দূষিত হওয়ার পরেও সর্বদাই তিনি এদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। কারণ, তাঁর মনে হয়েছে সমস্ত দেশ যখন একটা বিষয় নিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে তখন তাদের বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। সে সময় কিছু মানুষ থাকা দরকার যারা একটু নির্লিপ্তভাবে উভয় পক্ষকে সমদৃষ্টিতে দেখে সত্যাসত্য বিচার করতে পারে। তারাই শান্তির দূত। ঠিক এই কথা না হলেও মোটামুটি এই তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। আমি বিস্মিত ও খুশী হলাম। বড় বড় ইনটেলেকচুয়ালদের মুখেও এমন সরল সত্যবাণী শোনা যায় না।

চীন দূতাবাসে ঢুকেই মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে দেখা হল। অর্থাৎ দেওয়ালে টাঙানো, ফ্রেমে বাঁধানো মাও-সে-তুং-এর কবিতার সঙ্গে। ঘরে ঘরে তাঁর আলোকিত উপস্থিতি। কবিতা দুটি পড়িয়ে নিলাম—পোলিটিক্যাল কবিতা নয়, কোথায় কোন গিরিশৃঙ্গে বরফ পড়ার বা ঐ জাতীয় প্রকৃতি বিষয়ক—তবে তার মধ্যে অন্য কোনো নিহিতার্থ আছে কি না জানি না। থাকতে পারে।

ককটেল পার্টির পর আমরা ক'জন, মিঃ লর্ডিক এবং তাঁর স্ত্রী রয়ে গেলাম নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণে। একটি মেয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি এই শাড়ি পরেই চীন ভ্রমণ করবেন? আমার কোর্টটি দেখে বললেন, এইরকম কোট ছাড়া ভারি কোট সঙ্গে নেননি? আমাদের বেশভূষা তাঁর আদপেই মনঃপূত হল না। তাঁরা বলতে লাগলেন, পিকিংএ এখন বরফ জমানো ঠান্ডা। জিরো ডিগ্রীর অনেক নীচে নেমে গেছে। সেইরকম অবস্থাটা কি তা অনুমান করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই কি আর করা যাবে মনে করে চুপ করে রইলাম। মেয়েটি আবার অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেল। ঠান্ডার কথা ভেবে একটু চিন্তিত হলেও ঠান্ডার ভয়ে পিকিং যাব না এত ভীতু আমরা কেউই নই। দেখা যাক, যা হয় হবে মনে করে বসে আছি—মেয়েটি এসে জানাল, 'টেলেক্স করে দিয়েছি, তোমাদের সবার জন্য বড় ওভারকোট এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকবে।' তখন আমার রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিন' কবিতাটি মনে পড়ল। আমি রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আজ রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখিত হতে শুনেছেন কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানেন কি? তিনি জানালেন যে, জানেন। তিনি একজন কবি এবং শান্তিনিকেতনে চীনা ভবন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ কথা শুনেছেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। চীনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক, তিনি কতবার ওদেশে গিয়েছেন কিছুই জানেন না। এ-যুগে যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয়, যিনি চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এ কথা আমরাই যদি ভুলে যাই, অন্যেরা কি ভুলবে না? জওহরলাল যখন প্রথম এশিয়ান কনফারেন্স ডেকেছিলেন তখন অনেক ইন্টারন্যাশনালিজমের কথা হল কিন্তু ঐ ভাবের উদ্যোক্তা ও প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথের নামই উল্লেখ হয়নি।

আমি চীনের রাষ্ট্রদূতকে কবিতাটি শোনালাম। রোগশয্যায় শুয়ে যে কবির চীনের কথা মনে পড়ল, এতে বোঝা যায় সেই দেশের মানুষের প্রতি তাঁর প্রীতির কথা—

জন্মবাসরের ঘাটে,
নানা তীর্থে পুণ্য তীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ।
একথা রহিল মোর মনে
একদা গিয়েছি চীন দেশে
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন
তুমি আমাদের চেনা বলে
খসে পড়ে গিয়েছিল
কখন পরের ছদ্মবেশ
দেখা দিয়েছিল তাই
অন্তরের নিত্য যে মানুষ
অভাবিত পরিচয়ে।

ভদ্রলোক চমৎকৃত হয়ে গেলেন—এ কবিতার কথা তিনি কখনো শোনেননি। চীনারা জাত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি। কবিতায় ভাষা বোঝে। তাই তাদের বরণীয় নেতা তাদের সঙ্গে পলিটিক্যাল কথাও কবিতার ভাষায় বলেছেন—এর গভীরতা ও গুরুত্ব কতখানি তা ক্রমে ও-দেশে গিয়ে বুঝতে পারলাম।

ককটেলের খাদ্য ছিল ইয়োরোপীয়, ডিনারে চৈনিক। চোদ্দটি পদ। দীনেশ পাণ্ডের স্ত্রীও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তার জন্য ৮।১০ পদ নিরামিষ।

৫ তারিখ সকাল ৯টায় দিল্লী থেকে বম্বে পৌঁছনো গেল। আমরা উঠলাম বম্বের ওবেরয় সেরিটন-এ। এখানে আমাদের আতিথ্য করছেন সুইস এয়ার। জাঁকালো হোটেল। ঝকঝকে করে সাজানো। শুনলাম আমেরিকান প্যাটার্ন। দেশটা আমাদের, প্যাটার্নটা আমেরিকান কেন, কে জানে। দাম খুব চড়া। বসু দম্পতি বাইরে খেতে গেলেন—তাঁদের মিল টিকিট দুখানি আমাদের দিয়ে গেলেন। মহাকবি খাদ্য খেলেন না। দীনেশ জ্ঞানসিং ও আমি পাঁচখানা মিল টিকিট দিয়েও পেট ভরাতে পারতাম না, যদি না দীনেশ অনেক কৌশলে খাদ্য নির্বাচন করতেন।

৬ই ডিসেম্বর বম্বে এয়ারপোর্ট থেকে সুইস এয়ারে আমরা পিকিং-এর পথে যাত্রা করলাম। বম্বের চীন-ভারত মৈত্রী সমিতির কর্মী অরবিন্দ এয়ারপোর্টে আমাদের ছবি তুললেন। এখানে কোর্টনিস পরিবারের অন্য দু-একজন ব্যক্তিও ছিলেন।

প্লেনে বসে সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম—শেষ পর্যন্ত চীন দেখা হচ্ছে। কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! চীন যে কত দূরের দেশ, স্থানের দূরত্ব নয়, দুর্গমতার দূরত্ব। মহম্মদ নাকি বলেছিলেন, শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেয়ো। তা আমিও শিক্ষার জন্যই যাচ্ছি। মহাপুরুষদের উপদেশ শোনা ভালো। তা কিরকম শিক্ষা হবে, কে জানে। আমার কিরকম একটা নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগল, মনে হয় যেন রকেটে করে চাঁদে যাচ্ছি। চীন সম্বন্ধে, চীনের মানুষ সম্বন্ধে একটা অপরিচয়ের ভীতি আমার অবচেতন থেকে উঠে এল। তা ছাড়া সঙ্গীরাও অপরিচিত, অন্য জাতের। তাই জীবিলুম মহাকবির সঙ্গে একটু গল্প করা যাক, ওঁর সঙ্গে তো জাতে মিলবে, আমি মহৎ না হলেও ক্ষুদ্র কবি। তা দেখি, তিনি মুখের উপর মাফলার রেখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এই অভাবনীয় যাত্রা তাঁর মনে কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করেনি। যদি করে থাকে তবে তা দোলনার মত তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলছে।

এমন সময় সুইস এয়ার থেকে একটি ম্যাপ দিয়ে গেল। বসে বসে ম্যাপের লাল রেখাটি দেখতে লাগলাম, সুইস এয়ারের গতিপথ। আমরা বম্বে থেকে ভারতের উপর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পার হয়ে বাংলা দেশের ও ব্রহ্মদেশের মাথা ছুঁয়ে য়ুনান প্রদেশে চীন ভূমিতে প্রবেশ করব। কলকাতার উপর দিয়ে যাবার সময় গঙ্গার বদ্বীপগুলি বেশ বোঝা গেল। বেশ লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে সমুদ্রের নীল জল ছুঁয়ে আছে। আমরা ৯টা ৪৫ মিনিটে বম্বে ছেড়ে ৬টা ২৫ মিনিটে পিকিং পৌঁছব। মাত্র ৯ ঘণ্টার পথ। মনে হয়েছিল চাঁদে যাচ্ছি, তা পিকিং-এর দরজায় চন্দ্র সূর্য দুজনেরই সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা উত্তরমুখী চলেছি, পূর্ব দিকে চন্দ্র আর পশ্চিম দিকে সূর্য—দু দিকের জানলা দিয়ে এক সঙ্গে দেখা গেল—নীল সমুদ্রের মত আকাশে সাদা সাদা তুলোর ঢেউয়ের দুই প্রান্তে উজ্জ্বল দুটি মণ্ডল জ্যোতি বিকীর্ণ করছে। এরকম দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি। মহাচীনের প্রবেশপথে চন্দ্রসূর্যের এই যুগ্ম অভ্যর্থনায় মন প্রসন্ন হল।

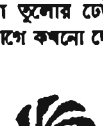

মহানগরী পিকিং-এ পৌঁছলাম—তখন সন্ধ্যা, কিন্তু মনে হল যেন গভীর রাত্রি। প্লেনে আমাদের সঙ্গে বিদেশী বিশেষ কেউ ছিল না। বম্বে থেকে কে আর পিকিং যাচ্ছে! ছিল কিছু চীনা। এয়ারপোর্টও নির্জন। বরফ পড়ছে। কোনো মতে জামাকাপড়-ব্যাগ সামলিয়ে বাসে ওঠা গেল। একটু পরেই বাস টারমিনালে এসে থামল। অন্ধকারের মধ্যে লম্বা কালো ওভারকোট পরা দুজন ছায়ামূর্তি বাসে উঠে এলো। শুনতে পেলাম একজন

BanglaBook.org

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছে, "মেম্বারস অব দি ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি, ফলো মি, আদারস প্লিজ রিমেইন সীটেড।" (কোটনীস স্মৃতি সমিতির সভ্যরা আমাকে অনুসরণ করুন, অন্যরা বসে থাকুন) ইংরেজদের মত নয়, বিলিতী স্কুলে পড়া ভারতীয়ের মত উচ্চারণ। আমরা উঠে পড়লাম। একে একে বাস থেকে নামছি। পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে আমার ভাঙ্গা পায়ে নড়বড় করে নামাটা অন্ধকারেও কারো গোচর হবে ভাবিনি। কে একজন হাত বাড়িয়ে সন্তর্পণে আমার হাত ধরে সাহায্য করলে—'ওয়াচ আউট' (লক্ষ কর)—এবারে গলার স্বরটা আমার ভালো লাগল, যেন বহু দিনের পরিচিত। পরে বুঝেছিলাম সে লী। আমার এক মাসের প্রবাসবাসের নিত্যসঙ্গী হয়েছিল। তাকে মনে পড়লে মনে হয় চীন দেশে আমার একটি পুত্র আছে। আত্মীয় আছে।

এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ পরিচ্ছন্ন, বড় বড় সোফা, সামনে ছোট ছোট টেবিলের উপর ঢাকা-দেওয়া চায়ের পেয়ালায় চায়ের পাতা দেওয়া আছে, জুঁই ফুল মেশানো। আমরা গিয়ে বসবার পর কয়েকজন অল্পবয়সী মেয়ে, অলিভ রঙের গলাবন্ধ কোট পরা, বড় বড় ফ্লাস্ক থেকে গরম জল সেই পাতার উপরে ঢেলে দিল। এইরকম ব্যবস্থা সর্বত্র। ও-দেশে কোথাও 'টী-পট' ব্যবহার হতে দেখিনি। পরিচরপর্ব চলছে—সেই সঙ্গে সঙ্গে ধূমায়মান ওডিকোলন নিষিক্ত তোয়ালে চিমটে দিয়ে দিয়ে আমাদের পরিবেশন করলে। ওদের এই ভেজা গরম তোয়ালে দিয়ে অভ্যর্থনা বড় সুন্দর। আগে আমরা যখন খালি পায়ে হাঁটতাম তখন এদেশে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনের জল দেওয়া হত। কিন্তু এই তোয়ালে বড় কালোপযোগী। গরম তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে নিলে ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। জাপানেও এই নিয়ম আছে। আজকাল ইয়োরোপের প্লেনে এর অনুকরণ হচ্ছে। বি-ও-এ-সি-র প্লেনেও তোয়ালে পরিবেশন করতে দেখেছি। আর প্লেনে সর্বদাই 'ফ্রেশনার' বলে প্যাকেট মোড়া যে সুগন্ধি ভেজা রুমাল দেওয়া হয় তাও মনে হয় এই চীনা ও জাপানী প্রথার অনুসরণ। এক দেশের এইরকম সুপ্রথাগুলি অন্য দেশের অনুকরণযোগ্য।

আমাদের অভ্যর্থনায় চীন ও ভারতের বহুদিনের মৈত্রীর কথা বারবার উচ্চারিত হল। অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন চীনের বিদেশের মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান ওয়াং পিন্ নান ও ভাইস চেয়ারম্যান ইয়াং চি ও অন্যান্য অনেকে। মিলিটারি জেনারেলও একজন ছিলেন। প্রথমেই মনে হল এসব ব্যাপারে আবার মিলিটারী কেন? আমাদের মিলিটারি সম্বন্ধে একটা অনীহা আছে। "মিলিটারী মেজাজ" কথাটা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, চীনারা সেসব অর্থ বদলে দিয়েছে। ওরা এরকম অনেক শব্দেরই অর্থ বদলে ফেলেছে। শব্দটা একই কিন্তু ভাবটা অন্য। তাই প্রথম কিছুদিন আমার বুঝতে সময় লেগেছে।

ভারত সরকার থেকে আমাদের আম্বাসাডার শ্রীনারায়ণন্ ও তাঁর বর্মী পত্নী উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন সস্ত্রী, সুভাষ শ্রীমেনন। পরে আমাকে কেউ কেউ বলেছিলেন শ্রীনারায়ণের উপস্থিত থাকার অর্থ আমরা ভারত সরকারের প্রেরিত ডেলিগেশন রূপে গণ্য হচ্ছি। কথাটা হয়তো ঠিকই। কারণ, সোভিয়েট দেশে বা যেখানেই ডেলিগেশনে গিয়েছি, আমাদের দূতাবাস থেকে কেউ উপস্থিত আছেন এমন দেখিনি। আমি যতবার যত দেশে গিয়েছি, কোথাও আমাদের দূতাবাসের অস্তিত্বই আমার গোচরে আসেনি। তাঁরা যে আমাদের সাহায্য করবার জন্যই ওখানে রাজার হালে আছেন সে কথা তাঁদের বা আমাদের সচরাচর স্মরণে থাকে না। শুধু একবার রুমানিয়াতে অবাঙ্গালী একজন দক্ষিণ ভারতীয়, এম্ব্যাসীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী বড় যত্ন করেছিলেন, সেটা ব্যক্তিগত। যা হোক, শ্রীনারায়ণ আমায়িক ও ভদ্র। চীনারা ছাড়া বেশ কয়েকজন ইয়োরোপীয় দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এবং তখনই স্থির করলাম এদের একজনের সঙ্গে অন্তত বেশীক্ষণ কথা বলবার সুযোগ করতে হবে জ্ঞাতব্য তথ্য জানবার জন্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন রুই আলি নামে প্রসিদ্ধ নিউজিল্যাণ্ডবাসী লেখক ও কবি। তিনি পঞ্চাশ বছরের উপর এদেশে বসবাস করছেন, যদিও নিজের দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। এডগার স্নো-র বইতে এঁর কথা উল্লেখ আছে। আর ছিলেন মা-হাই-তে যাঁর অপর নাম জর্জ হাতেম। তাঁর স্ত্রী সু-ফেই। ডাঃ হান্সমুলে ও ডাঃ রিচার্ড ফ্রাই—একজন জার্মান ইহুদী, অন্যজন অস্ট্রিয়ান। এতগুলি বিদেশী এ-দেশে কি করছে এবং কেনই বা প্রথম দিনই আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছে তা পরে বুঝতে পারলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ'রা সকলেই ডাঃ কোটনিসের বন্ধু দিলেন। আমি তাঁদের বললাম, আমি একটা বই লিখব, আমার আপনাদের একটু সাহায্য করতে হবে। তাঁরা বললেন, একটা কেন দুটো বই লেখো—অবশ্য সাহায্য করব। এ'দের মধ্যে রুই আলিকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগল।

লাউঞ্জ থেকে বেরুবার আগে ভারি গরম ওভারকোটগুলি আমাদের দেওয়া হল। ওরকম কোট আমাদের দেশে কারুই কাজে লাগে না—অতএব আমাদের যা কোট ছিল তা নিতান্তই পাতলা। বাইরে শুধু বরফ পড়ছে নয়, ঠাণ্ডা হিম বাতাস। একখানি বড় কালো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল—সেটি দলপতির জন্য। আর ছিল ছাই রঙের অনেকগুলি গাড়ি। আমি ও বৎসলা, সঙ্গে একজন ইণ্টারপ্রেটার, একটা গাড়িতে উঠলাম। সে কে, আজ আমার স্মরণ নেই। কারণ, সেই মুহূর্তে তারা কেউই আমাদের কাছে বিশেষ হয়ে ওঠেনি। পরিচয় ও অপরিচয়ের পার্থক্য এই। বরফ-ঢাকা নির্জন বনভূমির মধ্য দিয়ে অজানা পথ দিয়ে আমরা চলেছি—দু ধারে নিষ্পত্র বৃক্ষের ছায়াহীন অরণ্য, পথের আলোতে মৃদু আলোকিত। হেডলাইটের আলো ও রাস্তার আলো মিলে পথে যেন আগুনের আভা, এরকম আলো নাকি কুয়াশা কেটে চলতে পারে। আমেরিকাতেও ব্যবহার হয়, কিন্তু সেখানে শীতকালে আমি থাকিনি। চলতে চলতে আগ্রহভরে দেখতে লাগলাম—পথ জনহীন, মাঝে মাঝে ২।১টা সাইকেল, ট্রাক ও ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। বড় বড় সোনালী অক্ষরে লাল বনাতের উপরে বাঁধানো লেখা মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে। মাঝখানে একটি স্তম্ভ ঐ রকম লেখায় সজ্জিত। ছবির মত লেখা, ছবির মতই সযত্নে আঁকা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওগুলো কি? দোভাষী বললে,—শ্লোগান। আমি চমকে উঠলাম। আমার ভালো লাগল না। ওই লেখাগুলো এত সুন্দর যে, কথাটা বেমানান মনে হল। কারণ, আমাদের কাছে শ্লোগান কথাটার সঙ্গে একটু নিন্দা জড়িয়ে আছে। শ্লোগান হচ্ছে বুলি—শূন্যগর্ভ কথা। কেন এরকম অর্থ হয়েছে ঐ শব্দটার? কারণ, আমরা বরাবর দেখছি শ্লোগান-রূপে যেগুলো উচ্চারিত হয় মানুষকে উদ্যোগী উৎসাহী করবার জন্য, কাজে তা করা হয় না। এরকম বহু শ্লোগান আছে, তবে এখনই একটা মনে পড়ছে—'গরিবী হঠাও'। যদি সত্যি গরীবি হটত তাহলে ওটা সারগর্ভ বাণী হত। যেহেতু সে উদ্যোগ কোথাও সত্য হয় না তাই ওটা বুলি হয়ে গেল। এইরকম বার বার হয়ে হয়ে শ্লোগান শব্দটার যে অর্থটা আমাদের কাছে প্রতিভাত, চীনে সে অর্থ নয়। ওখানে ওগুলো সত্যগর্ভ বাণী। Grasp Revolution and increase production.

এটা শ্লোগান, কিন্তু ব্যর্থ শ্লোগান নয়। এ-কথা ক্রমে যখন স্পষ্ট হতে লাগল তখনই বুঝতে পারলাম—ওদের ভাষা ও আমাদের ভাষায় পার্থক্য আছে। একই শব্দ আমাদের যা বোঝায়, ওদের কাছে তা অন্য ভাব প্রকাশ করে।

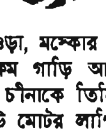

পিকিং শহরের বড় রাস্তা খুব চওড়া, মস্কোর মতই—তবে গাড়ি বিশেষ নেই। ট্রাক, জীপ, মালবাহী বলদপাতিবাহী নানারকম গাড়ি আছে। আর আছে সাইকেলের স্রোত। মাও-সে-তুং নাকি বলেছিলেন, প্রত্যেক চীনাকে তিনি একটি সাইকেল দেবেন। তা বোধ হয় দিয়ে গেছেন। সাইকেলে কেউ কেউ মোটর লাগিয়েছে, কেউ বাক্স বেঁধেছে। ক্রুশ্চেভ নাকি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, দুজন চীনের জন্য একটা করে প্যান্ট থাকে, আর ছজন চীনার মধ্যে একটা সাইকেল। সত্যি বলেছিলেন কিনা জানি না। যদি বলে থাকেন, অন্যায় করেছেন। গুলির আঘাত মানুষ ভুলতে পারে, বিদ্রূপের আঘাত ভোলে না। ট্রলি-বাস ও ওমনিবাস চলে। যথেষ্ট ভিড়। ট্রাম নেই। মেট্রো আছে—আমি দেখিনি, অন্যরা দেখেছিল।

পিকিং হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে আমার মনে পড়ল আমি আর একটা হোটেল পিকিং-এ থেকেছি, সেটা মস্কোতে। আজ এই দুই নামে কত পার্থক্য হয়ে গেছে! এ হোটেলের দুটো অংশ, পুরোনো অংশটা শুনলাম ফরাসীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল, নূতন অংশটা পরে তৈরি। হোটেলটি বেশ বড়, ঝকঝকে পরিষ্কার, তবে জাঁকালো নয়, বাহুল্য বর্জিত। হোটেলে ঢুকে সোজা এগিয়ে এসে দু দিকের এলিভেটারগুলির মাঝখানের দেওয়ালে লাল কাপড়ের উপর সোনালী অক্ষরে সুশোভিত ইংরেজী লেখা—'উই হ্যাভ আওয়ার ফ্রেন্ডস্ ইন এভ্‌রি কান্‌ট্রি।' মাও-সে-তুং-এর বাণী আলোতে জ্বলজ্বল করছে। আমাদের মধ্যে একজন রেভলিউশনারী ঐ বক্তব্যের সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ করে গর্বভরে আমার দিকে তাকালেন। আমিও তখন মনে মনে আর এক কবির রচনায় একাত্ম হয়ে গর্ব বোধ করছিলাম—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে
আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে যাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া!

আমার সঙ্গে এই কবিতা আবৃত্তি করতে পারে এরকম কেউ সেখানে ছিল না কিন্তু কবিতাটা মনে পড়তেই আমার নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে গেল। আমি ঐ জ্বলজ্বলে লেখাটার দিকে তাকিয়ে সত্যকে নমস্কার করলাম। সত্য একই তা যে দেশে যার মুখেই উচ্চারিত হোক।

AMARBOI.COM

আমি একজনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার এই চীন ভ্রমণের কাহিনীতে আমি কিছু বাদ দেব না। অর্থাৎ আমি তার হাত ধরে যেখানে যেখানে গিয়েছি, যা কিছু দেখেছি সব দেখিয়ে দেব! অবশ্য সব আমার মনে পড়বে না। তবু যা পড়ে, তাতে তাই অনেক সামান্য কথা থাকবে। বিজ্ঞেরা মনে করবেন, এ আবার লেখবার কি হল। কিন্তু যারা আমার সঙ্গে ভ্রমণ করতে চায় তারা খুশী হবে।

আমরা বোধহয় পাঁচতলায় আশ্রয় পেয়েছিলাম—এক-এক ঘরে দুজন করে। আমি আর বৎসলা দুই নারী একটি ঘরে আশ্রয় পেলাম। আমার ভালই লাগল। বিদেশে আমার হোটেল-ভীতি হয়ে গেছে। একলা ঘরে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। আমি বললাম, "ডাঃ কোর্টনিস, আমরা সব সময় এক সঙ্গে থাকব।" তিনি বললেন, "দেখা যাক।"

পিকিং হোটেলে বিলিতি খাবারও পাওয়া যায়; কিন্তু আমরা বললাম চীনে এসেছি চীনে খাওয়াই উচিত—শুধু সকালের প্রাতঃরাশ হোক বিলিতী। প্রথমেই ওরা জিজ্ঞাসা করল, আপনারা তো বীফ খান না! সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, না না। আমার আশ্চর্য লাগল—এত রেভলিউশনের কথা বলি অথচ সামান্য সংস্কার ছাড়তে পারি না। কোনো জিনিস খাওয়া না-খাওয়া অভ্যাস ও রুচির উপর নির্ভরশীল, সেটা ঠিকই। কিন্তু বীফ খাওয়া তো তা নয়, তাতে জাত যায়। শাস্ত্রে নিষেধ। এই নিয়ে একটা দেশ ভাগ হয়ে গেল। কোথায় গরুর হাড় পড়ে আছে, তাই নিয়ে মানুষের হাড় বার করা হয়েছে কতকাল ধরে। কেউ কেউ হ্যামও খান না। প্রথম দিনই বুঝলাম, ওখানকার চীনা খাবার কলকাতার হোটেলে আমরা যেমন খাই তার চেয়ে অন্যরকম।

ভোরবেলা উঠে পর্দা সরিয়েই দেখা গেল অদূরে নিষিদ্ধ নগরী—ও থিয়েনানমেন স্কোয়ার এবং স্বর্গীয় শান্তির দ্বার (গেট অব হেভেনলি পিস) সব বরফে ঢাকা। মস্কোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেড স্কোয়ারের মত ঐখানেই সব বড় বড় জমায়েত হয়। ঐখানেই জনতা অপেক্ষা করে ছিল, যখন মাও-সে-তুং গেটের উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। আর তার পাশেই গেটের উল্টো দিকে গ্রেট হল অব দ্য পিপ্‌ল—ঐখানেই যত মহতী সভা, অভ্যর্থনা, ব্যাঙ্কোয়েট। আবার ঐখানেই চীনের মহান নেতা শেষশয্যায় শায়িত ছিলেন আর দেশবাসী তাঁদের অশ্রুজলের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

৭ই ডিসেম্বর খাবার টেবিলে আমাদের জানানো হল যে কিছু পরেই কমিটি ফর চাইনীজ পিপ্‌লস এসোসিয়েশন ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কানট্রিজ-এর একজন বিশিষ্ট সভ্য আমাদের সঙ্গে আমাদের ভ্রমণের স্থানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসবেন। এই সমিতিই আমাদের নিমন্ত্রণ করেছে।

পিকিং-এ প্রথম রাত্রি খুব আরামেই আমরা নিদ্রা দিয়েছিলাম। ঘর যথেষ্ট গরম ছিল। কিন্তু নিদ্রা হয়নি শুধু জ্ঞানসিং ধিংড়ার। ইনি এক বর্ণও ইংরেজী বলতে বা বুঝতে পারেন না। এর ঘরে সঙ্গী ছিলেন 'মহাকবি'। মহাকবি দাক্ষিণের লোক, সম্ভবত তিনিও হিন্দী বোঝেন না। তিনি প্রচুর ধূমপান করেন এবং মদ্যও। এদিকে ধিংড়াজী ওসব রসেই বঞ্চিত। বন্ধ ঘরে কয়েক প্যাকেট ধূমপানের পর ঘর যখন ধোঁয়ায় ভরা, জ্ঞানসিং-এর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল—তিনি ভাবলেন, একটু বাইরে যাই। আর তক্ষুনি জ্ঞানসিং-এর মতে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হল—আসলে দুটো অ্যাকসিডেণ্ট। জ্ঞানসিং বেচারা এই প্রথম ভারতের বাইরে পা দিয়েছে। হোটেলের তালাচাবির রহস্য কিছুই জানা নেই। ডাঃ বাসু বলেছিলেন বটে এখানে তালা বন্ধ করার দরকার নেই, কিন্তু সেকথা প্রথম দিকে আমরা কানে নিইনি। যাহোক, চাবিটা টেবিলের উপর রাখা ছিল। জ্ঞানসিং ধূমায়িত ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা টেনে দিতেই তালা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আর উপায় নেই। মহাকবির মদ্যতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙেই না। তখন সারা রাত পায়চারি করে ভোরের দিকে রিসেপশনে কাউকে পাওয়া গেল, যে বুঝতে পারল এবং 'মাস্টার কী' দিয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে তিনি ভাবলেন চানটা সেরে নিই। শীতের শেষ রাতে চান শুরু করে বিজাতীয় কলগুলি চালাবার কৌশল না জানা থাকায় ঠাণ্ডা বরফজলে স্নান শেষ হল। আমেরিকাতে আমারও একবার ওই অবস্থা হয়েছিল। সেখানে আবার যেন প্রত্যেকটি তলার কৌশলই পৃথক। গভীর রাত্রে গৃহস্থকে বেল বাজিয়ে ঘুম ভাঙাতে হল। তিনি জড়িতকণ্ঠে বললেন, "তোমায় যে চাবী দিয়েছিলাম!"

'খুলছে না।'

'ওহো, ভুলে গিয়েছিলাম বলে দিতে যে, বাঁদিকে একটু চেপে ঘোরাতে হয়!'

ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা মং সিইন জু (Meng Hsein ju)-এর সঙ্গে মিটিং-এ বসলাম আমাদের ভ্রমণ-তালিকা স্থির করবার জন্য। প্রথমে একটি তালিকা ছিল, তাতে উত্তরের কোনো কোনো স্থানে যাবার কথা ছিল, কিন্তু শীতের ভয়ে সেগুলি বর্জন করে দক্ষিণের দিকে যাওয়া স্থির হল। আমার মত অজ্ঞ লোক কিছুই বলতে পারল না, কোথায় গেলে ভাল। কিন্তু অন্যরা রীতিমত আলোচনা করে স্থানগুলো ঠিক করলেন। এবং পূর্বে ওরা যে প্রোগ্রাম দিয়েছিল তার অদলবদল হয়ে গেল। যেমন, আমাদের দারিয়ন যাবার কথা ছিল, তার বদলে যাওয়া হল 'কুইলীন'। তারপর ছিল উইশি (Wusih), তার বদলে 'কুন্‌মিন' ও 'শিগোয়া পাস্না' যাওয়া স্থির হল। কাজেই চোখ বেঁধে ঘোরাবার প্রশ্নটা এখানে একটু বদল হয়ে যায়। কারণ, তাদের 'সাজানো' জায়গায় তো আমরা গেলামই না। আর আমাদের জন্য কত জায়গাই বা সাজাবে?

ভ্রমণ-তালিকা তৈরী হয়ে গেলে মং বললেন, আপনাদের জামাকাপড় যথেষ্ট নয়। আপনারা এখন দোভাষীদের নিয়ে ফ্রেণ্ডশিপ স্টোরে যান ও সেখানে গিয়ে গরম গেঞ্জি জাতীয় জিনিস কিনে ফেলুন। প্রত্যেককে এক-একটি খামে ১৩০ ইয়ান করে দেওয়া হল। শুনলাম এক ইয়ান ভারতীয় চার টাকার তুল্য। কিন্তু জিনিসের দাম অনুসারে তা চেয়ে বেশীই মনে হল। ফ্রেণ্ডশিপ স্টোর মাঝারি গোছের ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। শৌখিন জিনিস অনেক আছে। জড়োয়া গহনা পর্যন্ত। পুরোনো চৈনিক শিল্পবস্তু, জেড ইত্যাদির ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুমূল্য হাতির দাঁতের গৃহসজ্জা, কাঠের খোদাই করা পর্দা ইত্যাদি মনোরম মূল্যবান জিনিসে তিনতলা ভরা। অন্য তলায় দরকারী জিনিসপত্র। শৌখীন জিনিসগুলি বেশির ভাগই বিদেশীরা কেনেন—রপ্তানিও হয়। আমরা দু-একটা খুচরো জিনিস কিনলাম। আমি দুই ইয়ান দিয়ে এক জোড়া গরম দস্তানা কিনলাম। আমি খুঁজছিলাম চীনা চাষীরা যা ব্যবহার করে সেই রকম কোট। এই দোকানটি এমবাসির খুব কাছে। এখানে বিদেশীরাই বেশী সওদা করে। একটা ঘরে দেখলাম প্রচুর তিব্বতী কার্পেট। তিব্বতী কার্পেট খুব বিখ্যাত জিনিস। এখন এ দেশেও তৈরী হচ্ছে। সিকিমেও এই কার্পেট তৈরী হত। সে কথা আগেই বলেছি। খুবই সম্ভব তিব্বতেও সেই রকমই ছিল। এখন নিশ্চয় ঘড়ির কাঁটা দেখে ঠিক সময়ে কারখানায় এসে বুনতে হচ্ছে—এই হচ্ছে স্বাধীনতা খোয়ানোর দুঃখ।

আমরা শুনলাম যে, চীনে সব দোকানেই এক দাম। একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন দোকানে ভিন্ন ভিন্ন দাম হবে না। তা দোকানের পারিপাট্য যাই হোক। ফ্রেন্ডশিপ স্টোর খুব সাজানো দোকান। তা হলেও দাম একই হবে। তবে জিনিসের তারতম্য আছে। এখানে প্রসাধনদ্রব্য, মিংক কোট, গহনা ও ভেলভেট পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যে চাষীদের তুলোভরা কোট খুঁজছি তা পাওয়া যায় না। সাধারণ সুতী বা গরম গেঞ্জীও পাওয়া গেল না। সু আমাকে বলল যে, অন্য জায়গায় পাওয়া যায়, সেখানে খুব ভিড়। আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললাম, সেইরকম বাজারেই আমি যেতে চাই। তখন ঠিক হল খাওয়াদাওয়ার পরে সেই সাধারণ বাজারে যাওয়া হবে।

সু মেয়েটি বড় ভালো, কিন্তু সে ইংরেজী বোঝে না। হিন্দী বোঝে। সে জ্ঞানসিং ধিংড়ার দোভাষী। মুশকিল হয়েছে এই যে, তার হিন্দী ও জ্ঞানসিং-এর হিন্দীতে অনেক তফাত। কাজেই যে সমস্যার উদ্ভব হয় সেটা এড়াবার জন্যই বোধহয় সুযোগ পেলেই সু আমার কাছে পালিয়ে আসে। কিন্তু ধিংড়া লোকসান করবার পাত্র নয়। বলে, সু, তুমি কার কাজ করছ—আমার না দেবীজীর?

যাই হোক, আমরা সবাই মিলে এই সাধারণের গম্য বাজারে গেলাম। এটাও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। সত্যিই ঠেলাঠেলি ভিড়। প্রচুর জিনিস, কুপন দিয়ে কেনা হচ্ছে—গরম জিনিসের জন্য একরকম কুপন, সুতীর জিনিসের অন্য কুপন। খুচরো জিনিস টাকা অর্থাৎ ইয়ানেও বিক্রি হচ্ছে। ফ্রেন্ডশিপ স্টোরে কোনো চীনাকে বাজার করতে দেখিনি—সব বিদেশী। এখানে সব চীনা। অবশ্য খুব সন্তর্পণে টাকা খরচ করছিলাম। কারণ এই একশ' ত্রিশ ইয়ানে এক মাস চালাতে হবে। ভারত সরকার যে ক'টি আমেরিকান ডলার আমাদের দিয়েছেন, সকলেরই মনোবাসনা সেগুলি দিয়ে ফেরার পথে হংকং-এ জিনিস কেনা হবে। সকলেই বলে, হংকং-এ জিনিসের ছড়াছড়ি এবং চোরের রাজ্য। খুব দরাদরি করতে হয়। তা হোক, হংকং-এ জিনিস কেনবার ব্যগ্রতা আমাদের কম নয়। কারণ শত হলেও "ফরেন" তো! যত দেশপ্রেম বাড়ছে তত ফরেন জিনিসের ঝোঁক বাড়ছে। তাই পিকিং-এর চীনা বাজারে আমরা সামান্যই জিনিস কিনলাম। অনেকে সুতোর গেঞ্জি কিনলেন সোয়েটারের মত, তিন চার ইয়ান দাম হবে। আমি চোদ্দ ইয়ান দিয়ে একটি তুলো-ভরা কোট কিনলাম। সুন্দর কোট খুব গরম। ঐ কোটেই চীনের ঠাণ্ডা কাটিয়ে এসেছি।

সেই দিন অর্থাৎ ৭ তারিখ রাত্রে মৈত্রী সমিতির সভাপতি আমাদের সম্মানার্থে ব্যাঙ্কোয়েট দেবেন। এই ভোজে আমাদের রাষ্ট্রদূত নারায়ণন্ ও তাঁর স্ত্রীও নিমন্ত্রিত হলেন। সরকারী ডেলিগেশন ছাড়া এরকম নাকি হয় না। সচরাচর খুব কম রাষ্ট্রদূতই এভাবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। একজন বিদেশী মহিলা লিখেছেন যে, দূতাবাসের বিদেশী বাসিন্দাদের দুঃখ যে, চীনারা তাদের সঙ্গে খায় না। অবশ্য এই এক মাস ভ্রমণকালে আমাদের ভ্রমণ-সঙ্গীরাও সচরাচর কেউ আমাদের সঙ্গে একত্র ভোজন করেননি—ব্যাঙ্কোয়েট বা ভোজসভা ছাড়া।

৭ তারিখ দুপুরবেলা আমি ডাঃ বসুকে বললাম, আমি আমাদের নিমন্ত্রণকর্তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। তাঁকে আমি রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিন' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ দিয়ে বললাম, আপনার বক্তৃতা যখন টাইপ হবে, এটিও করিয়ে দেবেন। তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এ কবিতা আপনি এখনি অনুবাদ করেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সঙ্গে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'নবজাতক' পত্রিকার একটি বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা ছিল, তাতে আমি ১৯৬১ সালে পিকিং-এ যে রবীন্দ্রজন্মোৎসব হয়েছিল তার পূর্ণ বিবরণ এবং ছবি ছাপিয়েছিলাম—আর চি-সি-লিন কর্তৃক একটা ভাষণ, নাম "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের মহাকবি" আর একটি প্রবন্ধ চি সিন লিন রচিত "ঠাকুর আমার হৃদয়ে আছেন"—উপরে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি, চীনা আর্টিস্টের আঁকা। ১৯৬১ সালে এখানে যে চীনা গুডউইল মিশন ছিল সেখান থেকেই পেয়েছিলাম। একটি মহিলা আমায় দিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে যখন যুদ্ধ লাগল তখন আমি খুব বিস্ময়ের সঙ্গে এই ছবি ও লেখাগুলি দেখতাম। তারপর ১৯৬৭ সালে এইগুলি সাজিয়ে 'নবজাতক'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল একটি কথা নীরব ভাষণে বলা যে, যুদ্ধের উদ্যোগপর্বের মধ্যেও তারা বিচার-বুদ্ধি স্থির রেখেছিল ও ভারতের মাননীয় কবিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিল—এ কথা ভারতের মানুষের কাছে প্রকাশ করা। কিন্তু আমার সেই ক্ষুদ্র পত্রিকার প্রচারশক্তি সামান্যই। ক'জনের কাছেই বা তা পৌঁছল! সে পত্রিকার একটি খণ্ড ও সোমেনের দেওয়া নগ্নচিকে লেখা চিঠি ইত্যাদি মৈত্রী সভার সভাপতিকে উপহার দিলাম। সভাপতি ওয়াং পিন নান্-এর ইনটার-প্রেটার ছেলেটিকে খুবই শিক্ষিত মনে হল। তার ইংরেজী উচ্চারণ শুদ্ধ, ইংরেজী ভালো, তাকে একটু এ সম্বন্ধে উৎসাহিত দেখলাম। 'জন্মদিন'-এর কবিতাটি টাইপ না হওয়ায় দিতে পারা গেল না। ভোজসভার প্রারম্ভ ভাষণে ডাঃ কোটনিসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও চীন-ভারতের দীর্ঘদিনের মিত্রসম্পর্কের কথা উল্লেখিত হল। তাছাড়া যা হল তা বর্তমান চীনের রাজনীতির কথা। সভাপতি ওয়াং পিন নান বললেন, দেশের দুশমন চারজনকে অর্থাৎ 'গ্যাং অব ফোর'কে পরাস্ত করে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান হুয়া কুয়া ফেং দৃঢ়হস্তে দেশের ভার গ্রহণ করেছেন। চারিদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা, দেশের লোক নিশ্চিন্ত হয়েছে—এই সুসময়ে আপনারা এখানে এসেছেন, এটা খুবই আনন্দের কথা। 'গ্যাং অব ফোর'-এর কথা পরে বিশদভাবে অর্থাৎ যতটুকু আমরা শুনেছি ক্রমে আলোচনা করা যাবে। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখি, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে আলাপ-আলোচনা শুরু হবার আগে ও পরে তাদের ধুয়ার মত একবার এই কথাগুলি বলা হয়। 'গ্যাং অব ফোর' বিনষ্ট হওয়াতে দেশে সুসময় এসেছে, সকলে শান্তি পেয়েছে। এমন একটি জায়গায় আমরা যাইনি, এমন একটি লোককে দেখিনি, যারা এই কথাটা বলেনি। তার থেকে এরকম অনুমান হওয়া অনুচিত নয় যে, হয়তো এদের অবচেতনে এখনও 'গ্যাং অব ফোর' সম্বন্ধে ভীতি যথেষ্ট। যা হোক, এই বিষয়টা যেমন যেমন আমরা চীনের নানা দেশে ভ্রমণ করব তেমন আলোচনা করা যাবে। আমার শুধু আশ্চর্য লেগেছিল যে দেশীয় রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করা ওরা প্রয়োজন মনে করেছে। অন্যত্র এরকম দেখিনি। আমরা চীন যাবার আগে থেকেই সেখানের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা শুনেছিলাম এবং হোপেই প্রদেশে প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে তাও শুনেছিলাম। আমি চীন যাচ্ছি শুনে একজন মহিলা আমায় বলেছিলেন—'এখনই আপনার চীন যাবার দরকার পড়ল! একে ভূমিকম্প তায় লড়াই!'

এবারে ভোজসভার কার্নাটা দিই। তিনটি টেবিলে ভাগ করে আয়োজন করা হয়েছিল। চীনে দেখলুম খাবার টেবিল সর্বদাই গোল। চৈনিক বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ছাড়াও ইয়োরোপীয়রাও ছিলেন। তার মধ্যে ডাঃ জর্জ হাতেম যিনি মা-হাইতে নামে পরিচিত, তাঁর চীনা স্ত্রী সহ আমাদের টেবিলে বসেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ হল। শুনেছি ইনি চীন দেশে উপদংশ রোগ দূর করতে প্রচুর সাহায্য করেছেন। তাঁর বিশেষ দান ঐ। আর একজন ইয়োরোপীয় ডাঃ মুলার। ইনি একজন জাপানী নার্সকে বিবাহ করেন। এই মহিলা চীনের উপর জাপানের আক্রমণ চলার সময় নার্স হিসাবে এসে শত্রুহস্তে বন্দিনী হন। বন্ধনদশাটা শেষ পর্যন্ত উদ্বাহবন্ধনে পরিণত হয়েছিল। ডাঃ অটল ছিলেন ভারতীয় মিশনের দলপতি। মুলার, অটল ও কোটনিস ডিসেম্বরের শীতে বরফ ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে যুদ্ধ ফ্রন্টে রুগীর সেবা আর্তের সেবা করেছেন, চিকিৎসা করেছেন। ইনি আর তখন নাৎসী জার্মানীতে ফিরে যাননি। আমি মিসেস বাসুর কাছে শুনলাম, সেখানে এঁর নাম মৃতের তালিকাভুক্ত হয়েছিল। সম্প্রতি এঁর আত্মীয়স্বজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর পেয়েছেন যে, ইনি জীবিত। ডাঃ মুলার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। আর একজন বিদেশী ডাক্তার ডাঃ স্লাই জাতিতে অস্ট্রিয়ান। তিনিও ডাঃ কোটনিসের সঙ্গে একত্র কাজ করেছেন। এ ছাড়া সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিদেশী হচ্ছেন নিউজিল্যান্ড দেশীয় রুই আলি। ইনি ডাক্তার নন, তবে নানা কর্মবিশারদ। পঞ্চাশ বছর চীন দেশে বাস করছেন, মা-সে-তুং-এর বন্ধুস্থানীয়। ইনি সাংহাই-এ বয়লার ইন্‌স্পেক্টর হয়ে এসেছিলেন এবং চীনাদের উপর বিদেশী, বিশেষ করে শ্বেতকায়দের অত্যাচার দেখে চীনাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল হয়ে এ-দেশের মঙ্গলকর্মে সারা জীবন নিযুক্ত আছেন। এঁকে নাকি বলা হয় 'চাইনীজ ড্রাম'। চীন সম্বন্ধে এঁর গভীর জ্ঞানের জন্যই এই নাম। এঁর প্রধান দান চীনে কো-অপারেটিভের সংগঠন।

আমার বড় ইচ্ছা ছিল এইসব ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে একটু সময় নিয়ে কথা বলি। কারণ, ইয়োরোপ আমার খুবই পরিচিত, তাদের ভাষা আমি বুঝি। কিন্তু সে সুযোগ বিশেষ পাওয়া গেল না। পরে রুই আলির সঙ্গে কিছুটা কথা হয়েছিল। তা যথাস্থানে লেখা যাবে।

ঐদিন দুপুরেই আর একজনের সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে ইয়োরোপীয়ান না বলে ইউরেশীয়ান বলা চলে, তাঁর মধ্যে চীনা রক্ত আছে। কিন্তু তিনি ভাবে-ভঙ্গীতে পুরা ইয়োরোপীয়। ইনি লেখিকা 'হান সুয়ান'। চীন সম্বন্ধে তাঁর লেখা বিখ্যাত এঁর চীনা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। শুনলাম পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জবাসী কোনো ভারতীয়কে বিবাহ করেছেন। চীনের সঙ্গে সংযোগ এঁর অটুট।

এঁর মুখেও 'গ্যাং অব ফোর'-এর কথা শুনলাম। এইখানে যদি কেউ না জানেন তবে তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলে রাখা ভালো যে, এই চারজন ব্যক্তি যাঁদের বর্তমান চেয়ারম্যান পার্টি বিরোধী চক্রান্তের দোষে অভিযুক্ত করে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ওয়াং হুং ওয়েন (Wang Hung Wen), চ্যাং চুন-চিয়া (Chang Chun Chia), চিয়াং চিং (Chiang Ching) ও ইয়াও ওয়েনয়ুয়ান (Yao Wen-yuan)। এর মধ্যে চিয়াং চিং এঁদের প্রিয় নেতা মাও-সে-তুং-এর চতুর্থ পত্নী। কালচারাল রেভলিউশানের সময় অর্থাৎ ১৯৬৬ সাল থেকে এঁরা প্রাধান্য লাভ করেন ও ক্রমে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিশেষতঃ চিয়াং চিং-এর চু এন লাই বিরোধী কার্যকলাপ দেশের লোককে এঁদের প্রতি বিরক্ত করে তোলে। মাও-সে-তুং-এর মৃত্যুর পর এঁরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিলেন। তখন হুয়া কুয়া ফেং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এঁদের বন্দী করে ফেলায় এঁদের বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে। এসব কথা শুনছি আর ভাবছি, ইনি মাও-সে-তুং-এর পত্নী, এঁর সম্বন্ধে এরা সকলে এত বিমুখ হল কি করে। এমন সময় আমাদের দলের তারাচাঁদ গুপ্ত, যিনি নাকি চীন সম্বন্ধে দু'শোখানা বই পড়েছেন, হান সুয়ান-কে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি এক জায়গায় পড়লাম যে, আপনি কাউকে বলেছেন যে, চিয়াং চিং যদি ক্ষমতায় আসেন তবে আপনার চীনে ঢোকা অসম্ভব হবে?—হান সুয়ান বললেন,—ঠিক তা নয়। আমি বলেছিলাম, চিয়াং চিং যদি ক্ষমতায় আসে তবে আমি আর চীনে যাব না।—আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?—তিনি বললেন, ঐ ক্ষমতাপ্রয়াসী অহংকৃতা নারী নিশ্চয় আমাকে তার জীবনী লিখতে বলত। আমি চেয়ারম্যানের জীবনী লিখেছি, অতএব তারও লিখতে হবে। সেটা আমি কখনও করতাম না।

—আচ্ছা, আপনারা তো চিয়াং চিং-কে কোনো দিনই পছন্দ করেননি বলছেন। তা বলে মাও-সে-তুং থাকতে তা বললেন না কেন?

আমরা বন্ধুকে কষ্ট দিতে চাইনি। তা ছাড়া তিনি তো জানতেন, তিনি হুয়া কুয়া ফেং-এর উপরই নির্ভর করেছিলেন।

চিয়াং চিং সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। সেসব ক্রমে ক্রমে বলব। এখন আমি আমার পাঠকদের সঙ্গে চীন ভ্রমণে বেরিয়েছি; যেমন যেমন দেখছি তেমনি বলে যাব।

এবার ভোজসভার বর্ণনায় ফিরে যাওয়া যাক। চীনা ভোজ্যর মধ্যে মাংসই প্রধান। যদিও উত্তর চীন এবং দক্ষিণ চীনের রান্নার পার্থক্য আছে। সর্বপ্রথম টেবিলে সাজানো থাকে ১০।১২ রকম ঠাণ্ডা খাবার। ছোট ছোট টুকরো নানারকমের মাংস—মুরগি বা শুয়োর, মাছভাজা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁশের টুকরো, জেলিফিশের সরু সরু করে কাটা রঙীন তরকারি ইত্যাদি। এর সঙ্গে থাকে লাল রঙের ওয়াইন। মিষ্টি, এতে অ্যালকহল নেই বললেই হয়। আর বুধাপেস্তপ্রমাণ গ্লাসে সাদা জলের মত রং—'মাথাই'। 'মাথাই' খুব কড়া মদ। কেউ কেউ বললে, রুশীয় ভড্‌কার চেয়েও কড়া। তা ছাড়া কেউ যদি বীয়ার বা হুইস্কি খায় তা হলে তা দেয়। ঠাণ্ডা খাওয়ার পর আসে গরম খাবার। ঠাণ্ডা খাবারটা হচ্ছে চাট—বিলাতি কায়দায়ও এরকম আছে। নানা রকমের মাংস-রোস্ট পিকিং ডাক। অর্থাৎ হাঁস, খুবই বিখ্যাত খাদ্য। তা ছাড়া বড় লঙ্কার টুকরো দিয়ে শুয়োরের মাংস। তার মধ্যে লঙ্কার অংশ খুব কম। এদেশে চীনা রান্নার তরকারির অংশ যত থাকে, ওখানে তা নয়।

মাংস খাওয়া হয়ে গেলে আসে মাছ। মাছ একেবারে বড় একটি রুই মাছের মতই, সাজানো নকল চোখে প্যাট প্যাট করে চেয়ে থাকে। মাছ রান্না খুব ভালো কিন্তু ইয়োরোপীয়দের মত কাঁটা বার করা নয়। কাঁটা সুদ্ধ থাকলেও সরু সরু চপ-স্টিক দিয়ে সুন্দর বেছে ফেলে। এই মাছ-মাংসের ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টি আসে। মিষ্টির প্রাচুর্য বেশী নেই। দুধের মিষ্টি তো নেই বললেই চলে। মনে হয় ডালের মিষ্টি। একদিন মাত্র আইসক্রিম পেয়েছিলাম। আর থাকে টেবিলে সাজানো মান্টো বলে একরকম রুটি। ভাজকরা পরোটার মত—ভাপিয়ে নেওয়া। তিব্বতী রান্না মোমো, ময়দার মধ্যে মাংসের পুর দিয়ে ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করে নিতে হয়, তাও এখানে খুবই খাওয়া হয়। তরকারির মধ্যে এখানে ছিল বাঁধাকপি ও সেলারী। খাওয়ার মধ্যে মধ্যে ইয়োরোপের মত 'টোস্ট' করার রীতি খুব প্রবল। চীন ভারতমৈত্রীর আকাঙ্ক্ষা করে, চিরদিনের বন্ধুত্ব কামনা করে বর্তমান ডেলিগেশনের স্বাস্থ্যকামনায় বারবার মাথাই-এর গ্লাস গ্লাসে ঠেকিয়ে এক চুমুকে খেয়ে ফেলে বলে 'গাম্বে'। অর্থাৎ বটমস আপ্ (একেবারে উল্টে ফেলা)। যদি কোনো মদ্যপ্রীত লাল রঙের ওয়াইন তোলেন, অন্যপক্ষ জেদাজেদি করেন 'মাথাই' খাবার জন্য। আমার সামনের একটি মহিলা দেখলুম চালাকি করে নিজের মাথাই স্বামীর গ্লাসে ঢেলে দিয়ে নিজের গ্লাসে লেমনেড নিয়ে নির্বিকার বসে রইলেন। কিন্তু এক চুমুকে 'গাম্বে' করার শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন! মাথাই একেবারে লংকাচোবানো ঝাল।

আমাদের প্রথম দিনের ডিনারে মদ্যপ্রীত মহাকবি ক্রমে তুরীয় হয়ে গেলেন। তাঁর এক পাশে বসেছিলেন মা-হাইতে বা জর্জ হাতেম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার জীবনের ফিলসফি কি?—মহাকবি নির্বিচারে বললেন, অ্যানার্কিসম। আমি বললুম,—অ্যানার্কিসম আবার ফিলসফি নাকি?

—নিশ্চয়। তুমি অমুকের বই পড়েছ, তমুকের বই পড়েছ বলে অনেক সায়েবদের নাম বলতে লাগলেন। আমি বললাম,—না, এ'দের বই আমি পড়িনি, পড়বার ইচ্ছাও নেই।—তখন মহাকবি বললেন,—তুমি খালি রবীন্দ্রনাথ পড়েছ। তিনি বুর্জোয়া কবি ইনডিভিজুয়ালিস্ট কবি। আমি রেভলিউশনারি কবি, ইন্টারন্যাশনালিস্ট কবি।—আমি বললুম,—বেশ।—ইতিমধ্যে কবিত্বের উত্তেজনায় মহাকবির সামনে স্থিত সিগারেটের ছাইয়ের স্তূপ ধাক্কা লেগে সারা টেবিলময় ছড়িয়ে যেতেই মা-হাইতে ঈষৎ হেসে বললেন,—এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে তুমি অ্যানার্কিস্ট!

চীনে খাবারের কথা আর একটু বলে এ পর্ব শেষ করব। খাওয়া শেষ হয়ে এলে আসে সুপ এবং ভাত। আর ফল এলে বোঝা গেল ভোজ শেষ। ভাত কেন পরে আসে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ভাত দিয়ে পেট ভরাতে চায় না, মাংস দিয়ে ভরাতে চায়।

সেদিন ডিনারের পরে স্কুলের ছেলেমেয়েদের ব্যালে দেখতে গেলাম। নাচ অভিনয় ও সাজ খুব চমৎকার লাগল, কিন্তু বিষয়বস্তু কেজো। যেমন—আপেল ফল পাড়া, ডাচাইতে শস্য ফলানো। রেল রোড খোলা—এসব বিষয়ে নাচ। আমি আর বৎসলা পাশাপাশি বসে রেজিমেন্টেড আর্ট নিয়ে আলোচনা করলাম। সেটা আমাদের পিকিং-এ দ্বিতীয় দিন। ক্রমে এ সম্বন্ধে অনেক ভাবতে হয়েছে।

৭ই তারিখেই আমরা বিকেলে বাজার থেকে ফিরে নিষিদ্ধ নগরী দেখতে গিয়েছিলাম। দিল্লী বা আগ্রা ফোর্টের মত দেওয়াল-ঘেরা প্রাসাদগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, দর্শনীয় বস্তু। প্রথম গেটটির নাম 'স্বর্গীয় শান্তির সিংহদ্বার' (গেট অব হেভেনলি পীস)। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি চত্বর পেরিয়ে একটি গৃহ, আবার একটি গেট, তারও ঐরকমই সুন্দর নাম। একটি নাম মনে পড়ছে—সামঞ্জস্যের দ্বার (গেট অব হারমনি), যতদূর মনে হয় এখানেই গেট অব ব্লড চ্যারিটি (প্রশস্ত করুণার গৃহ)। কিন্তু সেখানে যে দালাই লামার কবিতা ছিল বা আছে তা সেদিন আমার মনে পড়েনি—পড়লে ওদের জিজ্ঞাসা করতাম। আর তারপর আবার একটি গৃহ। এই রকম পর পর অনেকগুলি চত্বর, গেট ও প্রাসাদ। এগুলি সবই কাঠের তৈরী—রঙীন গালা দিয়ে ঢাকা, বর্ণাঢ্য। খুবই সুন্দর স্থাপত্য। কিন্তু স্থাপত্যে ভারতকে হারানো শক্ত। সেদিন ছিল বড় ঠাণ্ডা, আর হু হু করে উত্তুরে বাতাস বইছে। শুনলাম সে বাতাস সাইবেরিয়ার হিমস্পর্শ নিয়ে আসছে। ভারি জবরজঙ্গ কোট, মাথা মুখ মোড়া শাল, নড়বড়ে পা নিয়ে বড়ই মুশকিল হচ্ছিল—কখনও মং, কখনও লী আমাকে ধরে ধরে পার করছিলেন। ক্রমেই এমন অবস্থা হল যে, স্থাপত্য দেখার সাধ মিটে গিয়ে নিজেই স্থাপত্যে পরিণত হই আর কি! মিউজিয়াম না দেখেই আমরা রণে ভঙ্গ দিতে চাইছিলাম, কিন্তু ওদের দেখাবার সাধ খুব। এদিকে ফিউডালিজমের এত নিন্দা করে, কিন্তু সে-সময়কার শিল্পবস্তু ওদের গর্বের বিষয়। চীনারা তাদের অতীতকে বাতিল করেনি, তার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। শুধু কোনো কিছু সুকর্ম দেখাবার সময় বারবার করে বলে, এ-সমস্ত আমাদের দেশের 'মেহনতী' জনতার দান। এ-সমস্তই সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের ফল। ওরা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাজমহল শাজাহানের তৈরী নয়। যারা পিঠে পাথর বয়ে এনেছে তাদের। কৃতিত্ব তাদের। এই কথা বার বার বলে ওরা তাদের মর্যাদা দেয়, যারা এতদিন ছিল অনাদৃত। 'যারা কেহ নয়, যারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে', ওরা বলে সভ্যতার ইতিহাস রচনা তাদেরই হাতে। স্থাপত্য দেখার সাধ ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়ায় আমরা কোনো মতে পালালুম।

৮ তারিখ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তৈরী হয়ে আমাদের অপটিক্যাল ইনসট্রুমেন্ট ফ্যাকটরী দেখতে যাবার কথা। এই শীতে অত ভোরে উঠতে বেশ আলসেমি লাগছিল। কিন্তু উপায় কি? চীনারা খুব ভোরে ওঠে। ভোর পাঁচটায় সমস্ত শহর জেগে উঠে একসারসাইজ করে। অল্পবয়সীরা দৌড়ায়। বৃদ্ধরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করে। এত শীতে বাইরে পার্কে ও ফুটপাথে তাদের ব্যায়াম করতে দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর তৈরী হয়ে চালে-ডালে মেশানো বড় বাটির দু-এক বাটি সুপ ও নুডল মাংস সহকারে খেয়ে তারা কাজে বেরিয়ে পড়ে। ইয়োরোপে বা আমেরিকায় এত ভোরে ওঠা কেউ ভাবতে পারে না। ফ্রান্সে তো ন'টা পর্যন্ত সারা শহর অচৈতন্য। খুব আশ্চর্য লেগেছিল ফ্রান্স থেকে জার্মানী গিয়ে। সামান্য একটু দূরেই কি পরিবর্তন। জার্মানরাও প্রত্যুষে ওঠে। আমরা ফ্রান্সের কারদায় বেলা অবধি ঘুমোব ভাবছি, ভোর ছ'টায় রাজমিস্ত্রী এসে জানলার বাইরে খটাখট কাজ শুরু করল। আমাদের গরম দেশেও আজকাল বিলাতী কায়দায় অভ্যস্ত লোকেরা সকাল আটটা ন'টা অবধি ঘুমোনোটা সাহেবিয়ানার নিদর্শন মনে করেন। আমেরিকায় তো দেখলুম বড় বড় প্রফেসররা পর্যন্ত বেলা বারোটা অবধি ঘুমোন ; রাত একটা অবধি হয় কাজ করেন, নয় মদ্য সহিত আফটার ডিনার রসালাপ করেন। আমি একবার আমার এক বান্ধবীকে ভোর সাতটায় টেলিফোন করে অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। তিনি তন্দ্রাজড়িত ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন—হ্যালো—। আমি বললাম,—ঘুম ভাঙ্গালাম না কি?—তিনি বললেন,—এত ভোরে ঘুমোনো ছাড়া আর কি করছিলাম তোমার মনে হয়?—এই বিস্ময়কর ঘটনা জনে জনে বলেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি! আমেরিকায় অল্পবয়সীদের তো সকালে উঠলে মনমেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমার একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি যে এত ভোরে ওঠো তোমার সকালে "গ্লাম্পি" বোধহয় না? আমি ভাবলাম আমার ঊর্ধ্বতন চৌদ্দপুরুষ ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্য ত্যাগ করতেন, তার যে কি সুখ তোমরা কি জানবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চীনারা যেমন ভোরে ওঠে, তেমনি সন্ধ্যা ছ'টায় নৈশ ভোজন শেষ করে তারপর আর কেউ কিছু খায় বলে মনে হল না। সিনেমা বা ব্যালে দেখে রাত ন'টায় ফিরলে তখন একটু গরম চা ছাড়া আর কিছু নয়।

অগত্যা আটটার মধ্যে তৈরী হয়ে সাড়ে আটটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম অপটিক্যাল ইনসট্রুমেণ্ট ফ্যাকটরী দেখতে। সেদিন সকাল ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল—প্রচণ্ড চওড়া রাস্তা 'ছাং আনলু' আট-ন' মাইল লম্বা। ছাং আনলু অর্থাৎ দি রোড অফ এভারলাস্টিং পীস। তা পথটি 'চিরশান্তির পথ' বলা ভুল নয়। হট্টগোল অন্য শহরের তুলনায় কম। প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া তাই ভিড়ও কম। গাড়ি নেই বললেই হয়। এম্বাসির গাড়ি ছাড়া সাধারণ লোকের নিজস্ব গাড়ি নেই। শুধু আছে সরকারী ট্যাক্সি। তা ছাড়া চলেছে সাইকেলের স্রোত, ট্রাক ও বাস। চিরশান্তির পথ থিয়েনান্ মেন স্কোয়ার দিয়ে স্বর্গীয় শান্তির সিংহদ্বারের সামনে দিয়ে চলে গেছে দূরে। দুধারে কোনো জায়গায় বিজ্ঞাপন দেখা গেল না। চীন দেশে কোনো শহরেই বিজ্ঞাপন দেখলুম না। প্রয়োজনমত জিনিস তৈরি হচ্ছে—সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী। কমপিটিশনের বালাই নেই ; কারণ, লোককে ঠকিয়ে নিজের জিনিস কিনিয়ে নিতে হবে না, বা লোভ দেখিয়ে কেনাতে হবে না। লোভটা ক্ষমাবার চেষ্টাই তো চলছে। বুঝতে পারলাম, কদর্য বিজ্ঞাপনের অভাবেই রাস্তাটা চিরশান্তির পথ মনে হচ্ছে। আর মাঝে মাঝে রয়েছে উজ্জ্বল অক্ষরে মাও-সে-তুং-এর বাণী। লেখাগুলি ছবির মত সাজানো, পথকে সুশোভিত করেছে। লেখাটা তো পড়তে পারছি না, তাই আমার মনটা ক্ষুণ্ণ। বিজ্ঞাপনের কথায় আমার আমেরিকার কথা মনে পড়ল। প্রতিযোগিতার কুৎসিত চেহারা ওখানেও অনেকের মনে আসছে। আমেরিকার তরুণ ছেলেমেয়েরা অনেক রকম নূতন কথা ভাবছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাদের কোনো নেতা নেই। এমন কেউ নেই যাকে তারা মানে, শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে ; যার নির্দেশে সন্দেহের অবসান হয়। বিজ্ঞাপনের কথায় আমার বন্ধু জনের মতামত খুব স্পষ্ট। অল্পবয়সী সুন্দর ছেলে জন। কমার্সিয়াল আর্ট পাস করেছে—কিন্তু বেকার। সে আমাকে বলেছে যে, সে একটা বড় ফার্মে কমার্সিয়াল আর্টিস্ট-এর কাজ করত। কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছে। তার খরচ চলে কি করে জানতে চাইলে সে নির্বিকারভাবে বললে, আমার ল্যাণ্ডলর্ড আমায় মাঝে মাঝে ভাড়া খাটায় (হায়ারস মি !) কথাটা ঠিক বুঝলাম না। একদিন দেখি সে কাঠের সিঁড়ি সাবান-জল দিয়ে ধুচ্ছে। "এ কি করছ, জন ?" "আজকে আমার ল্যাণ্ডলর্ড আমায় ভাড়া খাটাচ্ছে—এরকম মাঝে মাঝে করতে হয় ! কিন্তু লোকটা কৃপণ।" আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি অত ভালো কাজ ছাড়লে কেন ?—সে বলল যে,—অ্যাডভার্টাইজিং-এর কাজ করতে গেলে অনেক মিথ্যা বলতে লিখতে হয়। কেন আমি ঐ কম্পানীটার পেট মোটা করবার জন্য মিথ্যা কথা বলতে যাব।—এইজন্য তুমি অত ভালো চাকরি ছেড়ে এই কাজ করছ ?—জন একটুও দুঃখিত নয়। সে বলল,—চাকরিটা ভালো কিসে ? মিথ্যা কথা বলা ভালো ? আর সিঁড়ি ধোয়াটা খারাপ কেন ? আমার মনে কোন গ্লানি নেই।—আমেরিকাতে আরো দু একটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে জনের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করে দেখেছি; তারাও আশ্চর্য নয়—বলে, ঠিকই তো।

সেদিন চৌ যখন বললে, না, আমাদের বিজ্ঞাপনের দরকারই হয় না, তখন মনে হল এ রাজ্যে জন সুখে থাকত।

চিরশান্তির পথ দিয়ে অপটিক্যাল ইনসট্রুমেণ্ট ফ্যাকটরীর দিকে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলাম মাও-সে-তুং ও স্টালিনের যুগ্ম ছবি রাস্তার পাশে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। পরে আরো অনেক জায়গায় স্টালিনের ছবি দেখেছি। তবে সেদিন রৌদ্রালোকিত জনপথের ধারে হঠাৎ তাঁর ছবি দেখে মনের মধ্যে ধক করে উঠল। চীন ও রাশিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে আর কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। ১৯৫৫ সালে মস্কোতে যেখানে সেখানে স্টালিনের যে সব মর্মরমূর্তি ছিল, আর তার চিহ্ন নেই। এবং লেনিনের পাশে শায়িত বাক্স-বন্দী যে মৃতদেহ দেখেছিলাম, তাও উৎপাটিত হয়ে গেছে। এরা মৃতদেহ এরকম পৌরাণিক যুগের মত রক্ষা করতে চায় কেন, বুঝি না। শুনছি মাও-সে-তুং-এর দেহও নাকি রাখবে ! কোথায় সেই বিরাট সত্তা, আর কোথায় কাঁচের বাক্সে বন্দী একখানা শব ! চীনারা অনেক বিষয়ে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাব দেখালেও এটা আদিম যুগের বুদ্ধি। এখানে যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগই প্রধান হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যাহা রমণীয় যাক মরে" এই সত্যটি অগ্রসরতার বীজ মন্ত্র।

যাক্ অপটিক্যাল ইনসট্রুমেণ্ট ফ্যাকটরীতে এসে পৌঁছনো গেল। কর্মকর্তারা, আসলে কর্মীরা—কারণ এটি প্রধানত মহিলাদের দ্বারা চালিত প্রতিষ্ঠান—আগে থেকে তৈরী ছিলেন। গাড়ি থেকে নামতে চোখে পড়ল অতি সুন্দর সচিত্র অভিনন্দন-বাণী দেওয়ালে আঁটা আছেঃ "ডাঃ কোটনিস স্মৃতি সমিতি স্বাগতম।" শুনলাম ওখানকার কর্মীরাই করেছে। পাশের দেওয়ালে প্রায় সাত-আট গজ লম্বা ও দেড় গজ চওড়া 'ওয়াল পেপার'—হাতে লেখা দেওয়ালপত্র। এগুলি এত নিখুঁতভাবে নানা রঙের কাগজে লেখা আর মাঝে মাঝে কার্টুন যে, বিশ্বাস করা যায় না এগুলি আর্টিস্ট-এর আঁকা নয়। অবশ্য যে এঁকেছে সে নিশ্চয়ই আর্টিস্ট, তবে সে ঐ ফ্যাকটরীর কর্মচারী। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই এরকম বড় বড় দেওয়ালপত্রে সচিত্র লেখার লোকের অভাব নেই ।এবং হাতের লেখাও দক্ষ ও পরিচ্ছন্ন। আমাদের দেশে মাঝে খুব দেওয়ালের লেখনের প্রচলন হয়েছিল, বোধ হয় চীনের অনুকরণে। কিন্তু তা শহরকে নোংরা করে ফেলেছিল। অশুদ্ধ বানানে অপুট হাতে বেশির ভাল লেখা নিষ্ঠার অভাবকেই প্রকাশ করত। তবে টালিগঞ্জের দিকে কয়েকটি নিপুণ হাতে লেখা প্রাচীরপত্রও দেখেছিলাম। যা হোক, চীনের ঐ প্রাচীরপত্রগুলোর মধ্যে 'গ্যাং অফ ফোর'-এর ছবি ছিল—একটা বেল্‌চায় করে চারজনকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে!

এই ছবিগুলোর ফোটো তোলবার চেষ্টা করা হল ; কিন্তু আমিও ছবি তুলতে অভিজ্ঞ নই আর দীনেশও তার ক্যামেরাটি আয়ত্ত করতে পারছিলেন না। তাই আমাদের সে চেষ্টা বিফল হল!

অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট ফ্যাকটরীতে ঢুকে সাদা চাদরপাতা টেবিলের দুধারে আমরা বসলাম। একধারে আমরা—অভ্যাগতরা ; অন্য দিকে কারখানার কর্মকর্তারা। যথারীতি গরম তোয়ালে ও যূথী সুরভিত চা, সিগারেট পরিবেশিত হল। তারপর আমাদের ঐ কারখানা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানানো হল। সব কমিউনিস্ট দেশেই ঠিক এই নিয়মে দেখানো হয়। এখানে বসেই মাও-সে-তুং চীনের হৃদয়ে কি আসনে প্রতিষ্ঠিত সে কথা প্রথম যেন বুঝতে পারলাম। মনে হয় ১৯৪৯ সালের পরে অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে মধ্যে মধ্যেই তিনি এক-একটি নূতন ও বৃহৎ কর্মের সূচনা করেছেন—দেশের মানুষকে ডাকার মত ডাক দিয়েছেন। সব প্রতিষ্ঠানের মতই কালচারাল রেভলিউশনের পর থেকে এখানে একটি রেভলিউশনারি কমিটি আছে। তার মধ্যে কর্মীরা আছেন। ডিরেক্টর একজন রিটায়ার্ড মিলিটারী অফিসার। তাঁর অলিভ রঙের জামার উপর লাল তারকাচিহ্নই পিপলস আর্মির পরিচয়। রেভলিউশনারি কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান একজন মহিলা। নাম—লি সি সুই। প্রথমে অভ্যর্থনা জানানো হল। তারপর গ্যাং অফ ফোর-এর নিন্দা ও পতনের সংবাদ দেওয়া হল। ধরে নিতে হবে, এ একেবারে নিয়মিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ও সভায় হবেই। তারপর শ্রীমতী লিউ এই কারখানার ইতিহাস বলতে শুরু করলেন।

১৯৫৮ সালে মাও-সে-তুং তাঁর দেশবাসীকে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানালেন। এই সময়কে বলা হয়—দ্য ইয়ার অফ দ্য গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড! যা বাংলায় 'বৃহৎ লম্ফ' নামে অনূদিত। অর্থাৎ দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ; সমস্ত সাংগঠনিক কাজে ও উৎপাদনের কাজে তৎপরতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। সে বছর থেকেই চীনের সর্বতোমুখী উৎপাদন-কর্ম উৎসারিত হয়ে গেল।

এই সময়ের সর্বব্যাপী আন্দোলন চলল দেশের মানুষকে, আপামর জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য। সমস্ত কাজে নিজেদের হাত লাগাতে হবে। মাও-সে-তুং একটি বাক্য বললেন, "রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া চীনের উৎপাদনশক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে।" এই বলে তিনি 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড'-এর বিপুল আন্দোলন শুরু করলেন। যখন জনতার মধ্যে কর্মশক্তি উদ্দীপ্ত হয়, যখন তারা কোনো কাজের মধ্যে নিজেকে সার্থক করে তখনই তারা নিজের উপর আস্থাবান হয়। 'রেভলিউশন' অর্থই দ্রুত পরিবর্তন এবং সেটাই 'লিপ'।

এই অপটিক্যাল ইনসট্রুমেণ্ট ফ্যাকটরী সেই 'বৃহৎ লম্ফর' একটি প্রত্যয়জনক নমুনা। লিন-সু-সুই ঐ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বলতে শুরু করে বললেন—চেয়ারম্যান মাও মেয়েদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি একটি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন—"এসো নারী, তুমিই অর্ধেক আকাশ"। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছিল চীনা নারীশক্তি। তাদের পায়ের বাঁধন অনেক আগেই খুলে গিয়ে থাকলেও মনের বাঁধন তখনও যথেষ্ট খোলেনি। বিপুল কর্মযজ্ঞে সমান দায়িত্ব নিতে গিয়ে তারা নিজের মনুষ্যত্বের ও নিজের শক্তির প্রতি আস্থাবান হল। যখন লিন-সু-সুই ঐ সুন্দর বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, তখন তাঁর মুখে আমি একটি দীপ্তি দেখতে পেলাম, আর আমার মনেও একটু আলো জ্বলে উঠল। আমি মাও-সে-তুং-কে একটু বুঝতে পারলাম। তাঁর অসাধারণ কবিত্ব-প্রতিভার মধ্যেই মানুষকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্রশক্তি আছে। আমার অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা মনে এল। এর কিছু দিন আগেই স্বদেশে মহিলা সাহিত্যসভায় কোনো এক মুখ্যমন্ত্রীর এক ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ শুনেছিলাম—নারীজাতির বন্দনা। তার অসারতা তখনই শ্রোতাদের ক্লান্ত করেছিল। যে কথা সত্য হয়নি, যে কথা সত্য করবার কোনো অভিপ্রায়ই যেখানে নেই, সেখানে বাক্যরাশি সফেন বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। ভাষার নূতনত্বও মানুষকে নাড়া দেয়। আমি তো ভাবতে পারি না যে, এরকম একটা কার্যকরী বৈষয়িক পরিকল্পনা করবার সময় কোনো রাজনৈতিক নেতা আকাশের কথা ভাববেন। সুচগ্র ভূমির জন্য যাঁরা নিম্নমুখী হয়ে তড়পাচ্ছেন ঊর্ধ্ব আকাশের কথা তাঁদের মনেই পড়বে না!

মাও-সে-তুং-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ এলাকার আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা চশমার কাঁচ ও চশমার ফ্যাক্টরী তৈরির কারখানা করবেন স্থির করলেন। এইসব মেয়েরা কাজ কিছুই জানতেন না, কোনো বাড়িও পাওয়া গেল না, ঘরে ঘরেই কাজ শুরু হয়ে গেল—যেমন করে আমরা মহিলা সমিতি করি। কিন্তু মহিলা সমিতির কাজ তো সূচী-শিল্পেই শেষ হয়ে যায়। তারপর সেই রুমাল, হ্যান্ড-ব্যাগ আর কাঁথার বোঝা বিক্রি করার ঝঞ্ঝাটে হয়রান হতে হয়। কিন্তু এদের হঠাৎ এরকম একটা দুরূহ পুরুষালি কাজের ঝোঁক পড়ল কেন, এ দায়িত্ব নেবার ভরসাই বা এল কোত্থেকে, কি জানি। যা হোক, সেই গৃহস্থ বধূদের কোনো পূর্বের শিক্ষা বা বিদ্যা ছিল না। অন্তত এই বিষয়ে তারা কিছু জানত না, লিন-সু-সুইকে দেখেও বোঝা গেল যে তিনি উচ্চশিক্ষিতা নন, গিন্নী মানুষ।

লিন-সি-সুই বললেন, আগে এসব জিনিসপত্র বিদেশ থেকে আসত। চেয়ারম্যান বললেন, "স্বনির্ভর হও।" তাঁর সেই বাণীই আমাদের সকলকে এই কঠিন কাজে উৎসাহিত করল। তিনিই আমাদের সকল কাজের প্রেরণা। কুসংস্কার ভেঙ্গে মুক্তি পাবার ইচ্ছাও তিনিই সঞ্চারিত করেছেন আমাদের মধ্যে। ত্রিশটি মহিলা মিলে এই কাজ শুরু হয়। তখন না ছিল অর্থ, না ছিল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, না ছিল কোনো দক্ষ কারিগর। অনেকদিন পর্যন্ত তাদের বিনামূল্যে পরিশ্রম করতে হয়েছে। বিভিন্ন লোকের বাড়িতে কিছুটা জায়গা নিয়ে এক-একটা কাজ হত। আগে এসব জিনিস দেশে বানানো মানে ছিল বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এনে জোড়া দেওয়া। কিন্তু স্বয়ংনির্ভর হওয়ার অর্থ কাঁচ তৈরি করার জিনিস, যন্ত্রপাতিও বানানো। প্রথম হাতে বানানো পাথরের ঘাঁতায় পেষাই করা হত। এখন সেখানে সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে। ত্রিশটি মহিলা যে প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন, এখন সেখানে ৫২০ জন কর্মী কাজ করছেন। এর মধ্যে পঁচাত্তর ভাগ স্ত্রীলোক। এই ফ্যাক্টরীর কাজের একটু বিশদ বিবরণ দেব। কারণ, এইটিই আমরা ও-দেশের কর্মোদ্যোগের প্রতীক বলে নারীশক্তির বিকাশের দৃষ্টান্ত রূপেও ধরে নিচ্ছি। ফ্যাক্টরীর কাজ তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি—অপ্টিক কাঁচ তৈরি। দ্বিতীয়—মেটাল প্রসেসিং, তৃতীয়—ফিনিশিং বা শেষকৃত্য। যেসব মেয়েরা কাজ শুরু করেছিলেন তাঁদের বিদ্যা ছিল না। কাজ করতে করতে সময় পেলেই পড়াশুনা করতেন। দরকারমত প্রয়োজনমত কাজের সঙ্গে পড়াশুনো চলার ফলে তাঁরা স্বয়ংশিক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম তাঁরা তৈরি করতেন খনিতে ব্যবহার্য লণ্ঠনের কাঁচ। ১৯৬৪ সালে তাঁরা কুড়িগুণ বা চল্লিশগুণ ম্যাগনিফাইং বা বড় করবার মত কাঁচ তৈরি করতে পারলেন। ক্রমে ক্রমে নানারকমের কাঁচও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতে লাগল। চারশো গুণ বড় দেখাবে এরকম মাইক্রোস্কোপ ১৯৭৩ সালে তৈরি হল। এখন ব্যাকটেরিয়া দেখার মাইক্রোস্কোপ হচ্ছে, যা কোনো বস্তুকে ষোলো শো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণ বড় দেখাবে।

সারি সারি মাইক্রোস্টোপ সাজানো ছিল। অনেকে পরীক্ষা করে দেখলেন। একটা যন্ত্র দেখাল—তার নাম পোলোরোমিটার। চিনি পরীক্ষার জন্য ব্যবহার হয়। এখানে বীট থেকে চিনি তৈরীর প্রচলন আছে শুনলাম। এইসব জিনিস পূর্বে কখনই এখানে তৈরি হত না। বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। বিদেশীরা সুযোগ পেয়ে যথেচ্ছ দাম আদায় করে নিত। এখন এই যে সব জিনিস তৈরি হচ্ছে, যথা পোলোরোমিটার, হলোগ্রাফ, তা খুবই জটিল। লেসার বীমের জন্যও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে। একটি ঘরে দেখলাম ছোট্ট ছোট্ট রুপালী কাঁচের গোলা নিয়ে কাজ করছে। এই লেসার বীম খনির কাজে লাগবে। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি কোনটা কত তৈরী হবে তা সরকার থেকেই নির্দেশ করে দেয় এবং সরকার কিনে নেয়। ১৯৭৩ সালে গভর্নমেণ্ট এঁদের পোলোরোমিটার তৈরির অনুমতি দেয়। তারপর তিন মাসের কঠিন পরিশ্রমে ও চেষ্টায় তাঁরা এটি তৈরি করে ফেলেন।

ঘরে ঘরে এইসব যন্ত্রপাতি দেখতে দেখতে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না যে, কোনোরকম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছাড়া ঘরের বউরা মিলে এরকম কাজের সূচনা করল কি করে। একজন মহিলা গর্বের সঙ্গে বললেন, এখন এখানে যেসব যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে তা কোনোমতেই চীনের অন্যত্র যা ব্যবহার হয় তার থেকে ন্যূন নয়। প্রথমে তাদের প্রতিষ্ঠানটি কো-অপারেটিভ ছিল ; এখন সম্পূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমান বাড়িটি নার্সিং শিক্ষার স্কুল ছিল। তারা অন্যত্র উঠে গেলে এঁরা পেয়েছেন। বাড়িটি এমন কিছু শৌখিন নয়। কিন্তু কাজটা এত জটিল যে, আমাকে বিস্ময়াভিভূত করে দিল। যেখানে মেটাল প্রসেসিং হচ্ছে নানারকম যন্ত্রের বহিরঙ্গের জন্য, সেখানে কু চাং লিন্ নামে একটি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের ভদ্রলোককে দেখলাম। সে পূর্বে মিলিটারীতে ছিল। প্রায় বিশ বৎসর সেখানে কাজ করে এখন এই কারখানায় ঢুকেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার কোনো ডিগ্রী আছে কি না, সে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে কি না। সে নির্দ্বিধায় বললে, এখন এখানে কাজ করছে, করতে করতেই কাজ শিখছে। তার জন্যে ডিগ্রীর দরকার নেই। তবে পরে কাজ শেখা হলে সে কিছু দিনের জন্য ইউনিভার্সিটিতে যাবে। আমার মনে হল, এরা যেন জগৎটা উল্টে দিয়েছে! আগে ডিগ্রী, তার পর তো চাকরী! এ দেখছি আগে চাকরি, তারপর ডিগ্রী!

আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন, "ক' ঘণ্টা কাজ করতে হয় এ-দেশে?"

"আট ঘণ্টা।"

"ওভারটাইম আছে?"

প্রথমটা তারা বিস্মিত হল ; তারপর বললে, "না, আট ঘণ্টা কাজই যথেষ্ট। তবে যদি কোনো প্রয়োজন হয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লোকে শ্রমদান করে। মাও-সে-তুং বলেছেন—'বি মাস্টারস্ অফ দি ইণ্ডাস্ট্রিজ ; ডু নট বি স্লেভস্ অফ মানি' (প্রতিষ্ঠানের প্রভু হও ; অর্থের দাস হয়ো না।) কথাটা এক মুহূর্তে আমাকে বিমর্ষ করে দিল। অতীতের 'ঘেরাও' উৎসবের কথা মনে পড়ল। কত প্রতিষ্ঠান উঠে গেল। বড় বড় প্রতিষ্ঠান ভেঙেচুরে শ্মশানভূমিতে প্রেতের নৃত্য হল। না চালক, না চালিত কেউ কি বুঝল যে প্রভু হতে গেলে দাসত্বের বন্ধনমোচন চাই। উভয়পক্ষই যেখানে অর্থের দাস সেখানে প্রতিষ্ঠান কর্ণধারহীন। এইবারে আমরা প্রশ্ন করলাম, উচ্চতম বেতন ও নিম্নতমের মধ্যে পার্থক্য কী? এই প্রশ্নটা দেশে ফিরে আসবার পর আমাকে বহু লোক জিজ্ঞাসা করেছেন, তাই উত্তরটা পূর্ণভাবেই লিখছি। যদিও চীন দেশ ভ্রমণ করতে করতে ক্রমেই এ প্রশ্নটা আমার কাছে একেবারে নিরর্থক হয়ে গেছে। কারণ সেদেশে বেতনের পার্থক্যের উপর কিছুই নির্ভর করে না—মানসম্মান, সুখ বা যশ। বেশী অর্থ থাকাটা সম্মানের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়।

একটি মহিলা আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। মনে হল তিনি বিদেশীদের কাছ থেকে এই প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত। তিনি বললেন, মাইনের তারতম্য আছে। সর্বোচ্চ এক শো ইউয়ান আর সর্বনিম্ন চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। তোমাদের এরকম ধারণা জন্মাতে পারে যে, মাইনে বড় কম ; কিন্তু আরো বেশি মাইনে দিলে এত লোকের চাকরি হবে কি করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজের তো কোনো অভাব নেই। প্রত্যেক পরিবারে চার-পাঁচজন খাটিয়ে লোক থাকে। কেউবা 'হোয়াইট কলার', কেউবা 'ব্লু কলার', কর্মী। অর্থাৎ, কেউ লেখাপড়ার কাজ করে, কেউ হাতের কাজ করে। জিনিসের দাম কখনই ঊর্ধ্বমুখী হয় না। ইনফ্লেশন নেই। গত পনের বছরে জিনিসের দাম বাড়েনি। মাইনে ছাড়া বাড়ি, ইলেকট্রিক ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের সুবিধে রয়েছে। কাপড়চোপড়, রেইনকোট, চিকিৎসাব খরচ—নিজের ও নিকট-আত্মীয়ের বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বললেন, তাঁর নিজের পরিবারের পাঁচজন কাজ করছে, তাই তিনি যথেষ্ট সচ্ছল। বার্ধক্যের সম্বল হিসাবে টাকা জমাবার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। কারণ, অবসর নিলে যা মাইনে পাচ্ছেন তার শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ পেনসন পাবেন। পুরুষরা ষাট বছর বয়সে অবসর নেয়, মেয়েরা পঞ্চাশে। কর্মী মেয়েরা ছাপ্পান্ন দিন মেটারনিটি ছুটি পায়। একথা শুনে আমার পার্ল বাকের 'গুড্ আর্থ' মনে পড়ল। ক্ষেতে কাজ করতে করতে গাছের আড়ালে সন্তানের জন্মদান করেই আবার কাজে লেগে পড়া সেই চীন কোথা থেকে কোথায় পৌঁছেছে! কর্মী মেয়েদের সন্তানদের বয়স অনুসারে নার্সারির ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া স্নানের ব্যবস্থা ও মাসে দুবার চুল কাটার ব্যবস্থা আছে। শীতের দেশে স্নানের ব্যবস্থা নিখরচায় পাওয়া খুবই ভালো। মেয়েদের অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুও বিনামূল্যে দেওয়া হয়। রোগে, শোকে, উৎসবে বিনা সুদে ধার পাওয়া যায় তো বটেই, সৎকারের খরচও মেলে। প্রতি মাসে বিনামূল্যে সিনেমার টিকিট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টিকিট পাওয়া যায়। সপ্তাহে একদিন ও বছরে উনষাট দিন পুরো মাইনেতে ছুটি সব কর্মীর পাওনা। তারপরে যে সংবাদটি সবচেয়ে চমৎকৃত করে দিল সে হচ্ছে ওখানে কোনো ইনকাম ট্যাক্স নেই। আমাদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, স্ট্রাইক হয় কিনা। জানা গেল কনস্টিটিউশনে স্ট্রাইক করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নূতন চীন প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোনো স্ট্রাইক হয়নি। কি কাজ হবে, কেমন করে হবে—সমস্ত সমস্যা সবাই মিলে একত্র হয়ে আলোচনা করে স্থির হয়।

আপিসের খাতা লেখা কর্মী আর হাতুড়ি পেটা কর্মীর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যালয় রয়েছে, ফাঁক পেলেই পড়ে নেবার জন্য। এইসব কর্মীদের মধ্যে যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার যোগ্য হয় তাকে অন্যান্য কর্মীরা নির্বাচন করে পাঠায়। এই প্রতিষ্ঠানে ১৯৭০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৪টি কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে।

জিনিস তৈরি ও বিক্রির মধ্যে কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় না। কারণ, যে জিনিস যতটা দরকার ততটাই তৈরী হয়। এখন এঁরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করছেন, 'কোয়ালিটি কণ্ট্রোলের' দিকে। যে ভদ্রমহিলা আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি এখানে নানা পলিটিক্যাল কথা শুরু করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—কালচারাল রেভলিউশনের পরে উৎপাদনের উন্নতি। ১৯৬৪ সালে যা ছিল, ১৯৭৪-এ তার চেয়ে ছয় গুণ বেশী উৎপাদন হচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় শুনেছি নির্ধারিত সীমা বহু গুণ ছাড়িয়ে গেছে। মিসেস পাংওয়েন যু নামে এক বৃদ্ধা খুব জোরের সঙ্গে বললেন, চেয়ারম্যান বলেছেন, গ্রাম্প রেভলিউশান অ্যান্ড ইনক্রিজ প্রডাকশান—বিপ্লব এগিয়ে নাও, উৎপাদন বাড়াও। আমি ভাবছি, এরা কোন ভাষায় কথা বলছে! আমাদের তো বিপ্লব মানে ঘেরাও কর, উৎপাদন ধ্বংস হোক। যাক। সেদিন মিসেস পাংওয়েন কমপ্রোডার ফিলোসফি-র ব্যাখ্যা করলেন। বাইরে থেকে সাহায্য আনার ঝোঁক—সেটা গর্হিত। ভিতরের শক্তিকে খর্ব করে। তাই আমরা আর বাইরের সাহায্য নিই না।—এটা একটা মত ঠিকই, কিন্তু একে কি করে ফিলসফি বলা যায় তা বুঝলাম না।

অনেক তথ্য সংগ্রহ করে আমরা যখন গাড়িতে উঠতে যাব তখন সহসাই আমাদের দোভাষী লী আমাকে বলল, চেয়ারম্যান বলেছেন—'গিভ এজ মাচ এজ ইউ ক্যান, টেক অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ নীড'—(তোমার যতটা শক্তি দাও, যতটুকু দরকার নাও)। সে কেন ঠিক তখন এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করল, জানি না। তবে সেই মুহূর্তে আমি অজ্ঞ মহিলাদের উৎসাহে এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অবিশ্বাস্য রহস্যের আভাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেলাম। একটা কিছু বুঝতে পারলাম, যা বহু খুঁটিনাটি জ্ঞাতব্য তথ্যের তালিকায় পাইনি।
গাড়িতে বসে আমার কেবল মনে হতে লাগল, আমরা কি শুনেছি, কি দেখছি। স্রষ্টা মাও-সে-তুং কি বন্দুকের নলে বারুদ পুরেছিলেন, কাস্তে হাতুড়ি পেটাচ্ছিলেন, না মানুষ তৈরি করছিলেন? শক্তির উৎস কি? বন্দুকের নল, না মানুষ?

অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্যাক্টরী থেকে ফিরে আমাদের যাত্রার আয়োজন শুরু হল। সেইদিনই অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর আমরা হোপেই প্রদেশে সিজিয়াচুয়াং যাব। সেখানেই ডাঃ কোটনিসের স্মৃতিভবনের দ্বার উদ্ঘাটন হবে ৯ ডিসেম্বর। সেটা তাঁর চৌত্রিশতম মৃত্যুদিন। আমাদের বলা হল ৩/৪ দিনের মত জিনিস নিয়ে বাকি সব হোটেলে রেখে যেতে। ডাঃ বসু বারবার বললেন, খুচরো জিনিস ফেলে গেলেও খোয়া যাবার ভয় নেই। আমি তাই হোটেল-ঘরের হ্যাংগারে দুটি কোট ঝুলিয়ে রেখে গেলাম। একটি আমার দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া লণ্ডনে কেনা একটা পাতলা 'সামার' কোট। ওটা কেন নিয়ে গিয়েছিলাম জানি না। আর দ্বিতীয়টি পিকিং-এ পূর্বের দিনে কেনা তুলো-ভরা কোট। আর একটা ব্যাগে ভরে খুচরো জিনিসপত্র। সঙ্গে নিলাম ওদের দেওয়া দুর্বহ ও বিশাল কোটটি। শুনেছি ওখানে আরো ঠাণ্ডা হবে। আমরা ট্রেনে যাব ছয় ঘণ্টার পথ। স্টেশনে গিয়ে দেখি ইয়োরোপীয়ানরাও এসেছেন। সপত্নীক ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁর অ্যাটাচি শ্রীমেননও চলেছেন। আর চলেছেন আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা ওয়াং শিন্ নান—বৈদেশিক মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান, যাঁকে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলব ভেবেছিলাম। তাঁর সঙ্গে দক্ষ সুদর্শন দোভাষীকেও দেখলাম। এঁর নাম কুং সে সিন (Ku Tze hsin)। ইনি বললেন, আমার উপহার দেওয়া বইটি 'টেগোর, দি ম্যান বিহাইণ্ড হিজ পোয়েট্রি' পড়ে ফেলেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি কোনো সাহিত্যিক জীবিত আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথকে চিনতেন? তিনি বললেন, একজন প্রসিদ্ধ লেখিকা আছেন, তাঁর নাম মিসেস সি পিন সিন (Mrs. Hsei Pin Sin), তিনিই রবীন্দ্রনাথের রচনা চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। শুনেই আমার মনটা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উতলা হল। কুং সে সিন বললেন যে, খোঁজ করলে অবশ্যই তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি প্রসিদ্ধ লেখিকা। আমার জাপানের টমিকো কোরার কথা মনে পড়ল। জাপানেও রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদিকা ও ঠাকুর সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী একজন মহিলা। এঁর সঙ্গে আমার দেখা হবার ও বন্ধুত্ব হবার সুযোগ হয়েছিল। মেয়েরাই দেখছি রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারক। কুং সে সিন বললেন, একদিন চীনের মানুষ রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিল এবং অনেকে তাঁর কবিতার অনুকরণ করে লিখত। তখন আমার মনে হল 'পরিন্দু চীনের বাস' কবিতাটা একে শোনাই। আমি লী-কে বললুম তোমায় যে কবিতাটা টাইপ করতে দিয়েছেন, হয়েছে? সে বললে, না, এখনও হয়নি। আমার বেশ রাগ হল, এ ছেলেটা তো অবাধ্য! আমি ভ্রূকুটি করলাম, কেন হয়নি? তা হলে বললে না কেন, আমি কপি করতাম। সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলতে লাগল, কালকেই তিন কপি টাইপ করে দেবে। এবং দিয়েও ছিল।
রুই আলির সঙ্গে স্টেশনে বেশ কয়েকটা ছবি তোলা হল, কিন্তু তার একটাও দেখছি না। সম্ভবত ওঠেনি। সবাই ট্রেনে উঠে গেল। স্টেশনে 'চলন্ত সিঁড়ি' (এসকালেটর) জ্ঞানসিংকে খুব আনন্দিত করেছিল। তিনি এটা চীনের একটা বিশেষ কৃতিত্ব মনে করেছিলেন। ট্রেনেই প্রথম প্রশ্নোত্তরের সুবিধা পেলাম। ইতিমধ্যে মং-এর সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছে। মানুষটির পরিচয় পেয়েছি। বয়স পঞ্চাশোর্ধ, মোটাসোটা হাসিখুশী মানুষ। আমাদের দলের ভারতীয়রা সবাই খুব গুরুগম্ভীর। ফাঁক পেলে দীনেশ আর আমি একটু হেসে নিতাম। এবার মং দলে ভিড়ল এবং আমাকে ক্ষেপাতে শুরু করল। দীনেশ আর আমি তাকে পেড়ে ধরলাম। দীনেশ জানতে চায় ওখানে বিচার ব্যবস্থা কি রকম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানতে চাই ফ্যামিলি প্ল্যানিং। আমাকে কেউ যেন বলেছিল—কমিউনিস্ট দেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিং পছন্দ করে না। কিন্তু জানলাম, তা নয়। এরা খুব ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে। এবং তার প্রথম চেষ্টা হচ্ছে বোঝানোর মাধ্যমে দেওয়ালে ত্রিকোণ চিহ্ন এঁকে, শহরে শৌখীন সভায় বক্তৃতা করে নয়। গ্রামে গ্রামে কমিউনের মাধ্যমে। ওদের সুবিধা হচ্ছে এই যে, প্রচারযন্ত্রটা খুব কার্যকরী। কমিউনের কমিটি যেমন চাষ সম্বন্ধে, পশুপালন সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, পর্যালোচনা করে, যেমন কোনো কর্মপদ্ধতি আলোচনা করে, তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেয়। কমিউনের কমিটি সাধারণ মানুষের 'ওয়ার্ক টিম' বা কর্মিদল থেকে নির্বাচিত। নির্বাচনের সময়ই তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও শৃঙ্খলাবোধ জন্মেছে। কোনো কথা যুক্তি দিয়ে বললে তা বুঝতে এবং বোঝাতে পারে। কাজেই, ব্যাপকভাবে বোঝানোর কাজটা হয়। এবং যেহেতু কমিউনের সভ্যরা সেই গ্রামেরই নির্বাচিত ব্যক্তি, তারা বাইরে থেকে প্রচার করতে আসছে না, সেহেতু তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়। আমাদের সোস্যাল ওয়ার্কাররা জন্মনিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিতে গ্রামে যান কি না জানি না, গেলেও তাঁদের সঙ্গে গ্রামের লোকের অন্তরের যোগের অভাবহেতু তারা সেসব পরামর্শ বড়লোকী পরামর্শ বলে অগ্রাহ্য করে। শহরে বস্তিতেও যখন সোস্যাল ওয়ার্কাররা যান, তাঁরাও ভালো জামা-কাপড় পরে বাইরে থেকে আসেন। তাঁদের বোঝানোটাও তাই বহিরঙ্গ ব্যাপার—তা এতটুকু মনে দাগ কাটে না। তারপর আমাদের একটা প্রধান প্রতিবন্ধক ঈশ্বরনির্ভরতা, অর্থাৎ 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।' আমাদের পাশের বস্তির করিম, যার বারোটি সন্তান জন্মেছে, তাকে বলতে সে বলল, 'যে বৃক্ষে যে ক'টি ফল ফলবার তা ফলবে।' এই রকম উচ্চ দার্শনিক চিন্তা শুনলাম চীনারা জনসাধারণের মধ্য থেকে ক্ষেঁটিয়ে বিদায় করেছে—যেমন বিদায় করেছে কনফিউসিয়াসকে। কালচারাল রেভলিউশনের একটি প্রধান যুদ্ধ ছিল কনফিউসিয়াসের সঙ্গে। কলকাতায় যখন কালচারাল রেভলিউশনের তাণ্ডবের কথা খামাদের কাগজে পড়তাম মনে হত চীনে একটা পাগলামি চলছে। তখন একজন অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন, দেখছেন না, চীনে ওরা কনফিউসিয়াসেরও পিছনে লেগেছে! আমাদের ছেলেরাও তারই অনুকরণে বিদ্যাসাগরের মুণ্ড উড়িয়ে দিয়েছে (বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর মাথা ভেঙে ফেলা হয়েছিল)। অর্থাৎ, যা কিছু মননীয় তার মানহানি করা। এ-কথাটা সকালবেলা উঠেছিল। অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্যাক্টরীর মহিলারা কথাসূত্রে কনফিউসিয়াসবিরোধী আন্দোলনের উল্লেখ করায় আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন? তখনই আমাদের দলের কেউ কেউ আমায় থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ও-সব অত্যন্ত সাধারণ কথা—তাঁরা পরে বুঝিয়ে দেবেন। আমি তাতে সন্তুষ্ট হইনি। কারণ, এই সব সবজান্তারা নিজেরা অনেক কিছু জানেন বটে, কিন্তু ভারতের মানুষকে তো কিছুই বোঝাতে পারেননি, পারলে ভারত-চীন সম্পর্কটা এত কটু হত না! যা হোক, এবার মং নিজেই কথা তুললে। সে বললে,—এইবার তোমার কনফিউসিয়াসের প্রশ্নটার উত্তর দেব। ঐ পশ্চাৎমুখী উপদেশ্টার কথাগুলি আগে আমরা নাকচ করেছি, তবে নতুন যুগের সমস্যা লোককে বোঝানো গেছে। তিনি বলেছিলেন, যত সন্তান ততই পুণ্য। এই বিশ্বাস যদি বদ্ধমূল হয় তা হলে তুমি জন্মনিয়ন্ত্রণ করবে কি করে?

আমি বললাম,—তা হোক, তাই বলে তোমরা ঐরকম জ্ঞানী পুরুষকে এত নিন্দা করবে? মং বললে,—তুমি কনফিউসিয়াস পড়েছ? আমার বিদ্যার উপর এ একরকম কটাক্ষপাত হলেও আমি ভেবে দেখলাম সত্যই তেমন কিছু পড়িনি। তা নাই বা পড়লাম, সবই কি পড়ে জানতে হবে নাকি! আমি বললাম,—'আমি তো বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটক পড়িনি, তাই বলে কি শাক্যমুনিকে জানি না (ওরা বুদ্ধদেবকে শাক্যমুনি বলে)? আর তা ছাড়া কনফিউসিয়াসের সময় তো মার্কস জন্মাননি। সে বেচারা সোস্যালিজম জানবে কি করে?'—মং বললে,—'জানো, অতি পুরাণকালেও এমন অনেক মানুষ ছিলেন যাঁদের মুখ সামনের দিকে ফেরানো—যাঁদের উপদেশ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁরা যে যুগেরই মানুষ হোন, সর্বদাই শ্রদ্ধার পাত্র থাকেন। আর অনেকে আছেন যাঁরা কিছু জ্ঞানের কথা বললেও তাঁদের অনুসরণ করলে মানুষ পশ্চাৎমুখী হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-কথা শুনে মংকে আমার বেশ বিজ্ঞ বলেই মনে হল। কারণ, আমার দুটো দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল। কতকাল আগে চণ্ডীদাস বলেছেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এ হচ্ছে সেই সামনের দিকে মুখ ফেরানো কথা। তারও বহু যুগ আগে বোধ হয় মহাভারতেই আছে যে, "যে লোক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করে রাখে, স্তেনঃ সঃ—সে চোর।" খুব সম্ভব এর চেয়ে উন্নততর মানবতার বাণী মার্ক্স বা লেনিনও বলতে পারেননি। আর ওদিকে দেখ ঈশ্বর গুপ্ত—বাঙালীর মেয়ের লেখাপড়া শেখাটা তাঁর কাছে সর্বনাশ। "আর কটা দিন সবুর কর, পাবেই পাবে দেখতে পাবে, আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে!" কিংবা হেমচন্দ্রর "খেয়ে যায় নিয়ে যায় আরো যায় চেয়ে, ঐ যায় ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে!" সবচেয়ে বঞ্চিত, সবচেয়ে উপদ্রুত, দুর্বল মানুষের প্রতি বিদ্রূপ! আর 'দি গ্রেট ল গিভার' পরমপ্রাজ্ঞ মনু—তিনি বলে বসলেন, শূদ্রের কানে বেদ গেলে গরম সীসা ঢেলে দিতে হবে। আর মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর যেসব মতামত তা মানলে আজকে আর আমাকে কলম ধরতে হত না। এই সমস্ত কথা আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ভাবলাম, এসব কথা একটু মংকে বলি—আমরাও বিপ্লব করেছি গো, তোমাদের মেয়েরা পা বাঁধত, আমাদের জ্যান্ত পোড়ান হত। আমি যে আজ এখানে ঘরসংসার ফেলে একা একা পুরুষদের দলে ভিড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং তোমার সঙ্গে তর্ক করছি এটা বিপ্লবের ফল। এ বিপ্লব করেছেন রামমোহন, ব্রাহ্ম সমাজ, রবীন্দ্রনাথ, আমাদের ধাপে ধাপে হয়েছে, তোমরা হঠাৎ লাফ মেরেছ। কিন্তু লী কোথায় পালিয়েছে, চৌ বেচারা অনুবাদ করে করে হয়রান হচ্ছে—তাই ওকে আর কষ্ট দিলাম না। মং বললে, "কনফিউসিয়াস বলেছিলেন, দরিদ্রেরা মূর্খ, ধনীরা জ্ঞানী। কিংবা, স্ত্রীলোকের স্থান উনুনের পাশে। এসব কথা মানলে বা এসব কথার মূল উৎপাটন না করলে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়া সম্ভব কি?" মং যখন ওদের দেশের কথা বলে তখন আমার মনের মধ্যে ঝড় বয়, আমি নিঃশব্দ বিতর্ক করি। সত্যিই আমাদেরও তো নূতন সমাজ গড়ার চেষ্টা হয়েছিল, আমরাও তো পেয়েছি বড় বড় চিন্তাবিদকে যাঁরা আমাদের সংস্কারবদ্ধ জীবনের অর্গল খুলেছেন, তবু হল না কেন? তবু কেন এখনও আমাদের দেশে মার্কস আর মনুর সহাবস্থান? যার ফলে, সমগ্র সমাজকে কোনো বিষয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এত কঠিন!

মং বলছিলেন, "কমিউনের স্তরে জনসাধারণকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ অবহিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সুযোগ সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।"

"এত ঘুরছে কে?"

"কেন, বেয়ার-ফুট ডাক্তার! ঐ ডাক্তাররা দাঁড়িয়ে থেকে বড়ি খাইয়ে তবে আসে। কারুর অসাবধানী কেউ হয়তো ফেলে রাখবে বা ভুলে যাবে।" আমি জানতে চাইলাম, মুসলমানরা এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাঁদের ধর্ম কি বলে। শুনে আশ্চর্য হলাম, মুসলমানরা এই দুর্দান্ত শুয়োর-খেকো দেশে শুয়োর খায় না কিন্তু তাদের ধর্মের ঐটুকুই তারা মানে, আর কিছুই না। না নামাজ, না রোজা। পাঁচটা স্তম্ভের সবই ধ্বসে গেছে। তবে জাকাতটা বোধ হয় অন্যরূপে সরকার আদায় করে নিচ্ছে। মুসলমানরাও জন্মনিয়ন্ত্রণে আপত্তি করে না। মং খুব জোরের সঙ্গে বললেন যে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং না হলে কোনো প্ল্যানিংই সফল হবে না। আর আমাদের প্ল্যানড ইকনমি, তার মধ্যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং না হলে তো সবই বানচাল। কাজেই, এ বিষয়ে আমরা সচেতন। চীন দেশে প্রায় নয় শত মিলিয়ান মানুষ—এর মধ্যে বৃদ্ধ ও শিশু ছাড়া সকলেরই কর্মসংস্থান আছে।

ইতিমধ্যে শ্রীনারায়ণনের স্ত্রী এসে বসেছিলেন। তিনি নানারকম গল্প শুরু করলেন। ওদিকে সু এসে বললে যে, রুই আলি আমায় ডাকছেন। রুই আলি জানতেন, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব ব্যগ্র। ট্রেনে তাঁর ঘরে এলাম। আমার সঙ্গে ডাঃ বৎসলা কোটনিসও এলেন। আমি প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বিয়ে করেননি কেন। ভদ্রলোক খুব আমুদে, বললেন, এখন সময় হয়েছে, কিন্তু এখন কেউ তাকে বিয়ে করবে না। অবশ্য এক সময় ঠিকই করত, কিন্তু তখন তাঁর সময় ছিল না। চীনের সর্বব্যাপী যুদ্ধে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রেই তাঁর সমস্ত সময়টা কেটে গেল। এঁর কাছেও আমি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটা তুললাম। এ বিষয়ে জানবার আগ্রহ আমার এত বেশি, কারণ আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করি আমাদের দেশে এই সমস্যাটির সর্বাগ্রে সমাধান দরকার। কিন্তু কোনো একটি সামাজিক সমস্যাকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না, এদিকে বুদ্ধি পরিষ্কার করতে হলে ধর্মান্ধতা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে হবে। রুই আলি বললেন, এখন মৃত্যুর হার এত কমে গেছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রয়োজন। আগে দুর্ভিক্ষে, মারীতে হাজার হাজার লোক মারা যেত—গ্রেট ওয়ালের কাছে ফেলে দিয়ে যেত নিরন্ন পীড়িত মানুষকে। আর আজ তো অন্নে, বস্ত্রে, চিকিৎসায় মানুষ সুস্থ ও সবল। আমি তাঁকে বললাম—কি কি প্রণালীতে নিয়ন্ত্রণ সফল হচ্ছে, খুলে বলুন। প্রথমত তিনি বলেন, আগে কুড়ি বছরের ছেলে ও আঠারো বছরের মেয়ের বিয়ে হতে পারত, এখন ছেলে ত্রিশ বছর ও মেয়ের বিশ বছরের আগে সরকার বিয়ের লাইসেন্স দেবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরকম হলে অবিবাহিত বাপ-মায়ের সন্তান হয় না? চৌ বললে,—ব্যাস্টার্ড যে নেই তা নয়!—আমি ভ্রূকুঞ্চিত করলাম,—এই চৌ ঐ শব্দটা বলো না। কোন শিশু সম্বন্ধে আমরা ও শব্দটা ব্যবহার করি না।—

—সেটা ঠিকই, বাচ্চার তো কোনো দোষ নেই।—আমি বললাম,—ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে করতে না দিলে, বাপেরও খুব দোষ নেই।—রুই আলি হাসছিলেন,—যাই হোক, এখানে অবিবাহিত নরনারীর সন্তান-জন্ম নিন্দিত হয়।—আমি বললাম,—আমাদের দেশেও হয়, তবে ইয়োরোপে নয়—তারা পারমিসিভ।—

—অত পারমিসিভ হলে এখানে চলবে না।—

—কিন্তু অবিবাহিত মায়ের সন্তানের কি হবে?—

—কি আর হবে, ভালই থাকবে। মা দেখবে, নয়তো কমিউন দেখবে।—তা ছাড়া রুই আলি আরো বললেন যে, 'অ্যাবরসন' আইনসঙ্গত। প্রত্যেক হাসপাতালেই ব্যবস্থা আছে। তিনি নিজে দেখেছেন, একটি মেয়ে দুকুল ও মিনিট পাঁচেরোর মধ্যে অ্যাবরসন করে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এজন্য তার স্বামীর মতের প্রয়োজন হবে কি না। তিনি বললেন, ব্যাপারটা তার, এতে তার স্বামীর মতের প্রয়োজন কি? তা ছাড়া আরো জানলাম যে, চীন দেশে ভ্রূণহত্যা কোনো দিনই নিষিদ্ধ ছিল না। এইখানে আমাদের সঙ্গে পার্থক্যটা খুব বেশি। কারণ, আমাদের দেশে 'ভ্রূণহত্যা' চিরকাল মহাপাপ বলে গণ্য। মনের ভিতরে এর প্রভাব লিকড় গেড়ে আছে। আমি নিজেকে খুব সংস্কারমুক্ত মনে করি, কিন্তু মনে মনে এর সমর্থন করতে পারি না। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কিন্তু তার জন্য কতদূর যাবে? যা হোক, আরো শুনলাম যে, বেয়ার-ফুট বা খালিপদ ডাক্তাররা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখে কোন্ বাড়িতে কতজন ছেলেপিলে আছে এবং সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা কতটা। সেই অনুসারে ওষুধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে আসে। রুই আলি আরো বললেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটার মধ্যে কোনো নৈতিক প্রশ্ন এরা আনছে না। ধর্মীয় তো নয়ই। প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা। যেমন হান জাতি, যারা মানডেরিন ভাষা বলে, অর্থাৎ প্রধান চীন জাতি, তাদের মধ্যে জনসংখ্যা বাড়ছে; কিন্তু মাইনরিটিদের মধ্যে বাড়ছে না। ওরা মাইনরিটি অর্থে উপজাতি বোঝায়। উপজাতি বা ট্রাইব। যেমন তিব্বতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না, তুর্কী সুজকিংদের মধ্যেও না। এদের এত জমি আছে যে, চাষ করে উঠতে পারে না। চৌয়াং, মিও প্রভৃতি উপজাতির বিস্তীর্ণ অনাবাদী জমি পড়ে রয়েছে। তাদের বংশ বাড়লে ক্ষতি নেই। হাইনান দ্বীপের লি জাতি, উত্তর-পশ্চিম কোরিয়ার লি জাতি ও অন্যান্য ছোট ছোট উপজাতিদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত উপজাতিরা ধীরে ধীরে সভ্যতার বাতাসে পৃথিবী থেকে এমনিই উবে যাচ্ছে। তাই তাদের সম্বন্ধে এখন এ সব ব্যবস্থা হচ্ছে না। যদিও সভ্যতার সমস্ত সুবিধাগুলি তাদের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা হচ্ছে। আমি বুঝলাম যে, চীনও আমাদের মত বহু-জাতি বহু-ভাষা অধ্যুষিত জাতি। কাজেই, এই দুই পুরাতন ঐতিহ্যবাহী দেশের মধ্যে মিল অনেক। সমস্যাগুলিও একরকম।

এরপর রুই আলির সঙ্গে রুশ-চীন সম্পর্ক নিয়ে কথা হল। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা আলোচনা। আমি রাশিয়ায় দু'বার গিয়েছি, 'রাশিয়ার চিঠি' পড়েছি, সে দেশের চিন্তাধারার জগতের উপর প্রভাব নিয়ে অনেক ভেবেছি, কাজেই আমার দায়িত্ব আছে, আমি সহজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের কথা মেনে নিতে পারছি না, তাই অত বিতর্ক। যাক, সে সব কথা পরে অন্য প্রসঙ্গে লেখা যাবে। শুধু একটা কথা আমার কানে বাজতে লাগল—রুই আলি বলেছেন,—তোমার মতে রুশিরা জগতে শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছে। তা হলে কেন প্রতি ছয় মাসে একটা করে সাবমেরিন ও দুই মিলিয়ন নিউক্লিয়ার মিসাইল বানাচ্ছে! এইভাবে রণসম্ভার বাড়ানোটা কি তোমার মতে শান্তিপ্রিয়তার লক্ষণ?—

আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি তো কিছুই জানি না, রুশীয়রা কত অস্ত্র বানাচ্ছে, আমেরিকানরাই বা কত, চীনারাই বা কি করছে! কিন্তু এইভাবে যে ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্রের স্তূপ ক্রমেই বেড়ে উঠছে এবং যে-কোনো দিন একটা বিস্ফোরণে মহাসর্বনাশ ঘটে যেতে পারে, তাও আমরা শুনেছি। আমি রাশিয়াতেই যুদ্ধবিরোধী কথা অনেক শুনেছি। তবে এত শান্তি সম্মেলনের অর্থ কি—সব কি ভাঁওতা? রুশদের দ্বারা আয়োজিত লুসাগে অনুষ্ঠিত 'নারী মহাসম্মেলনের' কথা মনে পড়তে লাগল। যেখানে সভার মধ্যে ভিয়েৎনামের এক নারী তাঁর অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। আর একজন বলেছিলেন, প্রত্যেক মেয়েরই এই প্রতিজ্ঞা হোক, আমার সন্তানকে মরতে পাঠাব না, তাকে হত্যাকারীও হতে দেব না। এসব কি মিথ্যা? তা কখনো নয়। সময় বদলে যায়, মানুষ বদলায়, একজনের অভিজ্ঞতার ফল আর একজনের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। যাই হোক, রুশীয়রা যে সত্যিই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চায় বা এটম বোমা ছুঁড়ে বসতে পারে এ আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করি? রুই আলি তো তাঁর মতে স্থির যে, রাশিয়াও যুদ্ধবাজ হয়ে উঠছে। আর কোসিগিন তো আমার সঙ্গে আলোচনায় বসবে না, তাই বিমর্ষ মনে রুই আলির দেওয়া রাম-ভরা ফ্রেঞ্চ চকোলেটের মত সুস্বাদু চকোলেট খেতে খেতে পাশের ঘরে চলে গেলুম। বৎসলা বললে, "তুমি পারোও বটে—এত প্রশ্ন তোমার মনে আসে! ঝাড়া দু ঘণ্টা প্রশ্নের বোম্বারডমেণ্ট!"

॥ ৫ ॥

আমরা যখন সিজুয়াচুয়াং স্টেশনে ঢুকছি তখন রাত্রি ন'টা। ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। ডাঃ বসু বললেন,—নামবার সময় একটু অরগানাইসড্ ভাবে নামতে হবে। ওরা নাকি নিউজরীলের জন্য সিনেমা-ছবি তুলবে। তাই আমি ও আমার স্ত্রী প্রথম নামবো। তারপর বৎসলা ও মুকেশ কোটনিস। কারণ ওঁদের ভাইয়ের প্রাধান্যে ওঁরাও বিশিষ্ট। তারপর জ্ঞানসিং খিংড়া। কারণ, তিনি ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির দিল্লী শাখার সভাপতি। তারপর আপনারা যে যেমন খুশি।— আমি তাতে খুবই নিশ্চিন্ত। ভাঙ্গা পা, পর্বতপ্রমাণ কোট, এর হাত ধরে ওর কাঁধে ভর দিয়ে আমার অবতরণ যে একেবারেই সিনেমা স্টারের মত দর্শনযোগ্য হবে না এ সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম।

স্টেশনে নেমে দেখি হু হু করে হিমস্পর্শ, বাতাস বইছে, ঝিরঝির বরফ পড়ছে, ঠাণ্ডা একেবারে অস্থিভেদ করে যাচ্ছে। খুব ভিড়, স্টেশনে আলো কম। শুধু সিনেমা তোলবার জন্য তীব্র আলো এক-একটা ছোট ছোট বৃত্ত আলোকিত করছে। আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন হোপেই প্রদেশের রেভলিউশনারী কমিটির চেয়ারম্যান। এ আমাদের দেশের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির মতই। এর মধ্যে একটি বর্ষীয়সী চীনা মহিলা, হ্রস্বদেহ, খুব সবল ও দৃঢ়—এগিয়ে এসে বৎসলাকে আলিঙ্গন করলেন। ইনি কোচিন লান—ডাঃ কোটনিসের স্ত্রী। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল একটি প্রকাণ্ড গেস্ট হাউসে। লাউঞ্জ বা বসবার ঘরটি খুব লম্বা। এক প্রান্তে বড় বড় সোফা। সেখানে বিশিষ্টরা বসেছেন। আর দু' লাইনে এক-একজনের বসবার সোফা। দুটি সোফার মাঝে মাঝে একটি করে টেবিল। তাতে যথারীতি চায়ের পেয়ালা প্রত্যেকের জন্য সাজানো আছে। আর আছে নানারকম টফি, বাদাম, আখরোট ও বড় বড় রঙ্গীন রসালো আপেল। গরম তোয়ালে পরিবেশনের পর চা এল। চা-এর কাপে হাত সেঁকতে সেঁকতে অভ্যর্থনা শুনতে লাগলাম। অভ্যর্থনা করলেন সিজিয়াচুয়াং-এর রেভলিউশনারি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান। বেঁটে ছোটখাটো মেয়ে আর বিনুনি আছে বলে আরো ছোট লাগে। চীনে অল্পবয়সী মেয়েরাই লম্বা চুল রাখে ও বিনুনি বাঁধে। বয়স্করা চুল কেটে ফেলে। খোঁপা বড় একটা দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেস্ট হাউসে লোকজনে ভর্তি। বুঝলাম এরা সবাই স্যার উদ্ঘাটন উৎসবের জন্য এসেছে। বেশির ভাগ মানুষই অলিভ রঙের ইউনিফর্মে, কাঁধের কাছে লাল ফিতে। সবাইয়েরই একরকম চিহ্ন। এঁরা সব পিপলস লিবারেশন আর্মির লোক। এঁদের মধ্যে কাজের তারতম্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু পদের তারতম্যের কোনো বাহ্য লক্ষণ নেই। কে সেনাপতি, আর কে পদাতিক, তা সাজে বা ব্যবহারে কিছু বোঝা যাবে না। এক সঙ্গে খাওয়া-বসা, একরকম পোশাক, কোনো ডেকোরেশন ঝকমক করছে না কারো অঙ্গে। তা ছাড়া সবচেয়ে ভালো লাগে যে, সৈন্যরা সাধারণ লোকের সঙ্গে কাজে-কর্মে মিশে আছে সমাজে, পরগাছার মত নয়। যুদ্ধ করবার জন্য জিয়ানো মাছের মত এঁদের পোষা হচ্ছে না—জুতো পালিশ, বোতাম পালিশ, আর 'সোলজারস ক্লাবে' আড্ডা দিয়ে জীবন কাটাবার উপায় নেই। শস্যক্ষেত্রে চাষ করছে, ফ্যাক্টরীতে কর্মসমিতিতে কাজ করছে, নানা প্রতিষ্ঠানে নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছে। ইংরেজ আমল থেকে আমাদের মাইনে-করা বা যাকে বলে "মার্সিনারি আর্মি" দেখা অভ্যাস। সৈন্য দেখলে আমরা একটু দূরে সরে যাই। পিপলস রেভলিউশনারী আর্মি বা পিপলস লিবারেশন আর্মি বলতে কি বোঝায় তা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে গেল, পূর্ব জার্মানী থেকে পশ্চিম জার্মানী যাব—অর্থাৎ, বার্লিনে কাঁটাতারের বেড়া পার হব ১৯৬২ সালে। ডেমক্রেটিক জার্মানীর নিষ্ক্রমণের দ্বারে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সীমান্তে আমেরিকান সৈন্য। দুবার করে আমার পাসপোর্ট দেখবে। আমি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এরা কে!" দোভাষী রুশ সৈন্যর দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উল্টে বললে, এরা হচ্ছে 'লিবারেশন আর্মি', আর আমেরিকান সৈন্যর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললে, ওরা হচ্ছে 'অকুপেশন আর্মি'। তফাত কিছু দেখতে পাচ্ছ? বুঝতে পারলাম, বিভক্ত জার্মানীর বুকের উপরে এই দুই বিদেশী সৈন্যর উপস্থিতি একইরকম বিরক্তিকর। যা হোক, এখানকার অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে বা বয়স্ক উচ্চপদস্থ সৈনিক সবাই ছবের লোকের মত মিলেমিশে রয়েছে। এটার খুবই দূরপ্রসারী ফল আছে নিশ্চয়। এই উৎসবে এত মিলিশিয়া আসবার কারণ ডাঃ কোটনিস নিজে সৈন্যদের সঙ্গেই কাজ করেছেন।

এইখানে ভারতীয় 'মেডিকেল মিশন' সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। ভারতে যখন স্বাধীনতার প্রয়াস জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নানা উদ্যোগে অভিব্যক্ত হচ্ছে তখন বিশ্বের সব দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সঙ্গে তার একটি একাত্মবোধ জন্মানো স্বাভাবিক। স্পেনের গৃহযুদ্ধেও দেখেছি অনেক দেশ থেকে স্বেচ্ছা-বাহিনী গিয়েছিল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সহায় হতে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সেখানে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক গিয়েছে। এত বেশী লোক গিয়েছিল যে, অনেক সময় তা পরিহাসের বিষয় হয়েছিল। আমার মনে আছে ঐ সময় একজন ইংরাজ ভদ্রলোক কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিলেন, "স্পেনের গৃহযুদ্ধে পনেরোজন ইংরেজ মরেছে, কুড়িজন ফরাসী, দশজন ইটালীয়ান ইত্যাদি ও একজন স্প্যানিয়ার্ড।" তারপর তাঁর সহাস্য মন্তব্য—পরের ব্যাপারে নাক গলানোর উচিত সাজা (Serves him right for butting in) তা ঠাট্টাতামাশা যাই হোক, পৃথিবীর ইতিহাসে ঐ সময় থেকে একটা নূতন ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। যদি একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের মিত্রশক্তিরূপে যুদ্ধে সহায় নাও হয়, ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ন্যায়যুদ্ধের বা ধর্মযুদ্ধের সামিল হবার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়া। চীনের উপর জাপানী আক্রমণও ভারতের মানুষকে তেমনি বিচলিত করেছিল। একে তো চীনের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের ভালো সম্বন্ধ, তার উপরে জাপানীদের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা—দুই মিলে ভারতের নেতৃবৃন্দ চীনের প্রতি সহানুভূতির একটা বাস্তব রূপ দেবার কথা চিন্তা করেন। সেজন্যেই তাঁরা পাঁচজন ভারতীয় ডাক্তারের একটি দলকে চীনের মুক্তিকামী মানুষের সাহায্যার্থে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্বে বোধ হয় ১৯২৬-এর কাছাকাছি সময়ে ইংরেজরা তাদের দখলের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এক দল ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়েছিল। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, আমাদের এমনই অবস্থা যে, আমরা নিজেরা পরাধীন আবার আমাদেরই মানুষ অন্যকে পরাধীন রাখতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্য করবে! আমার যতদূর মনে পড়ে, তারা ছিল শিখ সৈন্য এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। শুধু তো জাপানী নয়, দীর্ঘদিন ধরে ইয়োরোপের সমস্ত শক্তিশালী লোলুপ জাতিরা চীনের নানা অংশ দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে লুঠপাট ও অত্যাচার চালিয়েছে। এবারে ১৯৩৭ সালে জাপান 'সভ্য' হয়েই সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ চীনের উপর আক্রমণ করল। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ চিয়াং কাইশেককে লিখেছিলেন, 'আপনাদের প্রতিবেশী যে জাপান শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য আপনাদের দেশের কাছে ঋণী, তার নিজের মঙ্গলের জন্যই আপনার দেশের সঙ্গে যার বন্ধুত্ব করা উচিত, সে হঠাৎ পাশ্চাত্ত্য জগতের ইম্পিরিয়ালিজমের রোগে আক্রান্ত হয়ে পূর্ব দেশের মহৎ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার যে সুযোগ পেয়েছিল তা নষ্ট করে ফেলল।'

যে ডাক্তারদের দলটিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উৎসাহে ভারতীয় কংগ্রেস চীনে পাঠালেন তাঁদের নেতা ছিলেন ডাঃ অটল। ইনি স্পেনের যুদ্ধেও গিয়েছিলেন। অতিশয় সৎ ও মহৎ এই ডাক্তার পরে ১৯৫৮ সালে আবার চীন ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর চীনের প্রতি ভালোবাসা এত গভীর যে, অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি যাবার সুযোগ পেয়ে নিরস্ত হলেন না। আর সেইখানেই মারা গেলেন। শুনেছি, চৌ-এন-লাই ও চু-তে, যিনি সেনাপতির সর্বোচ্চ পদাধিকারে ছিলেন, তাঁরা তাঁর শবাধার বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সমাধি আমরা দেখে এসেছি। ঐ দলে ডাঃ বসু, ডাঃ দ্বারকানাথ কোর্টনিস ও আরো দুজন ছিলেন। তখন উত্তর চীনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচন্ড শীত। শীত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলে চলে এলেন। ডাঃ বিজয় বসু আরো কিছুদিন ছিলেন। কেবল ডাঃ কোর্টনিস রয়ে গেলেন। তিনি সর্বরকমের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায় হলেন। কঠিন পরিশ্রমে, অনিয়মে, অত্যাচারে শরীর ভেঙ্গে পড়ল। তাঁর ঘন ঘন মূর্ছা হত। একদিন মারা গেলেন সেই রোগেই। ইতিমধ্যে তিনি একটি চীনা মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। মাত্র এক মাসের ছেলে রেখে ডাঃ কোর্টনিস মারা যান। ছেলেটির নাম রাখা হয় 'ইনহুয়া', অর্থাৎ ইন্ডিয়াচায়না। এই ছেলেটিও পঁচিশ বছর বয়সে মাত্র দু' দিনের অসুখে মারা যায়। অনেক কষ্ট পেয়েছেন কোর্টনিস-পত্নী কোচিন লান। যদিও তিনি আর একবার বিবাহ করেছিলেন, এই পরিবারের প্রতি মমতা তাঁর ক্ষুণ্ন হয়নি। কতটুকুই বা দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু যেভাবে তিনি বৎসলাকে আপন করে নিলেন তাতে বোঝা গেল এই পরিবারের জন্য তাঁর হৃদয়ে একটি স্থান অটুট রয়েছে। চীনের মানুষও তো ডাঃ কোর্টনিসকে কোনো দিন ভোলেনি! প্রতি বৎসর তাঁর মৃত্যুদিবস পালিত হয়। আর হয় ডাঃ বেথুনের। ডাঃ বেথুন একজন ক্যানাডিয়ান। তিনিও একজন মহৎপ্রাণ স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি। তিনিও স্পেনের যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তারপর চীনের যুদ্ধে যুদ্ধার্তদের সেবা করতে আসেন এবং কোর্টনিসের আসার পূর্বে ইনিও ক্ষত চিকিৎসার সময়ে আঙ্গুলে সেপটিক হয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। ইনি শুনলাম যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। সে হচ্ছে 'ব্লাড ট্রান্সফিউসন'। তার আগে চীন দেশে এরকম প্রক্রিয়া জানা ছিল না। চীনেরা তাদের এই দুই সুহৃদকে ভোলেনি। একটি পার্কের মধ্যে ডাঃ বেথুনের বিরাট মর্মরমূর্তি স্থাপিত আছে। আর তাঁর 'স্মৃতি ভবন' আগেই উদ্ঘাটিত হয়েছে। এবার ১ ডিসেম্বর ডাক্তার কোর্টনিসের মৃত্যুদিনে তাঁর স্মৃতিভবন উদ্ঘাটন হবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এদেশে আসা।

ন'টায় স্মৃতিভবনের দ্বার উদ্ঘাটন উৎসব। আমরা গাড়ি করে সভা-গৃহের কাছে পৌঁছলাম। চারিদিকে নিষ্পত্র বৃক্ষ। এদিকে ওদিকে বরফ ছড়ানো শীতের কনকনে বাতাস। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। লাল সবুজ কাগজের পতাকার মালায় ধ্বসর বৃক্ষরাজি রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে পথ জুড়ে লাল রেশমের উপর চীনা ভাষায় ও হিন্দীতে লেখা ঝুলছে চীন-ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ এবং স্বাগতম ডাঃ কোর্টনিস মেমোরিয়াল কমিটির অতিথিবৃন্দ। পাতাঝরা পপলার-উইলো-বার্চের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলেছি। গাছগুলি শুধু ভঙ্গি দিয়ে তাদের পরিচয় দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল ফুটেছে। এতক্ষণ যাদের দেখছিলাম, তাদের অলিভ রঙের পোশাক আর ধূসর-নীলের একঘেয়ে চেহারা। এইবার দু দিকে রঙ্গীন গাল, রঙ্গীন জ্বলজ্বলে পোশাক, হাতে রঙ্গীন ফুলের তোড়া (কাগজের ফুল), আর ঘণ্টা লাগানো লাল ফিতে বাঁধা ডুগডুগির মত একটা বাজনা বাজিয়ে তালে তালে সুরেলা গলায় শিশুমুখের অভ্যর্থনা, চোখ আর মন জুড়িয়ে দিল। এরা সব কিনডারগার্টেন আর প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়ে। এরা গানের সুরে বলছিল, 'স্বাগতম ভারতীয় অতিথিবৃন্দ, স্বাগতম।' চীনে শিশুরা বড় সুন্দর। ফোলা ফোলা রঙ্গীন গাল, হাসিমুখ। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছে। তারপরে তারা বড় সপ্রতিভ।

সভা-গৃহে ঢোকার মুখে বারান্দায় মস্ত বড় ক্রিসিনথিমামের ঝাড়। শীতের দাপটে একটু মুষড়ে পড়া, তবু ফুল দেখতে ভালো লাগল। এ সময়ে কোথাও তাজা ফুল নেই।

যাঁরা এই উৎসবের আয়োজন করেছেন সেই স্মৃতিভবন কমিটির কর্মীরা ছাড়াও সরকারী অভ্যর্থনাও আমরা পেলাম। লুই-সে-হুয়া হচ্ছেন হোপেই প্রদেশের রেভলিউশনারি কমিটির চেয়ারম্যান, অর্থাৎ এই প্রদেশের উচ্চতম ব্যক্তি। তিনি এবং মিলিটারী প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। সভা-গৃহের ভিতরে কয়েক হাজার লোক যে যার স্থানে বসে আছে। তাদের মধ্যে ডাক্তার, নার্স ও মিলিশিয়ার প্রাধান্য দেখা গেল। আমরা ঢুকতে সমগ্র জনতা উঠে দাঁড়িয়ে করতালিধ্বনি করে আমাদের অভ্যর্থনা করল। আমরা ডায়াসে বসলাম। সামনেই দেখতে পেলাম দেওয়ালে প্রকাণ্ড করে লেখা জ্বলজ্বল করছে হিন্দী ভাষায়ঃ "দুনিয়াকো জনতাকো মহান একতা জিন্দাবাদ।" ওয়াংপিন নান, লুই সে হুয়া, মহিলা ভাইস চেয়ার্ম্যান (তাঁর নাম মনে নেই), মিলিটারী জেনারেল—সকলেই ভাষণ দিলেন। উত্তর দিলেন আমাদের পক্ষ থেকে ডাঃ বসু ও নারায়ণন। সকলেরই লিখিত ভাষণ। তবে যত দূর মনে পড়ছে নারায়ণন লিখিত ভাষণ দেননি। বক্তৃতার মধ্যে দুটি কথা পরিষ্কার হল। এক—ডাঃ কোটনিস চীনের মানুষের কাছে কত আপন। তিনি আন্তর্জাতিকতার প্রতীক। আর একটি—এঁরা ভারতের বন্ধুত্বকামী। তাঁর উদ্যাটন উৎসবকে কেন্দ্র করে তাঁরা ভারতবর্ষকেই সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। একজন বক্তৃতার মধ্যে মাও-সে-তুং-কে উদ্ধৃত করে বললেন, "চেয়ারম্যান বলেছিলেন—আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্ব গঙ্গা ও হোয়াং হো-র মত চিরপ্রবহমান, পর্বতের মত চিরসবুজ। এই দুই দেশের মধ্যে মেঘ জমলেও তা কখনো স্থায়ী হতে পারে না।"

ওদের চেয়ারম্যান সর্বদাই কবিতার ভাষায় কথা বলেন—আমার বড় ভালো লাগে। মাও-সে-তুং-কে উদ্ধৃত করে আরো কেউ কেউ বললেন, "ডাঃ কোটনিস উষ্ণ দেশ থেকে তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বরফ-জমা শীতের সঙ্গে সুখ করতে।" বক্তারা আরো বললেন, তাঁর মৃত্যুর পরে মাও-সে-তুং বলেছিলেন, "আমাদের ভারতীয় বন্ধু দূর দেশ থেকে চীন দেশে এসেছিলেন জাপানীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবার জন্য! এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ইয়েনান প্রদেশ ও পূর্ব চীনে তিনি আহত ও রুগ্নের সেবা করেছেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটায় আমাদের সৈন্যরা একজন যোগ্য সহকারী হারাল আর দেশ হারাল একজন প্রকৃত বন্ধু। আমরা তাঁর আন্তর্জাতিকতার কথা কখনো ভুলব না।" চীনেরা বেশ কবিত্ব করে কথা বলে। কেউ বা বললে, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে একটি সঙ্গীত বাজিয়ে গিয়েছেন।

যাঁরা যাঁরা বললেন তাঁদের বক্তৃতার কপিগুলি না থাকায় সমস্ত কথা আমি শোনাতে পারলাম না। তবে এটা ঠিক যে, এই উৎসবটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত-চীনের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল সেটা দূর করে দেবার এটা আন্তরিক প্রয়াস। আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীনারায়ণনের বক্তৃতা ভালো হয়েছিল। যে বন্ধুত্বের হস্ত এঁরা প্রসারণ করেছেন, আমাদের পক্ষ থেকে সেটি ধারণ করবার উপযুক্ত মানুষ ইনি। সব সময় তো সরকারী প্রতিভূরা তেমন হন না।

সভা-শেষে আমরা 'স্মৃতিভবন' দেখতে গেলাম। সত্যিই দেখবার মত মিউজিয়াম হয়েছে। ঢুকতেই প্লাসটার অফ প্যারিসে গড়া ডাঃ কোটনিসের ঘোড়সওয়ার মূর্তি। তার পর তাঁর জীবনের ঘটনা ছবিতে সাজানো। প্রথমেই একটি লেখা রয়েছেঃ "ডাঃ কোটনিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর প্রাণ ও জীবন দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের একটি সংগীত রচনা করেছেন... তাঁর নাম ভারত-চীন মৈত্রীর একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর।" এখানে আমরা জানতে পারলাম, তিনি যখন চীনের যুদ্ধে আর্তের চিকিৎসার জন্য যান তখন মানবতার কারণেই গিয়েছেন ; তখন তিনি রাজনীতি বিষয়ে সজাগ ছিলেন না। কমিউনিস্ট তো ননই। ওখানে যাবার পর অত কঠিন পরিশ্রমের মধ্যেও তিনি মার্কস, লেনিন ও মাও-সে-তুং-এর রচনার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তারপর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। চীনা ভাষাও শেখেন। তাঁর হাতের লেখা একটি চীনা পত্রও বাঁধানো রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর চিত্র। ফটোগ্রাফের সংখ্যা যথেষ্ট হলেও তাতে একটি মিউজিয়াম হয় না। তাই তাঁর চীনে বাসকালীন জীবনের ঘটনার নানা কাহিনীর বড় বড় ছবি আঁকানো হয়েছে। দূর দূর গ্রামে লোক পাঠিয়ে তাঁর পরিচিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলে সেই সব ছবির মালমসলা তৈরি হয়েছে। একটি মেয়ে সাদা একটি ছড়ি দিয়ে প্রত্যেকটি ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের বিশ্লেষণ করে বলতে লাগল। যদিও এক-একটা গ্রুপ ছবির সামনে চেয়ার গোছানো ছিল, আমরা বসে বসেই শুনছিলাম, তবু মাঝে মাঝে যে হাঁটতে হচ্ছিল তাতেই আমার তো পা ব্যথা। এই বিরাট আয়োজন দেখে আমি বিস্মিত। দেখতে দেখতে ক্রমেই এ-কথা বুঝতে পারলাম যে, এ আয়োজন দু-চার দিনের ব্যাপার নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এর জন্য অনেক মানুষ মিলে পরিশ্রম করেছেন ; বহু টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম, যখন ভারত-চীন সম্পর্ক খুবই বিষাক্ত তখনও কিন্তু এঁরা কোটনিসের স্মৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশের এ আয়োজন করে চলেছে। দেশের মানুষের রাজনৈতিক শিক্ষার এটি একটি প্রমাণ, যুক্তি-নির্ভরতারও প্রমাণ। আমার মনে পড়ে গেল চীন-ভারত যুদ্ধের সময়কার পাগলামির কথা। চীনেরা আরশুলা খায় বলে ছড়া লেখা হল! সবচেয়ে মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার একদিন, যা কখনো ভুলব না। 'সুদাক্ষিণা' নামে একটি মহিলা কো-অপারেটিভ দোকান ১৯৬১ সালে আমি সংগঠিত করি। একদিন দোকানে ঢুকে দেখি একটি ভদ্রলোক অর্থাৎ ভালো কাপড়চোপড় পরা যুবক ও গুটি দুই মহিলা খুব তড়পাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, "এখনও আপনারা দোকানে 'চীনা সস্' রেখেছেন! সব ফেলে দিন।" আর কর্মী মেয়েটি বিপন্নভাবে বলছে, পয়সা দিয়ে কেনা হয়েছে, ফেলে দিলে লোকসান হবে। তাঁরা ঘৃণাপূর্ণভাবে বলছেন, টাকাটাই সব, দেশপ্রেম বলে কিছু নেই? আমি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, জড় বস্তু কখনো জীবকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে পারে না। সয়াবীন সস্ চৌ-এন-লাই বা মাও-সে-তুং-কে যুদ্ধে প্রেরণা দেয়নি। ঐ বোতলগুলি কমিউনিস্টও নয়।

ডাঃ কোটনিস স্মৃতিভবন থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন এ-কথা আমার কাছে স্পষ্ট হল যে, যখন ভারত-চীন সম্পর্ক বিষাক্ত ছিল তখনও তারা কোটনিসের স্মৃতিকে একটি উজ্জ্বল তারার মত সামনে রেখে মানুষে মানুষে মৈত্রীর সম্পর্ককে ম্লান হতে দেয়নি। এতে সেদেশের নেতৃত্বের উপর আমার শ্রদ্ধা হল। ডাঃ কোটনিস মানুষের উপযুক্ত কাজ করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নানা ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগের মধ্যে সে-কথা স্মরণ রাখতে পারা উচ্চতর মনুষ্যত্বের পরিচয় দিচ্ছে।

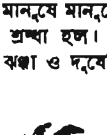

সেদিন বিকেলবেলা আমাদের ডাঃ কোটনিসের সমাধি দেখতে যাবার কথা। তিনি কোনো দূর গ্রামে মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কবর রয়েছে সিজিয়াচুয়াং শহরে একটি পার্কের মধ্যে। সিজিয়াচুয়াং শহরে মিলিটারী হাসাপাতালের ক্যাম্পাসের মধ্যেই ডাঃ বেথুন ও ডাঃ কোটনিসের স্মৃতিভবন। কারণ, ঐ হাসপাতাল ডাঃ বেথুনের প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর পরে ডাঃ কোটনিস ওর ডিরেক্টর হন। ডাঃ বেথুনের পর যে ডাঃ কোটনিস ডিরেক্টর হন তাতে মনে হয় সে সময় চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতীয় ডাক্তাররা চীনাদের চেয়ে অগ্রসর ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত ন্যূন তো নয়ই। আর আজ চীন ঐ বিদ্যায় কত অগ্রসর। আমাদের দেশেও বিশ্বের সেরা ডক্তারদের তুল্য ডাক্তার আছেন, কিন্তু চিকিৎসার সুযোগ তো এমন সর্বব্যাপী নয়। বিনামূল্যে যে প্রতিটি মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে, গ্রামে গ্রামে কোনো মানুষের বিনা চিকিৎসায় মরার উপায় নেই, এটাই আমি ডাক্তারি বিদ্যার সার্থকতা বলে মনে করি।

বিকেলবেলা আমাদের দলে অনেক লোক ছিলেন। ডাঃ কোটনিসের সহকর্মীরা এসেছিলেন। তাঁর পুত্রের ধাত্রী, তিনি যাদের চিকিৎসা করেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ। এঁরা সব দূর গ্রাম থেকে এসে আমাদের সঙ্গেই গেস্ট হাউসে আছেন। কিন্তু চীনারা সবাই আলাদা দিকে আছেন, আমরা আর ইয়োরোপীয়রা এক দিকে। কেবল ব্যাঙ্কোয়েটে সকলে একসঙ্গে খাওয়া হয়েছে। আর একটা ব্যাপার এখানে শুনেছিলাম যে, চীনে কেউ কারু মাল ব'ন না, সিঁড়ির ঘরে রেখে দেয়। যে যার বাক্স-সুটকেস যথাস্থানে নিয়ে যায়। আমি তো খুবই ভীত। দীনেশ আমাকে ভরসা দিয়েছিল সে থাকতে কোনো চিন্তা নেই। আমি একটা বইতে পড়েছিলুম যে, চীনারা যখন কারু মাল বয়ে দেয় তখন সেটা চূড়ান্ত বন্ধুত্বের নিদর্শন। ক্রমে এ নিদর্শন পেয়েছিলাম। কিন্তু গেস্ট হাউসে দীনেশই আমার সাহায্য করেছিলেন। এখানেও বৎসলা ও আমি এক ঘরেই থাকি। যদিও আমি ভেবেছিলাম, সে হয়তো কো চিন লানের (কোটনিসের পত্নী) সঙ্গে থাকবে। তবে তিনি প্রায়ই এসে আমাদের ঘরে বসে থাকতেন। এখানে আমাদের ঘরে ফল বাদাম এসব তো রেখে যেতই, আর একটা নূতন জিনিস খাওয়া গেল—আখরোটের মুড়কি।

সিজিয়াচুয়াং-এর গেস্ট হাউসেই আমরা প্রথম দরজায় খিল দেওয়া বন্ধ করলাম। 'আনন্দবাজার'-এর কাছে বাগ্‌দত্ত থাকায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঢুলতে ঢুলতে বউমার কাছে চিঠি লিখতাম। জানতাম, চিঠি পৌঁছতে দশ দিন লাগবে। মাঝে মাঝে মনে হত পৌঁছবেই কি না। আমরাও কবে যে চিঠি পাব রোজই ভাবতাম। পাঠযোগ্য খবরের কাগজের অভাব ও ভাষার প্রতিবন্ধক মাঝে মাঝে একাকিত্ব বাড়িয়ে দিত ; তাই চিঠি লিখতে লিখতে দেশের সঙ্গ অনুভব করতাম। রাত জাগার ফলে ভোরে ওঠার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে থাকে না ; ওদিকে বৎসলাও খুব ঘুম-কাতুরে—যদিও তিনি আমায় বলে দিয়েছেন "বই লেখার সময় লিখবে যে, আমিই প্রতি দিন প্রত্যূষে তোমার টেবিলের কাছে কফি এগিয়ে দিয়েছি।" অতএব বন্ধুত্বের খাতিরে তাই স্বীকার করে নিচ্ছি। যা হোক, এখানে স্থির করা গেল সবাই যখন বলছে দরজায় চাবি অথবা ছিটকিনি বা ডোর-লক্ দিয়ে ভিতর থেকে বন্ধ করবার দরকার নেই, তখন খোলা রাখলেই সুবিধা। দরজায় ঠকঠক করলে বলব 'কাম ইন', অমনি ধূমায়িত কফির পেয়ালার ঘরের মধ্যে আবির্ভাব। তবে ধূমায়িত বড় একটা থাকত না। দুধ চিনি দিয়ে চা বা কফি খেতে এরা জানে না। কাপে ঢেলে কফি আনত, আনতে আনতে ঠাণ্ডা—আর গ্লাসে করে দু গ্লাস দুধ ও চিনি। ভোরে কফি দেবার নিয়ম নেই। কিন্তু গুপ্ত রোজ রাত্রে শোবার আগে খুব জোরের সঙ্গে বলতেন—ভোরবেলা আমাদের জন্য কফি, নুনাই (দুধ) এবং সুগার আনবে। যদিও সে কফিতে আমাদের বেড্-টির সাধ মিটত না।—

নয় তারিখ বিকেলবেলা আমরা ডাঃ কোটনিস, ডাঃ অটল ও ডাঃ বেথুনের সমাধি দেখতে গেলাম। পার্কের ভিতরে একটি লাউঞ্জ আছে, সেখানে ওরা মালাগুলি সাজিয়ে আনল। সমস্ত চীনে এ সময়ে একেবারে ফুল নেই বললেই হয়। যা আছে তা শুধু ক্রিসেনথেমাম। তাও ঘরের মধ্যে বা ঢাকা জায়গায় টবে আছে—নিষ্প্রভ তার লাবণ্য। তাই কাগজের ফুলের মালা তৈরি করেছে। খুব বড় বড় ফুল। মালাটা ব্ল্যাকবোর্ড দাঁড় করাবার মত স্ট্যাণ্ডে আটকানো! নানা প্রতিষ্ঠান থেকে মালা দেবে। ওয়াং নান্ পিন রেভলিউশনারি কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মিলিটারী হাসপাতলের কর্মিবৃন্দ, লিবরেশন আর্মির প্রধান এঁরা সবাই মালা দেবেন। আর এদিকে আমাদের দূতাবাসের পক্ষে শ্রীনারায়ণন্, ভারতীয় ডেলিগেশনের থেকে ডাঃ বসু, মণ্ডেশ কোটনিস ও বৎসলা এবং আমরা।

দূতাবাসের মালাটির মূল্য কে দিয়েছিল জানি না। কিন্তু আমাদের মালাগুলির দাম ওরাই দিল। এ কিরকম হল বুঝলাম না। আমাদের কাছে টাকা ছিল—ওরা তো দিয়েছেই ৫০০ টাকার মত, তাছাড়া ৫৮ আমেরিকান ডলারও রয়েছে। খরচ কিছুই নেই—আমরা কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেরা মালার দাম দেব না? দলপতি ডাঃ বসুকে একবার সাবধানে জিজ্ঞাসা করলাম—"মালার ব্যবস্থা কে করবে?" তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "ও সব ভাবতে হবে না।" অতএব আমি না ভাববার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল।

মালা নিয়ে সবাই সমাধির দিকে এগিয়ে চললাম। পার্কটা খুব সাজানো। কিন্তু এখন তো সব শুকনো। তবে নিষ্পত্র বৃক্ষের শোভা আছে। বিকেলবেলার রোদ এসে পড়েছে—কিছু কিছু 'এভারগ্রিন্'-এর ঝাড় তাতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একটি বনের প্রান্তে ঐ যুগ্ম সমাধিক্ষেত্র—ডাঃ কোটনিস ও ডাঃ অটল পাশাপাশি আছেন। এই বনটি সবুজ সাইপ্রাস গাছের বন। বুঝলাম শীতে সাইপ্রাসের পাতা ঝরে না। সাইপ্রাস শুনলে আমার কেমন সমুদ্রের কথা মনে পড়ে। কে জানে কেন। এ-দেশ তো সমুদ্র থেকে বহু দূর; হয়তো মৃত্যুর প্রাঙ্গণে এসে সমুদ্রের কথা মনে আসছে।

একে একে সবাই মালা দিলেন। ছবি তোলা হল। কো চিন লান্ ও বৎসলার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কো চিন লান আবার বিবাহ করেছিলেন। এ-পক্ষের তাঁর সন্তানাদিও আছে। তাঁর নূতন জীবন কতই অন্যরকম। তা সত্ত্বেও তাঁর এই অশ্রুপাতের সৌন্দর্য যেন ঐ পশ্চিম আকাশের হেলে পড়া সূর্যের অস্তরাগের মত এই মৃত্যু-উৎসবকে আমার চোখে রঙ্গীন করে দিল।

সবাই এদিক ওদিক ঘুরছিল। অত ঘোরাঘুরি আমার পোষায় না, আমি সমাধি প্রাঙ্গণের পাথরের দেওয়ালের উপর বসে সাইপ্রাস বনের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। কি সুন্দর পার্ক, কি সুন্দর সাইপ্রাস পাতার ঢেউ। এই নিষ্পত্র বনের রাজ্যও অন্তরের কোন সম্পদে সবুজ হয়ে আছে—কেউ আমায় বলতে পারে কি? বনের তলায় তলায় ছায়াময় ভূমি বহু দূর চলে গেছে। শেষবেলাকার রোদ পড়ে সেখানটা ঈষৎ রঙ্গীন। একটি বর্ষীয়সী মহিলার অশ্রুজল সেখানে যেন ডানা-তোলা ময়ূর হয়ে গেল আমার মনের সামনে। প্রেমের পাখায় অনেক রং, বিচিত্র তার কারুকাজ।

লী এসে আমাকে বললে, "তুমি যাবে না? ওরাই যে এগিয়ে গেল।" আমি চমকে উঠলাম। সবার সঙ্গে একসঙ্গে বেরুলেই তারা আমায় ফেলে এগিয়ে যায়, আর আমি যদি পিছিয়ে থাকি তা হলে কতক্ষণে ওদের কাছে পৌঁছব!

হাঁটতে হাঁটতে লী বললে, "তুমি একলা বসে কি ভাবছিলে?"

"ভাবছিলুম কেন এ-দেশে এত উৎসাহ করে এসেছি। ফিরে গিয়ে যে আমি আমাদের দেশকে তোমাদের দেশের মত করে তুলব তা আমার সাধ্য নেই।"

"করবেই বা কেন! তোমার দেশ তোমারই।"

"তা ঠিকই। তবে দেশে গেলে আমায় অনেকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবে। আমার একটা দায়িত্ব আছে—কিন্তু আমি বোধ হয় কিছুই বলতে পারব না।"

"কেন?"

"কারণ, আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারছি না। আবার হয়তো অনেক কিছু ভাবছি যা ঠিক নয়। যেমন একটু আগে যখন তোমরা সকলে আন্তর্জাতিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, বিপ্লব, আরো কত কি ভাবছিলে—আমি একেবারে অন্য কথা ভাবছিলাম।"

"তা তো হতেই পারে, সকলের চিন্তাধারা তো একই খাতে বয় না।"

"জানি এটা তুমি মানবে—লেট্ হান্ড্রেড ফ্লাওয়ারস ব্লুম—শত পুষ্প বিকশিত হোক। আচ্ছা লী, তুমি কি ইনটেলেক্চুয়াল?"

"একটু। তবে তোমার ধারেকাছেও নয়।"

"তোমার বয়স তো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ—আমার মেয়ের চেয়েও তুমি ছোট। যখন তোমার আমার মত বয়স হবে, আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি আমার চেয়ে অনেক বড় ইন্টেলেক্চুয়াল হবে।" আর তখনই আমার মনে পড়ে গেল—"ওহ্ না না, তোমাদের তো আবার ইন্টেলেক্চুয়াল হওয়া বড় নিন্দার।—তুমি খুব ভালো হাতুড়ি পিটবে।"

এমন সময় দেখি মং আসছে। মং মোটাসোটা হলে কি হবে, অত্যন্ত দ্রুতগামী ও কর্মতৎপর। সে বললে, "এত পিছিয়ে পড়েছ কেন? এখানে থাকবে নাকি?"

আমি বললুম, "বেশ তো, একটা কবর খোঁড়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে কি হবে, সে তো একবর্ণও বুঝল না। বেশ মজা, ওকে যা খুশি বলা যায়, কিছু বুঝবে না। "এই লী, অনুবাদ কর।"

লী ভ্রূকুটি করল—"করব না।"

মং এদিকে আমার কনুই-এর কাছটা ধরে আমাকে প্রায় গুঁতিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। ততক্ষণে সবাই বেথুনের সমাধি ও পূর্ণাবয়ব মূর্তিটি পরিদর্শন শেষ করে শহীদ ভবনের দিকে চলেছেন।

সেদিন রাতে আমাদের জন্য খুব বড় ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ মিলিটারী হাসপাতালের কর্তৃপক্ষই আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা। কত লোক যে এসেছিল, ঠিক বলতে পারছি না। দেড় শতজন অন্তত নিশ্চয়ই। নিমন্ত্রণের জন্য বৎসলা ভালো শাড়ি এনেছিলেন। খুব ঝকঝকে একটা কাপড় বের করলেন। আমি রোলাক্স বস্তুটি দু চক্ষে দেখতে পারি না। বৎসলা কিছু গয়নাও এনেছিলেন। আমি বললাম,—বৎসলা এসব পরো না। ওরা কেউ কিছু পরে না।—বৎসলা বললেন,—ওদের খুশি। আমরা যা আমরা তাই।—বৎসলার যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে। আমার ব্যক্তিত্ব কম। আমি একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম, তাই মাঝামাঝি একটা সিল্ক পরা গেল। এখানে এদের মেয়েরা সাজে না বলে ইয়োরোপে বড় নিন্দা কিন্তু এটা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়। আমরাও এক সময় এটা করেছি। গান্ধীজীর আশ্রমে কি কেউ বেনারসী পরে গিয়ে স্বস্তি পেত ? শান্তিনিকেতনেও পরা যেত না! সারা দেশ জুড়ে ওঁদের শিক্ষাটা রাখতে পারলে ভালোই হত। শেষ পর্যন্ত বৎসলাকেও মত বদলাতে হয়েছিল। শেষের দিকে ব্যাঙ্কোয়েটে আমরা সারা দিনের ধুলিধূসর পোশাকে উপস্থিত হয়েছি। তখন বৎসলা বলতেন—দূর, কেউ কাপড় বদলায় না—শুধু শুধু আমরা কেন পরিশ্রম করতে যাই!

মিলিটারী হাসপাতালের বিরাট হলঘর লোকে গম গম করছে। ভোজ্য অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশ পদ। এখানেই প্রথম একটি বিশেষ রকমের মাছের রান্না খেলাম। প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা ধরে খাওয়া হল। আমাদের টেবিলে যে ইনটারপ্রেটার মহিলাটি ছিলেন তাঁকে দুই-একটা রান্না সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম, ইনি রান্নার বিন্দুবিসর্গ জানেন না। খাওয়ার মধ্যে মধ্যে মদ্য নিয়ে ইয়োরোপীয় কায়দায় টোস্ট চলতে লাগল। বার বার কোটনিসের আন্তর্জাতিকতার কথা, ভারত-চীন মৈত্রীর কথা, উপস্থিত বন্ধুদের স্বাস্থ্য কামনা ইত্যাদি কারণে গাম্বে বা গামপেই অর্থাৎ 'বটমস্ আপ' বলে ছোট্ট গ্লাসের মদ্য অন্যের গ্লাসে ঠেকিয়ে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করা চলল। অনেক দিন পর ভালো গলদা চিংড়ি খেয়ে খুবই আনন্দ পাওয়া গেল। বুঝতে পারলাম ফরেন একসচেঞ্জের জন্য ওরা চিংড়ি মাছ বিদেশে পাঠাচ্ছে না। আমি ওই দোভাষী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই টোস্ট করার প্রথাটি ইয়োরোপীয়, না চীনের নিজস্ব? সে বলল, এ চীনেরই প্রথা। 'গাম্বে' উচ্চারণটা অমনি শুনেছি তবে কথাটা নাকি 'গাম পেই'? আমি বুঝতে পারছি এই শব্দ চীনে, কিন্তু টোস্টটাও কি? ইয়োরোপের একটা প্রথার সঙ্গে এত মিল হতে পারে না। চীনের বুকের উপর ইয়োরোপের তাণ্ডব নৃত্য অনেক দিন চলেছে ; কাজেই দু-একটা সামাজিক প্রথা রয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই মহিলা এবং আর একটি অল্পবয়সী পুরুষ বললেন, এ তাঁদের দেশের অনেক দিনের নিয়ম। আমার অবশ্য এখনও তা বিশ্বাস হচ্ছে না। চীনেরা মদ্যপান করে ; অর্থাৎ আমাদের দেশের মত মদ্যপান নিষিদ্ধ নয়। আমাদেরও মদ্যপানে শাস্ত্রীয় নিষেধ নেই। মদ খেলে কারু জাত যায় না, যেমন গোমাংস খেলে জাত নির্ঘাত পালায়। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত ভদ্রসমাজে এটা নিন্দনীয়। এবং এই নিন্দার নিষেধ একটা সঙ্গত কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেউই জানে না একবার খেলে বা বাধা ভেঙে গেলে কে কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে। যেসব বস্তু খেলে নেশা

AMARBOI.COM

হয়, যাতে মানুষকে দাস করে ফেলে, যার জন্য মানুষ ভিটেমাটি বিক্রি করে ফেলতে পারে, যাতে বুদ্ধিভ্রংশ হয়—সবচেয়ে বড় কথা, যাতে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে যায়, অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি জন্মায়—তেমন জিনিস খেয়ে লাভ কি! মদ তাস পাশা, সর্ব কর্ম নাশা। সেইজন্যেই এই নিষেধ। কিন্তু আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, অনেকে মদ না খাওয়াটাকে একটা কুসংস্কার বলে মনে করেন। গোমাংস না খাওয়াটা একটা কুসংস্কার। কারণ, গোমাংস খেলে কারু শরীর খারাপ হয় না তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ওটার কারণ মনুর নিষেধ। কিন্তু মদের ক্ষতিকারক শক্তির কথা জানা আছে। মনুর আদেশ থাকলেও ওর অপকারিতা দূর হত না। আমার মনে আছে, ১৯৬৬ কি '৬৭ সালে যখন জনসঙ্ঘের গোহত্যা নিবারণ জন্য আইন প্রণয়ন করাতে গরুর প্রসেসন পার্লামেন্টে নিয়ে যাচ্ছিল এবং দুধারে টেরিলিন শার্ট ও নাইলন পরিহিতা আধুনিক জনতা তাদের খুরে দণ্ডবৎ জানাচ্ছিল, তার অল্প পরে দিল্লিতে আমরা অবস্কিউরেনটিজম্ বা পশ্চাদ্মুখিনতা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সম্মেলন ডাকি। তখন একজন বিলিতি কায়দায় দুরন্ত উচ্চপদস্থ অফিসার আমায় বলেছিলেন, "খুব ভালো কাজ করেছেন আপনি। এ-দেশের মানুষ এত কুসংস্কারী, দে ডু নট নো হাউ টু হোল্ড এ ড্রিংক (তারা ঠিকভাবে মদ খেতে জানে না)।" আমি ভাবলাম, বিপদ মন্দ নয়। ইনি ভেবেছেন, আমি মদ্যপান প্রচারিণী সভা ডেকেছি।

কোন্‌টা কুসংস্কার, কোন্‌টা কুসংস্কার নয়, সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ নয়। যা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, গতানুগতিক বা শাস্ত্রাজ্ঞা বলেই যা পালনীয়, সেটাকেই কুসংস্কারের পর্যায়ে ফেলা যায়। যার পিছনে যুক্তি আছে, তা যত পুরোনো জিনিসই হোক, বর্জনীয় নয়। কুসংস্কারও নয়।

মদ-মাংসের কথাটা যখন উঠলো তখন এইখানে এ শেষ করে নিই। চীনেরা মদ্যপান করে—কিন্তু এই এক মাসে অনেকগুলো ব্যাঙ্কোয়েটে প্রচুর খাদ্য ও মদ্য পাওয়া গেলেও একজনকেও মাত্রা ছাড়াতে দেখিনি। একটুও রং-এ যেতে দেখিনি। মেয়েরা প্রায় খায়ই না। খেলেও সামান্য রেড ওয়াইন। আমিও রেড ওয়াইন চেখে দেখেছি, বেশ মিষ্টি। আমাদের দলে যাঁরা ছিলেন, যথেষ্ট পান করলেও কেউ রং-এ যাননি। কেবল মহাকবি কাণ্ড শুরু করলেন। অতিরিক্ত ধূম ও মদ্যপানে তাঁর অবস্থা এমন হয়েছে যে, খাদ্যের কিছু দরকারই নেই। অর্থাৎ খেতেই পারেন না। তাঁর হাত-পা এমন কাঁপে যে, তিনি চামচ কাঁটা ধরতে পারেন না, হাত দিয়ে খেতে হয়। অথচ ভোজের সময় আমার টেবিলে তিনি বসবেন এইরকম একটা নিয়ম দাঁড়াল। আর আমার 'টেবিল ম্যানারস' সম্বন্ধে বাল্যকালের শিক্ষা এমন মজ্জাগত যে, টেবিলের উপর এঁটো কাঁটা ছড়িয়ে, লাল ফেলে, গ্লাস উল্টিয়ে খাওয়া আমার সর্বশরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিত।—"মহাকবি, আপনি কাঁটা দিয়ে খান না—কেন হাত দিয়ে চটকাচ্ছেন!"

"খাচ্ছি খাচ্ছি" বলে কাঁটা তুলতে তাঁর কম্পমান হাত থেকে কাঁটা এবং খাদ্য সবই মাটিতে পড়ে গেল। ভদ্রলোক কিন্তু খুব ভালো, অর্থাৎ তাঁর মনটা সরল। রাগ একেবারেই নেই। যা বল, যত বল, তিনি নির্বিকার। বোতলটি হলেই হল। শেষ পর্যন্ত দীনেশ তাঁর ভার নিল। তাঁর সিগারেট গুনে দিয়ে, মদের মাত্রা নির্দেশ করে দেবার চেষ্টা করত। আর গুম্ফ বলতেন,—তা হোক, উনি রেভলিউশনারি কবি—মদ্যপান না করলে চলবে কেন? খুব জোরের সঙ্গে প্রতিদিনই বলতেন। তাতে মনে হত সেটা তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস। এ-কথাটা এখানে বলছি এইজন্যই যে, অনেকেরই ধারণা যে নেশা না করলে কবি হওয়া যায় না। যে বস্তু পান করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যায়, তা যে মগজকেও শিথিল করবে—এতে সন্দেহ কি! মদ্যপায়ী হয়তো কবিতা লিখতে পারে, কিন্তু সুস্থ ও সংযমী মানুষ আরো ভালো পারবে। এ সম্বন্ধে আমেরিকার অবস্থা দেখা যাক। সন্ধ্যাবেলা দু গজ রাস্তা পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না। সন্ধ্যে ছটার পর রাস্তায় কেউ হাঁটে না—কখন অতর্কিত আততায়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ভয়ে—তারাই এগুলো করে, নেশার জন্য অর্থ যাদের চাই-ই চাই। এবং এরা অধিকাংশই অল্পবয়সী, স্কুল-কলেজে পড়ে, ছাত্র। সেজন্য বলাই আছে, পকেটে পাঁচ ডলার রেখো। চাইলেই দিয়ে দিও। একটি প্রফেসারের সঙ্গে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিল, তিনি বললেন, অমুক বৃদ্ধ হয়েছে, তবু গো ছাড়বে না। তাকে বার বার বলা হয়েছে পকেটে পাঁচ ডলার রেখো, তা রাখল না। গুণ্ডার হাতে পড়ে এখন কোমর ভেঙে পড়ে আছে। ওদের ঐ পাঁচ ডলার হলেই সেদিনের খোরাক চলে যায়। আমার আশ্চর্য লাগল—এত বড় অধ্যাপকের কাছে ছাত্রদের এই চূড়ান্ত বিপদের সমস্যাটা মাত্র পাঁচ ডলারের সমস্যা! অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, চীনে ড্রাগসের (নেশাকর দ্রব্যের) সমস্যা আছে কি না। ওরা বলেছে যে, একেবারে নয়। আমি বললুম, "আর আফিং? আফিং কি একেবারে গেছে?" ওরা বলেছিল, গ্রামে খুব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কেউ খেতেও পারে, তবে তার সংখ্যা একেবারেই কম। আফিং-বিরোধী আন্দোলনের কথা আমাদের মনে আছে। ছোট-বেলায় দাদামশায়ের কাছে 'ওপিয়াম ওয়ার'-এর গল্প শুনেছি। একটা নেশাখোর জাত একদিনে নেশা ছাড়ল—এরা দেশপ্রেমিক বটে!

চীনেরা গোমাংস যথেষ্ট খায়, কিন্তু একবারও আমাদের দেয়নি। এতগুলি বিরাট ভোজে কোথাও তা ছিল না। আমরা সেরকম মাংসাশী নই। সেটা রুচির প্রশ্ন—যেমন সাউথ চীনে নাকি কুকুর খায়। হেমাঙ্গবাবু একজন ডাক্তারকে বলেছিলেন, আপনি তো ডাক্তার, তা আপনি বারণ করেন না কেন? তিনি বললেন, কি যুক্তিতে বারণ করব? কুকুর খেলে তো অসুখ করে না, ছাগল বা ভেড়া খেলেও করে না। তা ছাগল যদি খাওয়া যায়, কুকুর কেন নয়? ভরশিলভও চেখে দেখেছিলেন, আপনি দেখবেন? হেমাঙ্গবাবু সভয়ে বলেছিলেন, ভরশিলভ কেন, লেনিন বললেও কুকুর খাচ্ছি না। আমিও ফ্রান্সে ব্যাং-এর ঠ্যাং খাইনি, গুগলি খাইনি, অক্টোপাস খাইনি—কত আর লিস্ট দেব। ভাবতে গেলে মনে হয়, একেবারে মাংস না খাওয়াই ভালো। জীব হত্যা নিষ্ঠুরতা নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি খাওয়াই হয় তবে এ-জীবে ও-জীবে তফাত শুধু অভ্যাসের, পাপ পুণ্যের নয়। গরু সম্বন্ধে আমাদের এবং শূকর সম্বন্ধে মুসলমানদের এই পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন ওঠে বলেই সেদিকে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। এবারই সেটি ঘটনা ঘটেছিল, এইখানে তার উল্লেখ করছি।

ফেরার পথে কাউলুনে হোটেলে একটা দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে—পিছনে একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। দেখে ভারতীয় মনে হল। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভারতীয় নাকি?" তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন,—না, পাকিস্তান,—আমি আরো হেসে হাত প্রসারিত করলাম,—আমরা তো এখন বন্ধু, নয় কি?—ভদ্রলোকের মুখে বিদ্যুৎচমকের মত প্রসন্নতা ফিরে এল। তিনি হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন,—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি তো বুঝি না আমাদের মধ্যে এত অশান্তি কেন! পৃথিবীর সব জাত এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা...।—আমি বললাম,—অশান্তি কোথায়? আমাদের তো খুব সদ্ভাব এখন, আমি তো এখন ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী সমিতি করব।—তাই নাকি? খুব ভালো।—দোকানের মালিক একটি চীনা এগিয়ে এসে আমাদের মাঝে দাঁড়াল। এরা হংকং-এর চীনা, সকলেই উৎকট ইংরেজী বলে। বলল,—ইউ নো ফ্রেন্ডস, ইউ ফাইথ।—আমি বললাম,—নো, নো!—সে খুব জোরের সঙ্গে বলতে লাগল,—ইয়েস, ইয়েস! ইউ ফাইথ হি টেক বীফ, ইউ নো টেক বীফ। ইউ ফাইথ—

আমার মনটা বিকল হয়ে গেল। এই সামান্য ব্যাপারটা দেশে-বিদেশে কি রকম রাষ্ট্র হয়েছে! অথচ তাতে যে আমাদের কোনো লজ্জা নেই তার প্রমাণ পেলুম সেদিন রাত্রেই আমাদের বি ও এ সি শুনেনে। আমার পিছনে বসেছিলেন তারাচাঁদ গুপ্ত। ইনি চীন সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছেন। এয়ার-হোস্টেস মেনু দিয়ে গেল। মেনুতে বীফ স্টেক লেখা ছিল, তিনি সেটা দেখেননি। যখন খাবার এল, তাঁর সন্দেহ হল। আমার জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি বীফ?" —"হ্যাঁ"। তখন এয়ার-হোস্টেসকে ডেকে বলছেন, "আমায় বীফ দিয়েছ কেন?" সে বলল, "তুমি তো বারণ করনি!" তখন তিনি রাগতভাবে বললেন—"আমি ভেবেছিলাম, সবাই জানে ভারতীয়রা বীফ খায় না।" সে একটু মুচকি হেসে বললে, "আমি কি করে জানব তুমি ভারতীয়!" আমি আর ফেরার মুখে মনোমালিন্য করতে চাইলাম না। তাই মনে মনে ভাবছি যে, উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা মনে করে তারাই একমাত্র ভারতীয়। পাঁচ কোটি মুসলমান বীফ খায়—তা হলে তারা ভারতীয় নয়, খৃশ্চিানরাও নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদিবাসীরাও নয়, আর আমিও নয়। কারণ, আমি বীফ খেয়েছি।

ভোজ-শেষে রাত্রি দশটা নাগাদ আমরা ঘরে ফিরে এসে স্নান সেরে নিলাম। ওখানে রাত্রেই স্নান করা সুবিধে। স্নান করে একেবারে বিছানায় ঢোকা। তা আমার বিছানায় ঢোকার সময় নেই—রূপার কাছে ডেসপ্যাচ লিখতে হবে আনন্দবাজারের জন্য। একটা কর্মব্যস্ত দিন শেষ হল—যে জন্য আমাদের এখানে আসা। বৎসলা খুব অভিভূত ছিল—তার দাদার কথা এতবার এতরকম করে সবাই বলেছে। বৎসলাকে আমি বললাম, ওরা খুব সুন্দর করে তাঁর কথা বলেছে, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে একটি সঙ্গীত বাজিয়েছেন। সঙ্গীত শত্রুকে মিত্র করে। আমার প্রায়শ্চিত্ত নাটকের রাজা বসন্ত রায়ের কথা মনে পড়ছিল। তিনি বলেছিলেন, তলোয়ার যে এরকম ভয়ানক জিনিস তা দিয়ে শত্রুনাশ করা যায় বটে, তবে শত্রুত্ব নষ্ট করা যায় না। আর সঙ্গীত যে এমন মৃদু জিনিস তা দিয়ে শত্রু নাশ না করেও শত্রুতা নাশ করা যায়। তোমার দাদার মতন মানুষই সেই সঙ্গীত, বৎসলা, তাই বোধ হয় এরা আমাদের, আমাদেরই এক সন্তানের জীবনসঙ্গীত শোনাতে ডেকেছে শত্রুতা নাশ করবে বলেই।"

লেখা শেষ করে অনেক রাত্রে যখন বিছানায় শুতে এলাম, বৎসলা ঘুমিয়ে পড়েছে। এই শীতের দেশে পরদা টানা থাকে, রাত্রের আকাশ দেখা যায় না। আলো নিবিয়ে দিতেই অন্ধকারে ডুবে রইলাম। কিন্তু ঘুম এলো না। সেই নৈঃশব্দ্যে ঘড়িটা টিকটিক করে সময়ের নির্দেশ করতে লাগল। আমার বিনিদ্র রাত্রি নানা চিন্তায় ভরে উঠল। আজকে যা দেখলাম, তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে, এরা আমাদের এই দুই দেশের মধ্যে যে বিশ্বাস জমা হয়েছে তা উড়িয়ে দিতে চায়—তাই এই সঙ্গীতের সমারোহ। কিন্তু আমি যা বিশ্বাস করেছি, দেশে গিয়ে তা বলতে পারব কি? যদি পারি তা হলে তা গ্রাহ্য হবে কি? আমি কি পাব? বিশ্বাস, না সন্দেহ? আমি জানি, সন্দেহ না করাই সন্দেহ দূর করবার উপায়—বিশ্বাসই অবিশ্বাসকে পরাজিত করে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দুজনেই তা আমাদের শেখাতে চেয়েছেন ; কিন্তু শিখেছে ক'জন? ওয়াং পিং নান তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "এই ডেলিগেশনকে স্বাগত জানিয়ে এঁদের মধ্য দিয়ে ভারতের মানুষকেই আমরা আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। ডাঃ কোটনিস তাঁর জীবন ও রক্তদান করেছিলেন চীনা এবং ভারতীয় মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের বীজ বপন করবার জন্য। আমরা আশা করছি, এই স্মৃতি ভবনের উদ্‌যাপনের দ্বারা সেই মৈত্রীর সম্প্রসারণ হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—আমাদের দুই দেশের মানুষের যুক্ত চেষ্টায় এই দুই বিরাট দেশের অন্তরে কমরেড কোটনিস রোপিত বীজ পুষ্পিত হবে আরো বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়। ডাঃ কোটনিসের মহৎ ভাবনা দীর্ঘজীবী হোক! দীর্ঘজীবী হোক চীন ও ভারতের মানুষের মৈত্রী।" ওয়াং পিং নানের এই কথাগুলি মনে পড়ে আমার আর সন্দেহ রইল না, কোটনিসের স্মৃতিকে সামনে রেখে এ ভারতের প্রতিই সম্প্রীতির প্রসন্ন দৃষ্টিপাত।

চীনে ও ভারতে—দুই দেশেই নিশ্চয় এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের জীবনসঙ্গীত শুনতে পেলে শত্রুতা নাশ হয়। কিন্তু তাঁদের আমরা সামনে আনতে পারি না—আমাদের কান নেই তাঁদের কথা শোনবার। তাই রাজনীতিক্ষেত্রে কেবলই বলদর্পিত মোরগের লড়াই চলে—স্কাইলার্ক তখন অগাধ নীল শূন্যে কোথায় হারিয়ে যায়, তার গান শোনা যায় না।

দশ তারিখ সকালে আমাদের সিজিয়াচুয়াং হাসপাতালে আকুপাংচার এনেস্থেশিয়া দেখতে যাবার কথা। আকুপাংচার চিকিৎসা সম্বন্ধে এখন আমাদের দেশে মোটামুটি জানা আছে। তবু এ সম্বন্ধে দু-একটি কথা এখানে বলা দরকার, বর্তমান চীনের রূপরেখা বুঝবার জন্যই। আকুপাংচার দেখতে শুধু ভারতীয় ডেলিগেশনই যাবেন, তাঁরা পিকিং ফিরে গেলেন। শ্রীনারায়ণন ও তাঁর দলবলের অন্য কাজ থাকায় তাঁরা থাকতে পারলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরার আগে আমার রুই আলির সংগে দেখা হল ও কিছুক্ষণের জন্য কথা হল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কালকের ভোজসভায় রিচার্ড ফ্রাই বলেছেন, গত দশ বছরের মধ্যে এরকম ভোজসভা হয়নি, এরকম আনন্দ করিনি। এ কথার অর্থ কি? আমি ভাবছি বোধ হয় খাদ্যাভাব ছিল—নয়ত এতদিন ভোজ খেল না কেন? রুই আলি তখন আমাকে বর্তমানে নিন্দিত 'গ্যাং অফ ফোরের' কথা বললেন—কালচারাল রেভোলিউশনের সময় থেকে এরা যেরকম লৌহডাণ্ডা ঘুরিয়ে সকলকে শায়েস্তা করবার কাজে নেমেছিল তাতে দেশ জুড়ে এক ভয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তখন কি আর প্রাণ খুলে কেউ হাসি-গল্প করতে পারত, না কথা কইতে পারত? যেন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছে। বৃদ্ধ মা-হাইতেকে দিয়ে ওরা রীতিমত প্লাম্বিং করিয়েছে। আমি রুই আলিকে বললাম—এখানে যেসব কথা হচ্ছে আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই তোমার কাছে আমার অনেক কথা শোনা দরকার। উনি বললেন—পারবেও না। ওকে আমরা বলি 'চিংলিশ'। আমি বুঝতে পারলাম না উনি কোন্ ভাষায় কথা বলছেন। কারণ ভাষা বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল না, দোভাষীরা সুন্দর অনুবাদ করে। তাকে 'চিংলিশ' বলা যায় না। আমি যা বুঝতে পারছিলাম না তা হচ্ছে কতকগুলি তথ্য। একবার ওরা কালচারাল রেভোলিউশনের প্রশংসা করছে—তারই দৌলতে বহু উন্নতির কথা বলছে—আবার সে সময়ে যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদের নিন্দা করছে। এইসব কথাই রুই আলির কাছ থেকে আমার শোনবার ইচ্ছা ছিল, কারণ তাঁর কবিতার ভাষায় অনেক 'পোলেটিক্যাল জারগন' বা 'বুলি' থাকলেও মুখের ভাষা স্বচ্ছ। সাধারণভাবে কথা বলার সময় তিনি বেশ বুঝিয়েও বলতে পারেন। আমি তাঁকে মিনতি করে বললাম যে, আমি অন্তত ৩।৪ ঘন্টা তাঁর সংগে কাটাতে চাই। তিনি বললেন, বেশ তো, এ আর কি। তুমি যে-কোনো সময় চলে এস। হোটেল পিকিং থেকে আমার বাড়ি এক পা।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম সে সুযোগ হবে না। আমি যা চাই তা যে বিশেষ প্রয়োজন, আমার যে সবাইকে জানাতে হবে, আমি যে লেখক সে সত্যটা আমার সংগীরা বিশেষ গ্রাহ্য করছিলেন না। তাঁদের জানাও ছিল না।

সকাল ন'টায় ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা হাসপাতালের দিকে রওনা হলাম। এই সময় থেকে আমাদের গাড়ির নম্বর দেওয়া হয়েছে। যে যার গাড়ির নম্বর দেখে উঠে পড়বে, আরোহণপর্বে বিশৃঙ্খলা হবার কোনো সম্ভাবনা রইল না। প্রত্যেক গাড়িতে দু'জন করে যাবে এবং একজন দোভাষী। এই সময় আমাদের সংগে হোপেই প্রদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছাড়াও চলেছিল পিকিং রেডিওর কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী ও যন্ত্রপাতি নিয়ে একটি ভ্যান—টেলিভিশান ইউনিট—কয়েকজন ক্যামেরাম্যান। এমনকি একটি 'ফাস্ট এইড'-এর দল। দীনেশ এইদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—দেখছেন কত লোক আমাদের সংগে চলেছে—আমাদের একটি বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে—এটা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা—মর্যাদা সম্বন্ধে খুব সচেতন আমরা। সেজন্য সব সময় মনে থাকে না মর্যাদাটা দিচ্ছে কাকে। ব্যক্তি মানুষকে না তার কাজকে, কোনো গোষ্ঠীকে না দেশকে। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, সে-সময় তারা ভারতবর্ষকে অর্থাৎ ভারতের মানুষকে সম্মান দেখাচ্ছিল—ভারতের সৌহার্দ্যকামী বলেই।

AMARBOI.COM

সিজিয়াচুয়াং মিলিটারী হাসপাতালে আমরা সকালবেলা গেলাম আকুপাংচার এনেসথেশিয়ার প্রয়োগ দেখতে। চীনের আকুপাংচার পদ্ধতি এখন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এই বহু পুরাতন পদ্ধতি এখন নূতন করে উজ্জীবিত।

মাও সে তুং-এর একটি বাণীর বহু প্রয়োগ হয়েছে—তা বর্তমান চীনের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বীজমন্ত্র—**Weed through the past to bring forth the new, let ancient serve the present.**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকুপাংচার পদ্ধতি তথা অনেক কাজের মূলেই এই নির্দেশ কাজ করেছে। যা 'উইড' আগাছা বা জঞ্জাল, তা উপড়ে ফেল। অনেক পুরানো প্রথা সংস্কার নিয়ম এককালে যা প্রয়োজন ছিল এখন তা রস-নিষ্কাশিত ছিবড়ে। অনেক ভুল যা অজ্ঞতাবশত একদিন মূল্য পেয়েছিল, অনেক প্রথা যার পিছনে যুক্তি নেই, সত্য নেই, কোনো দল বা গোষ্ঠীর সুবিধার্থে বহুর উপর আরোপিত হয়েছিল, আজ তা জঞ্জাল মাত্র—তাকে তুলে ফেলতে হবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঝাড়ফুঁক, তাবিজ, কবচ, তুকতাক, মনসাপূজা, শীতলা-পূজা প্রভৃতির নিরর্থক জঞ্জাল আজও সমাজ জুড়ে রয়েছে। এই অন্ধ যুক্তিহীন বিশ্বাস উৎপাটিত করা দরকার—উইড থ্রু দি পাস্ট—'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'—তাহলেই 'পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে'— টু ব্রিঙ্গ ফোর্থ দি নিউ। পুরাতন হলেই সব ব্যর্থ নয়—ওর মধ্যে সত্য কতটুকু আছে খুঁজে দেখ। শীতলার মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেই বসন্তরোগ পালিয়ে যাবে না। টিকা দিতে হবে। এখানে জঞ্জাল বর্জন যেমন প্রয়োজন তেমনি সর্পগন্ধার গুল্মটি যে রক্তচাপের প্রতিষেধক তাকেও আবর্জনা বলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করো না। কিন্তু জঞ্জাল পরিষ্কার যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে কমিউনিস্ট চীন দ্বিধাহীন—বহুদিনের ইতিহাসের সঙ্গে বহুদিনের মৃতপ্রথার স্তূপ জমে ওঠে—সমাজের উপর থেকে সে পাষাণভার না সরালে সত্যের আলোকপ্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। আজ পর্যন্ত এদেশে পাগলা কুকুর কামড়ালে জলপড়া খাইয়ে গ্রামের লোক নিশ্চিন্ত থাকে। বহুদিনের জলপড়ার উপর অগাধ বিশ্বাস হেতু নিশ্চিত মৃত্যুকেও ডরায় না ও ভ্যাক্সিনের জন্য ছুটোছুটিও করে না। আবার অন্যদিকে কত অব্যর্থ মহৌষধ, আয়ুর্বেদের কত চিকিৎসা-পদ্ধতির বহু প্রয়োজনীয় প্রয়োগ অনাদরে নষ্ট হয়ে গেল—ইয়োরোপীয় চিকিৎসায় দক্ষ চিকিৎসকরা একসঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কার বলে সবই ঝেঁটিয়ে ফেলবেন—এখানে মাও সে তুং-এর উপদেশ "লেট এনসিয়েন্ট সার্ভ দি প্রেজেন্ট।" পুরাতনের মধ্যে যা কিছু রক্ষণীয় তাকে রক্ষা কর, সে নূতনকে সেবা করুক। আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতির এমন ব্যাপক প্রয়োগ এই বাণীরই উজ্জ্বল ফল।

এই প্রসঙ্গে নানকিং-এ যে একটি মেডিকেল কলেজ দেখতে গিয়েছিলাম সেকথাটা বলি। সেখানে এবং বেথুন মিলিটারী হসপিতালে আমরা আকুপাংচার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে শুনি। কিন্তু যেহেতু আমি ডাক্তার নই এবং এ বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তাই খুব ভালো করে বোঝাতে পারব না। তবু যতটুকু পারি তাতে হয়ত কিছুটা ধারণা করা যাবে। নানকিং-এ আমরা দেখেছিলাম একটি প্রকাণ্ড মনুষ্যমূর্তি, এক মানুষের চেয়েও একটু বড়। তার সমস্ত শরীরে কতগুলি লাইন বা চ্যানেল রয়েছে—ঠিক যেন শিরা-উপশিরা। কিন্তু সেগুলি কল্পিত লাইন—বাস্তবে সেরকম শিরা-উপশিরা নেই। একটি সুইচ টিপে দিতে বাতি জ্বলে উঠল নানা লাইনের সঙ্গে নানা লাইনের সংযোগ করে—সেগুলি শরীরের নানা অবস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ নির্দেশ করছে। এই যোগাযোগের কোনো বাহ্য নিদর্শন নেই। আমার মনে হল আমাদেরও যে কল্পিত ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির কথা আছে এও যেন অনেকটা সেইরকম। কিন্তু এটি একটি পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, ঐ চ্যানেলগুলি অনুসারে সূক্ষ্ম ছুঁচ ঢুকিয়ে যে আকুপাংচার চিকিৎসা তা বহু রোগ আরোগ্য করে। চোদ্দটি চ্যানেলে তিনশ সাতানব্বইটি পয়েন্ট আছে যেখান দিয়ে ছুঁচ ঢোকানো হয় ও সেই ছুঁচগুলো মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রস্তরযুগ থেকে চীন দেশে প্রচলিত। যখন অস্ত্রশস্ত্র ছিল পাথরের তখন ছিল ত্রিকোণ ছুঁচালো মুখ পাথরের ছুঁচ। অবশ্য তাকে ছুঁচ না বলে ত্রিকোণ পাথর বলাই ভালো. তা দিয়ে চিকিৎসা হত। সেরকম কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড আমরা দেখেছি। এটা অবশ্য একেবারে আদিম আকুপাংচারের নিদর্শন—২০৬ বি সি পর্যন্ত এর ইতিহাস লিখিত আছে। ঐ পাথরের নাম ছিল 'বায়ান'. খুব সম্ভবত ওর ছুঁচোলো মুখ দিয়ে শরীরের বিশেষ অংশে চাপ দেওয়া হত। অবশ্য এটা আমার অনুমান কারণ পাথর তো শরীরে ঢুকানো যায় না। তারপর আস্তে আস্তে উন্নতি হতে লাগল এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে পাথরের বদলে বাঁশের ছুঁচ বা হাড়ের ছুঁচ ব্যবহার হত, তারপরে 'ব্রোঞ্জ'-এর ছুঁচ তৈরি হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাতু নির্মিত ছুঁচ তৈরি হওয়ায় আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি সম্ভব হল। চীনাদের ঐতিহাসিক চেতনা খুব গভীর। এই সব অতীতকালের চিকিৎসাকাহিনী রীতিমত লিপিবদ্ধ আছে। এবং বিভিন্ন সময়ে শরীরাবস্থানে আকুপাংচারের পয়েন্টগুলির বিচার, বিবরণ ও চিকিৎসার বিবর্তনের লিখিত সংবাদ দেওয়া আছে। আকুপাংচারের সঙ্গে 'মক্সিবাস্টন' অর্থাৎ মক্সিপোড়ান বলে আরো একরকম চিকিৎসা পদ্ধতি চলে। একরকমের পাতা পুড়িয়ে তাপ দেওয়া। ক্রমে ক্রমে শরীরবিদ্যার উন্নতি অর্থাৎ ঐ চ্যানেলগুলির আবিষ্কার বৃদ্ধি পেলে নানা রকম রোগের চিকিৎসায় আকুপাংচার ও মক্সিবাস্টনের প্রয়োগ হয়। তবে ১৬৪৪-১৯১১ পর্যন্ত চীনের শাসকরা এই দেশীয় প্রথার উপর আস্থা হারান। এত কম খরচে, এত সহজে ব্যাপার বলেই এটা ধিক্কৃত হয়। এবং বড়লোকেরা আর এসব চিকিৎসা করান না। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রামে গ্রামে এর ব্যাপক প্রচলন থাকায়, এই প্রাচীন বিদ্যা একেবারে লোপ পেতে পারেনি। ১৮৪০ সালে আফিং যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি শুধু লুঠপাট ও রাজনৈতিক ধর্ষণ চালিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না, তারা সাংস্কৃতিক আক্রমণও চালাল। ইয়োরোপের আক্রমণে চীনের প্রাচীন বিদ্যাগুলিও নানাভাবে আক্রান্ত হল। কুয়োমিন্টাং সরকারও তাদের বশংবদ ছিল এবং ১৯২৯ সালে এই পরপদলেহী সরকার চীনের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি একেবারে নিষিদ্ধ করে দিল। কিন্তু এত বিপত্তি সত্ত্বেও আকুপাংচার চিকিৎসা চীন দেশে লোপ পায়নি—বরং বহু দূর দূর দেশে এটি গৃহীত হয়েছে।

মাও সে তুং দেশের হাল ধরবার পর বলেছিলেন: চীনের ঔষধ ও ভেষজবিদ্যা এক রত্নগৃহ। এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আহরণের চেষ্টা করা উচিত ও তাকে আরো উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত।

পূর্বে যা বলা হয়েছে এটি তারই পরিপূরক কার্য। পুরাতনকে আবর্জনামুক্ত কর—পুরাতন নূতনের সেবা করুক। ১৯৪৯ সালে নূতন চীনের প্রতিষ্ঠার পর চীনের ভেষজবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা শুরু হয় ব্যাপকভাবে—সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে এর প্রয়োগ ও গবেষণা চলে। মাও সে তুং চীনের প্রাচীন ভেষজ ও চিকিৎসার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সম্মেলন ঘটালেন। ১৯৫৮ সাল—'গ্রেট লিফ ফরোয়ার্ড'-এর বছর। মাও সে তুং সর্বক্ষেত্রে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। সেই ডাকে সাড়া দিল প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকটি মানুষ। যে যার নিজের কর্মক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল—অর্থাৎ সম্যক পরিবর্তন ঘটাল। তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন আকুপাংচার এনেসথেশিয়া।

আকুপাংচার চিকিৎসার চরম উৎকর্ষের পরিচয় এখানে আছে। এইটেই আমরা বেথুন মিলটারী হাসপাতালে দেখতে গেলাম। হাসপাতালে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারি নি কি দেখতে যাচ্ছি, কি দেখব। দু-একটা অপারেশন দেখা হবে এই পর্যন্ত জানি। আমাদের সাদা কোট পরিয়ে, হাসপাতালের টুপি পরিয়ে, নাক মুখ ঢেকে দেওয়া হল ; আমার জুতো খুলে অন্য জুতো পরে তৈরি হলাম। আমাদের সঙ্গে দুজন ডাক্তার—তাঁরা খানিকটা শিখবেন, অন্যরা বিশুদ্ধ দর্শক। মিসেস বসু করিডরে বেঞ্চের উপর বসে রইলেন। বললেন—আমি অপারেশন দেখব না, আমার অত বাহাদুরিতে কাজ নেই। কারণ শুনলাম আগের ডেলিগেশনে একজন বিপ্লবী পুরুষ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন লাংস অপারেশনের দৃশ্য দেখে। আমার অবশ্য বাহাদুরির ইচ্ছা প্রবল—তা না হলে এই ভাঙা পায়ে ঠক্ ঠক্ করতে করতে চীন পর্যটনে বেরিয়েছি! আমি স্থাপত্য দেখতে কায়িক পরিশ্রম করব না কিন্তু মনের ধকল সইতে পারব। আকুপাংচার এনেসথেশিয়া অর্থাৎ আকুপাংচার করে একটি ছুঁচ ফুটিয়ে রাখবে এমন কোনো উপযুক্ত স্থানে যাতে অপারেশনের নির্দিষ্ট স্থলটি অসাড় হয়ে যায় এবং অপারেশনের সময় রুগী সম্পূর্ণ জাগ্রত থেকেও কোনো বেদনা বোধ না করে। আমরা প্রথম যে ঘরে ঢুকলাম সেখানে রুগী একটি মাঝবয়সী মহিলা। তিনি শুয়ে আছেন। তাঁর গলার উপর একটি বাঁকা চাঁদের মত লাল চিহ্ন দেওয়া আছে, ঐখানে তাঁর থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অপারেশন করা হবে। মুখের সামনে রয়েছে একটা পরদা। কাজেই ডাক্তারদের হাতের কাজ তিনি দেখতে পাবেন না। ঘাড়ের কাছে একটা ছুঁচ ফোটান আছে এবং সেটা একটা ছোট ব্যাটারী সেটের সঙ্গে যুক্ত—ছুঁচটা নড়ে নড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠছে। আগে এই প্রক্রিয়াটা হাত দিয়ে করতে হত, তাতে ডাক্তারের কৌশলের উপর অনেকখানি নির্ভর ছিল। অপটু হাতে তেমন সুষ্ঠু চালনা নাও হতে পারে—তাই যান্ত্রিক পদ্ধতিটা অনেক উন্নত। আমরা রুগীর মাথার কাছে গেলাম—স্থির তাকিয়ে ছিলেন মহিলা। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছেন? তিনি ঈষৎ ম্লান হেসে বললেন,—আমি কখনই ভালো থাকি না।—এখন বিশেষ কিছু কষ্ট আছে কি?—তিনি বললেন,—না।—তখন এঁর অপারেশনের যোগাড়যন্ত্র চলছিল। অপেক্ষা না করে আমরা অন্য ঘরে গেলাম। সেখানে একটি তরুণ বালকের হাঁটুতে অপারেশন হচ্ছে। তারও বুকের কাছে পরদা ঝোলান ছিল। ডাক্তাররা হাঁটুর পাশটা কেটে ফেলেছিলেন। একজন রক্ত মুছে নিচ্ছে—আর ভিতর থেকে সরু সরু নরম তন্তুগুলি বার করে আনছে। ভীষণ দৃশ্য—ছেলেটির মুখের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা—সে স্মিত মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করল—কোনো কষ্ট হচ্ছে তোমার?—সে বললে,—না কোনো কষ্ট নেই।—আমাদের দলের প্রত্যেকে তার সঙ্গে কথা বললেন, আমরা বিস্মিত হয়ে চলে এলাম—তার ঠিক কোনখানটায় ছুঁচ ফোটান ছিল আমার মনে নেই। তবে ঠিক ঐ একইভাবে ২।১ টি ছুঁচ ফোটান ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে এমন এক জায়গায় ছুঁচটি ছিল যাতে আমার মনে হয়েছিল যে, যেখানে ছুঁচ ফোটান আছে তার সঙ্গে হাঁটুর সংযোগটি সাধারণভাবে অনুমান করা যায় না। মানুষটি সম্পূর্ণ জেগে আছে, ঐ স্থানটিও অসাড় করা হয়নি, অথচ তার ব্যথাবোধ নেই। এবারে আর একটি ঘরে যাওয়া হল, এখানে কঠিনতর অপারেশন হচ্ছে। একটি মহিলার ডিওড্রানেল আলসার অপারেশন হচ্ছে। পেটটি বড় রকম চিরে ফেলা হয়েছে এবং পেটের ভিতরের কলকব্জা অনেকগুলিই ডাক্তারের হাতের উপরে—রক্ত মুছে নিচ্ছে তুলো দিয়ে একটি হাত—আর একজন অপারেশন করছেন। মাথার দিকে যাবার জন্য এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখি একজন নার্স একেবারে পিছনে দাঁড়িয়ে। সে বোধহয় অপেক্ষা করছিল আমি ওখানে মূর্ছা গেলে আমাকে ধরবে। তা আমি মূর্ছা যাবার পাত্র নই—তবে পরের যন্ত্রণা দেখতে হলে কষ্ট হত। তা সে মহিলার কোনও কষ্ট হচ্ছিল না, মুখটা একটু বিরস ছিল, হয়ত শঙ্কা ছিল, কিন্তু কষ্ট ছিল না। দোভাষীর মাধ্যমে দু-চারটি কথা বললেন, পরদার ওধারে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো জ্ঞান আছে বলে মনে হল না। যতদূর মনে পড়ে এই বিরাট অপারেশনের জন্য তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গের সম্মুখের ঘাড়ের কাছে একটি মাত্র ছুঁচ ফোটান ছিল। এ ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা আবার 'থাইরয়েড' অপারেশন দেখতে গেলাম—ততক্ষণে অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। রুগী আমাদের দেখে মৃদু হাস্য করল। এই যে আশ্চর্য ব্যাপার আকুপাংচার এনেসথেশিয়া, এর কথা বলতে বলতেও ওরা বলে এ সমস্তই মাও সে তুং-এর জন্য হয়েছে। একেবারে গানের ধুয়ার মত ফিরে ফিরে আসে এ কথা, কেউ হয়ত বলতে পারে যে, মাও সে তুং কি করে এসব করলেন? তিনি কি ডাক্তার ছিলেন? তিনি ডাক্তার ছিলেন না সত্যি, তবে তাঁরই সর্বব্যাপী দূরদর্শিতার পুরাতনের নবীকরণ হয়েছে। অন্য অনেক দেশেই পুরাতন একেবারে বিসর্জিত।

বেধুন মিলিটারী হাসপাতালে আটশত বেড আছে। সবই যে মিলিটারী লোক তা নয়—আর মিলিশিয়াও তো সাধারণ লোকের সঙ্গে মিলে মিশে আছে। আমরা ঘুরে ঘুরে রুগীদের দেখতে লাগলাম। সমস্ত রুগীকেই প্রয়োজন অনুসারে পাশ্চাত্য চিকিৎসার সঙ্গে প্রাচীন চীনা চিকিৎসার প্রয়োগে চিকিৎসা চলছে। কয়েকটি ভূমিকম্পে আহত রোগী দেখলাম। আমরা চীনে যাবার অব্যবহিত পূর্বে সে দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল। একজনের কোমর থেকে নিচের অঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছিল, পিঠে আঘাত লাগার ফলে। তার ডাক্তারী চিকিৎসার সঙ্গে আকুপাংচার চলছে। আর একটি আহত দেখলাম, তার সমস্ত মেরুদণ্ডটি ভেঙে গিয়েছিল, তাকেও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসার সঙ্গে পরিপূরক হিসাবে আকুপাংচার দেওয়ার ফলে খুব দ্রুত ফল পাওয়া গিয়েছে! আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এনেসথেশিয়ার বদলে আকুপাংচার এনেসথেশিয়া দেওয়ার সুবিধা কি। উত্তরে তাঁরা জানালেন যে, অনেক স্থলে এনেসথেশিয়ার ফলে নানা উৎপাত ঘটে। কারও কারও বমনেচ্ছা হয়—কারও হার্ট খারাপ থাকলে সেটা সহ্য হয় না ইত্যাদি। আমি বললাম—আর লোকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনেসথেশিয়া? তখন জানতে পারলাম যে, সবরকম অপারেশনে তাতে সুবিধা হয় না। তাছাড়া আকুপাংচার এনেসথেশিয়ার ফলে রোগী দ্রুত আরাম পায়। কম ব্যয়সাধ্য তো বটেই।

যার হাঁটুতে অপারেশন হয়েছিল সে ততক্ষণে পাশের ঘরে এসে গেছে এবং উঠে বসে আপেল খাচ্ছে। শুনলাম, যার পেটে অপারেশন হয়েছে সেও কিছু পরে বসবে। যা হোক একজন রোগীর সঙ্গে আমরা সবাই ছবি তুললাম—তার বাঁধা হাঁটুটা বেশ দৃশ্যগোচর করে। তাতে তার বেদনার উপশম হল কিনা জানি না। যা হোক আরো একটা কথা তাঁরা জানালেন যে, এই আকুপাংচার বিদ্যা আয়ত্ত করা খুবই সহজ। এর জন্য বস্তুপাতি সামান্যই লাগে। কাজেই বেয়ারফুট ডাক্তাররাও এই বিদ্যা সহজে শিখে নিচ্ছে এবং গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা সহজ হচ্ছে। ভেবে দেখুন এনেসথেশিয়া দিতে ক'জনের সাহায্য দরকার হয়? আর এখানে একটি ছুঁচ ফুটিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বুকটি চিরে একটি অকেজো লাংস বাদ দিয়ে সেলাই করে দাও, ওদিকে রুগী একটু কমলালেবুর কোয়া চুষে মুখটা পরিষ্কার রাখুক!

এই বেথুন মিলিটারী হাসপাতালে শুধু চিকিৎসা হয় না, এটি একটি শিক্ষাকেন্দ্রও বটে। এখানে পুরাতন নিয়মে ভেষজ ঔষধ তৈরী হয়। চীনের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর সঙ্গে আমাদের অনেক মিল আছে বলে মনে হল। গত দু-চার বছরে এখান থেকে দু হাজার "নগ্নপদ" ডাক্তার শিক্ষাগ্রহণ করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। এরা শিখেছে কিছুটা পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা পদ্ধতি, কিছুটা "আয়ুর্বেদীয়", কিছুটা আকুপাংচার ও মক্সিবাসটন। মক্সিবাসটন আমাদের দেশের কর্পূরের বাতির কথা মনে পড়ায়। মক্সিবাসটন হচ্ছে একজাতীয় পাতা গরম করে শেক দেওয়া। আমাদের যেমন ছিল কর্পূরের বাতি—বদহজমের পেটব্যথায় একেবারে অব্যর্থ। রোগ আরোগ্যই হচ্ছে লক্ষ্য—যার পক্ষে যে পদ্ধতি যতটুকু খাটে অন্যটির দ্বারা তার পরিপূরণ করে চিকিৎসা চালালে রোগ যদি শীঘ্র সারে বা যদি কোনো ওষুধে কোনো রোগের উপকার হয়, তবে সেটা যে মতেরই হোক গ্রহণীয়। কথাটা শুনতে ভালো এবং যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু হয় কী? ভেবে দেখুন, কলকাতা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে একটা আয়ুর্বেদের ফার্মেসি চলছে! এই হাসপাতালে একশ একর জমিতে নানা ফল ও ঔষধির চাষ হয়। ঐ দিনই বিকেলে আমরা আবার হাসপাতালে ফিরে এলাম—সেই বিবিধ ঔষধি দেখতে এবং সে সম্বন্ধে নানা তথ্য জানতে।

আমরা শুনলাম মাও-সে-তুং নাকি বলেছিলেন যে, "আর্মি সুড বি লারনিং, থিংকিং অ্যান্ড টিচিং ইউনিট"—যিনি আমাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন তিনিও একজন সৈনিক এবং ডাক্তার। তিনি দুবার এই বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, আবার আমি ধাঁধায় পড়লুম। আমাদের তো চিরদিন ধারণা আর্মি কিছু ভাববেই না—যন্ত্রের মতো কাজ করবে—তাহলেই শৃঙ্খলা থাকবে নইলে এক বিশৃঙ্খল জনতা কখনো যুদ্ধ জয় করতে পারবে না—তাই "দেয়ারস্ নট টু মেক্ রিপ্লাই, দেয়ারস্ নট টু রিজন হোয়াই, দেয়ারস্ বাট্ টু ডু অ্যান্ড ডাই"—এই কবিতা আমরা পড়েছি, মুখস্থ করেছি এবং কবিতাটির ভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছি. অবশ্য আমাদের পক্ষে যতটুকু উদ্দীপ্ত হওয়া সম্ভব কারণ আমরা স্কুল ডেস্কে বসেই সেটুকু উত্তেজনা খরচ করে ফেলেছি। আমরা তো আর 'ডু অ্যান্ড ডাই' করতে যাচ্ছি না। কিন্তু সৈন্যরাও নিশ্চয় এইভাবে শিক্ষিত হয়েছে। এমন কি এই বর্তমান সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন হঠাৎ বলে বসলেন, "আর্মিকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, পুলিসকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁরা অন্যায় আদেশ পালন করবেন না"—আমাদের খুবই আপত্তি হয়েছিল। আরে, এ তো আর্মিতে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়ানো! আর ঐ কথার সূত্র ধরে. এমার্জেন্সি কায়েম হল—কত লোক জেলে গেল—সকলে বলতে লাগল জয়প্রকাশ নারায়ণের কি অন্যায়! কি দরকার ছিল তাঁর আর্মিকে বিবেকের বাণী শুনতে বলার—ওরা যদি বিবেকের চর্চা করতে বসে তাহলে যুদ্ধটা করবে কে! সেদিন হঠাৎ ডাঃ মা ওয়েন চেঙ্গের মুখে মাও-সে-তুং-এর কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম—এত বড় যোদ্ধা এই কথা বলেছেন যে সৈন্যদেরও শিখতে হবে ভাবতে হবে শেখাতে হবে। যদি ভাবতে হয়—তাহলে তো যুক্তির প্রয়োগও করতে হবে, ফলে 'দে আর নট টু রিজন হোয়াই' এই আপ্তবাক্য আর চলবে না। মাও-সে-তুং যা বলেছেন তা অভাবনীয় কিছু নয়। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনভ্যস্ত ভাবনা অভাবনীয় বলে বোধ হয়। আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সৈন্য-সামন্ত যাঁরা আছেন তাঁদের কথা মনে পড়ল, তাঁরা সকলেই চিন্তা করতে পারেন, করেনও। কিন্তু সৈনিকের কাজে গেলে যদি তাঁদের চিন্তাশক্তি লোপ করে অন্ধের মত রাজনির্দেশে চলতে হয়, তাহলে মানুষও যা কামানও তা—মানুষ যে যন্ত্র নয়, মানুষে, এবং সৈনিকের পক্ষেও যে সেই মনুষ্যত্ব সমানই মূল্যবান একথা যিনি দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে হাজার হাজার মাইল লং মার্চ করে, যুদ্ধ জিতে একটা দেশ পুনর্গঠন করে তারপরও বলতে পারছেন—তাঁর কথা তাই এটা প্রমাণ করছে যে, কমিউনিস্ট দেশে অন্যদের স্বাধীন চিন্তার অধিকার যদি হরণ করা হত তাহলে সৈন্যদের কি সে অধিকার দেওয়া চলত? অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশের কথা আমি জানি না, কারণ আর কোনো দেশে গিয়ে আমাকে ঠিক এতখানি ভাবায়নি। আমাদের দেশে ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশে ধারণা যে চীনে কেউ স্বাধীন চিন্তা করতে পারে না, মতানৈক্য প্রকাশ করতে পারে না। এটা ঠিক কিনা আমি তা জানি না—কিন্তু যিনি সৈন্যদেরও চিন্তা করতে বলছেন তাঁর অন্তর্দর্শন কত গভীর। ভাড়াটে সৈন্য ও পিপলস্ আর্মির তফাৎটা তখনি পরিষ্কার হল—বহু আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত আগ্নেয়াস্ত্রের বর্ষণের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথে তীর ধনুক নিয়ে ভিয়েতনামের নব নব উদ্ভাবনী শক্তির আধার ক্ষীণদেহ মানুষদের মনে পড়ল।

যাক, কথা হচ্ছিল ভেষজের, কোথা থেকে কোথায় গেলাম! কারণ আমি তো শুধু বাইরে ভ্রমণ করছি না, ভ্রমণ করছি মনেও। হাসপাতালের একশ একর জমির মধ্যে আমাদের সারিবদ্ধ গাড়ি ঢুকতে ঢুকতে দেখতে পেলাম দুধারে নিষ্পত্র আপেল গাছের সারি, লাইনের পর লাইন ফল হারানো শুষ্ক শাখা। ফল পাড়া হয়ে জমা হয়েছে। যেখানে যাচ্ছি টেবিলের উপর নানা জাতের আপেলের স্তূপ দেখতে পাচ্ছি। হাসপাতালের ঐ জমিতে আপেল আঙুর নানারকম ফল হয়। সব্জী তো হয়ই। ডেয়ারীতে বড় বড় অস্ট্রেলিয়ান গরু। হাসপাতালের প্রয়োজনীয় দুধ সেখানেই উৎপন্ন হচ্ছে। সত্তর হাজার কিলো দুধ হচ্ছে, ত্রিশ চল্লিশ হাজার কিলোগ্রাম আঙুর হচ্ছে, এছাড়া পোলট্রীও রয়েছে, ডিম এবং মুরগী পাওয়া যাচ্ছে যথেষ্ট। ঐ একশ একর জমির মধ্যে চৌদ্দ একর পশুপালনের জন্য, বাকীটা ফসল সব্জী ও ঘর বাড়ি বাগান। হাসপাতালের ব্যয়ভার এতে অনেকখানি লাঘব হচ্ছে। এইসব চাষ ও পশুপালনের কাজ করছেন ডাক্তার নার্স প্রভৃতিরাই। এছাড়া করছেন তাঁরা নানা ঔষধির চাষ, চীনা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার জন্য। আমরা একটি 'হট হাউস' দেখতে ঢুকলাম। বাইরে তো কোনো গাছে একটি পাতা নেই কিন্তু 'হট হাউসের' ভিতর টবে টবে নানা গুল্ম সবুজ হয়ে আছে। প্রত্যেকটি গাছ আমার চেনা, এমন কোনো গাছ দেখলাম না যা বিশেষ করে চীনের, কেবল একটি 'ফাংগাস' দেখলাম—বোতলের আধারে তার শিকড়, বোতলের মাথায় ব্রাউন ও সাদা রং-এর ছত্রাক জাতীয় একেবারে উদ্ভটদর্শন আদিম গুল্ম। শুনলাম ঐ ঔষধিটি সর্দি কাশির কাজে লাগে। ফুলশিরা-ভিনকা-জিরোনিয়াম এই সব অতি পরিচিত গাছগুলির কি কি গুণ জানবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অত সময় ছিল না। ওদের আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীও নিশ্চয় আমাদের মতই হবে কারণ নানারকম তেল, গুঁড়ো পাঁচন ইত্যাদির কথা শোনা গেল। হাসপাতালের সঙ্গের চীনা আয়ুর্বেদের ফার্মেসীটি বেশ বড়। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম ডাক্তার নার্স প্রভৃতিদের যা দেখি নিজেদের কাজ করেই তাঁরা সময় পান না। এবং হাসপাতালের সেবক সেবিকারা সবসময়ই কর্মভারে প্রপীড়িত হওয়ার ফলে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। রুগী একবার প্যান চাইতেই ভয় পায়। আমরা সর্বদাই বলি, আহা নার্সরা খেটে খেটে হয়রান, একটু মেজাজও করবে না! এরা রুগীর সেবা করে আবার হাঁস মুরগীর সেবা করে, গো সেবা করে, চাষ করে কি করে আমার বোধগম্য হল না—অথচ চোখে যা দেখছি তাকে অবিশ্বাসই বা করি কি করে। কেজো চীনের কাজ কিন্তু খুব অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দ।

মাও-সে-তুং বলেছেন, 'পুরাতন চীনের চিকিৎসা বিদ্যা একটি রত্নখনি—অমনি দেশসুদ্ধ লোক রত্ন আহরণে লেগে গেল? এ কি বিস্ময়? আমাদের ভারতীয় চিকিৎসাও কি তেমনি মূল্যবান ছিল না, কিন্তু সেদিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবেষণার কতটুকু চেষ্টা হল? আমাদের যোগশাস্ত্র এখন আমেরিকার হাত ঘুরে আসাতে কতকটা কদর হয়েছে। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিরাজদের বহুশ্রুত নাড়ি দেখার বিদ্যা, নিদানের কাল নির্ণয়, এগুলো তো আজগুবি ঘটনা ছিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই আশ্চর্য শক্তি অব্যবহারে নষ্ট হয়ে গেছে। কত টোটকা আছে আজও বেগুলি সম্বন্ধে গবেষণা হলে হয়ত অনেক মূল্যবান ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। মক্সিবাসটন পদ্ধতির কথা শুনে আমার ছোটবেলার দেখা একটি দৃশ্য মনে পড়ে গেল। একটি বছর তিনেকের মেয়ে হঠাৎ একদিন আমবাতে একদম ফুলে গোল হয়ে যায়। তখন বলা হত আমবাত, এখন বলা হয় এলার্জি। আমার ঠাকুমা যিনি কবিরাজ বাড়ির বধূ, যাঁর শ্বশুর-কুলের ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষ অন্তত কবিরাজ, তাঁর নানারকম টোট্‌কা জানা ছিল। তিনি ঐ বালিকার পেটের উপরে সুপুরীর খোলে অর্থাৎ সুপুরী গাছের পাতার গোড়ার দিকটিতে একটা শাকপাতা, আমার যতদূর মনে পড়ে থানকুনি পাতা রেখে একটি উত্তপ্ত লোহশলাকা দিয়ে নাড়াচাড়া করলেন—শাকটা প্রায় ভাজা হয়ে গেল। বালিকার মাতা এবং অন্যান্য আধুনিক দর্শকদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও পরপর তিনদিন তিনি এই চিকিৎসা চালালেন। ঐ বালিকার জন্মের মত আমবাত সেরে গেছে। আমবাত বা এলার্জি কিন্তু এরকম সারে না, ফিরে ফিরে আসে। এমন কত টোট্‌কা ওষুধের কথা আমরা জানি, শুনি কিন্তু তা নিয়ে কোনো বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা করা হয় না। সেইসব রত্নগুলি অনাদরে হারিয়ে যায়। ওদিকে আবার অমুক বাবার হাতের ছাই—তমুক বাবার টিকির জবা ফুল, এসব ভক্তিভরে ধারণ করে গদ্‌গদ হই। উপকারও হয়ত পাই কারণ বিশ্বাসের রোগ হরণ এবং রোগ করণ দুরকম ক্ষমতাই আছে। কিন্তু সেটা অনেকটা তিব্বতীদের ম্যানাস্ক্রিপ্ট খলে মেড়ে খাবার মতই।

যে সমস্ত ভেষজ, টোটকা বা রোগনাশক প্রক্রিয়া জানা আছে তাকে অবশ্যই ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে দিলে বা ব্যক্তিবিশেষের কব্জায় রাখতে দিলে তার সত্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কোনো ঔষধকে কারও ব্যবসারের মূলধন করে রাখলে তা কখনো সর্বসাধারণের সেবায় লাগবে না। শুনেছি চীনেও একদা বিশ্বাস ছিল যে কোনো ওষুধের কথা বলে দিলে তার গুণ নষ্ট হয়ে যায় তাই 'গুণী' সেটা গোপন রাখবে! এখানেও তো তা ছিলই এখনও আছে। এইভাবে একজনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কত মূল্যবান রত্ন হারিয়ে যেত। চীনে আজ আর তা হয় না। কারণ অন্ধ বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে, যুক্তি এসে অবুদ্ধিকে পরাজিত করেছে, তাই বহু প্রাচীন ঔষধ ও বিদ্যা নবযুগের মানুষের চিন্তার আলোতে আরো বহুগুণে ফলপ্রদ হয়েছে।

AMARBOI.COM

আকুপাংচারের 'কল্পিত' চ্যানেলগুলোর কথা যখন ভাবি তখন আমার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে এবং আশ্চর্য বোধ হয় যে শরীরের কোন অংশের সঙ্গে কোন অংশের সংযোগ আমাদের প্রাচীন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তার কোনো বিচারের চেষ্টা এদেশে তো হল না। কুলকুণ্ডলিনীই বা কি, মূলাধারই বা কি, এ সমস্ত কল্পিত বিবরণের মধ্যে কোনো তথ্য গোপন আছে কিনা? আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি মাটিতে গর্ত করে একটি লোককে চার ঘণ্টা মাটি চাপা দিয়ে রাখতে। এটা অলৌকিক ঘটনা নয়, সে অল্প অক্সিজেন ব্যবহার করেও দেহকে জীবিত রাখার বিদ্যা শিখেছিল—ভেকের মতন, সাপের মতন স্বেচ্ছা-নিদ্রা বা হাইবারনেসানের যে ক্ষমতা মানুষ এদেশে আয়ত্ত করতে শিখেছিল সেই আশ্চর্য ক্ষমতাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভালোমত জেনে তাকে কি কোনো চিকিৎসার কাজে লাগান যেত না? আমরা ছোটবেলা থেকে শুনেছি পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের সঙ্গে চোখের সংযোগ আছে। আমার শ্বশুরমশায় বলতেন, পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে সরষের তেল দাও, চোখ ভাল থাকবে। একবার আমার চোখ উঠলে কারো উপদেশে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে আকন্দের আঠা লাগিয়ে উপকার পেয়েছিলাম। তখন থেকে ভেবেছি কোন্ পথে কি উপায়ে ঐ আঠার প্রভাব চোখ পর্যন্ত পৌঁছল!

এই প্রসঙ্গে আমার বহুদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমাদের কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর বাবা ডাঃ এন কে বসু খুব ভালো চিকিৎসক ছিলেন, ঔষধ ছাড়া নানারকম অভ্যাস পালন করিয়ে রোগ আরোগ্য করতেন। আমাকে তিনি কন্যাসম স্নেহ করতেন! একদিন কালিম্পং-এ আমরা বসে আছি, একজন অপরিচিত ভদ্রলোক এলেন। কিছুক্ষণ কথার পর ডাঃ বোস বললেন—আপনার পিঠে কি কোনো ক্ষত আছে? তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্মিত হলেন,—কেন? না তো।—নিশ্চয়ই আছে—আমরা তো আরো বিস্মিত। অবশেষে অনুরোধে পড়ে জামা খুলতে দেখা গেল ক্ষত নয়, ক্ষতর চিহ্ন। ডাঃ বোস বললেন, "ঐটার কথাই বলছিলাম।" কি করে এই আশ্চর্য দর্শন ঘটল জিজ্ঞাসা করায় তিনি যা বলেছিলেন তা এইখানে লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। তিনি বললেন—ছোটবেলায় তিনি খুব দুষ্টু ছেলে ছিলেন। একদিন একটা পেঁচা ধরে তার পা মটকে ভেঙে দেন। যে মুহূর্তে পা-টা মটকালেন তিনি দেখতে পেলেন পেঁচাটার বিস্ফারিত চক্ষুর মধ্যে তার গোল বৃত্তের একটি স্থানে একটা পরিবর্তন হল। পেঁচাটাকে তিনি রাখলেন এবং পা-টা সেরে গেলেও দেখলেন চোখের সেই জায়গায় সেই চিহ্নটি রয়েই গেল—তারপর তিনি বহু ছোটখাটো জীবজন্তু নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং মানুষের শরীরের ক্ষতর সঙ্গে মিলিয়ে চোখের বৃত্তের চিহ্ন পরীক্ষা করে তিনি একটি তথ্য আবিষ্কার করেছেন যে, শরীরের কোন অংশের সঙ্গে চোখের কোন অংশের এমন সম্বন্ধ রয়েছে যে শরীরের ক্ষতটি চোখের সেই অংশকে বিক্ষত করে। তিনি একটি বড় দু ফুট বৃত্তের চোখ এঁকে আমায় ডায়গ্রাম করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ডাঃ বসু বলেছিলেন—এই খেলা দেখিয়ে তিনি অনেককে চমৎকৃত করেন কিন্তু তাঁর এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান আর অন্য কোনো কাজে লাগেনি। আজ মনে হয় যে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চর্চা হলে এ একটি চিকিৎসাবিদ্যার সহায়ক বিশেষ বিদ্যা হতে পারত।

প্রাচীন চীনের চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি রত্নখনি। ভারতেরও তাই, কিন্তু রত্ন আহরণের পদ্ধতি কি? সত্যদর্শন। অর্থাৎ ভুল ধারণা দূর করে সত্যপথ গ্রহণ। আমাকে একজন —বলেছিলেন—'হাউ টু ফাইট রং আইডিয়াস'—বা 'হোয়ার ফ্রম রাইট আইডিয়াস কাম্?' সত্যকে পাওয়া যায় কি উপায়ে? এটি মাও-সে-তুং-এর প্রশ্ন—এবং উত্তরও তাঁরই দেওয়া— **Practice, class-struggle, struggle for production, scientific experiment.** অর্থাৎ কি করে সত্য জানা যায়? অভিজ্ঞতা, শ্রেণী-সংগ্রাম, উৎপাদনের চেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাই সত্য জানবার উপায়। ঠিক কি অর্থে কমিউনিস্ট তত্ত্বজ্ঞরা এ কথার ব্যাখ্যা করবেন তা আমার একেবারে জানা নেই—কিন্তু ধরা যাক আমাদের দেশে এই যে বহুদূর দেশীয় চিকিৎসারীতি ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করব কি করে? আজগুবি আর অলৌকিকের ধাঁধায় পড়ে আমরা কি সত্যকে পাব? বহু অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত যা তাকে আমাদের বিচারযোগ্য বলে বেছে নিতে হবে—তারপর কোনো গুরু, পীর বা বাবাজী সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করা চাই। বাবাজীর পায়ের ধুলো বা হাতের ছাই মেখে যদি রোগী আরোগ্য হয় তবে অবশ্যই সেই ধুলো বা ছাইতে কোনো ঔষধ আছে কিন্তু সেটা তো পরীক্ষা করে দেখা চাই—তখন প্রশ্ন আসবে পুরোপুরি পরীক্ষা করে গুণাগুণ নির্ণয়ের।

কায়েমী স্বার্থের হাতে এবং কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আমাদের কত রত্ন যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার সন্ধান করবে কে? কতগুলি পেটেন্ট ঔষধ সম্বল করে আমরা চিকিৎসাকে একপেশে, ব্যয়সাধ্য এবং সাধারণ মানুষের আয়ত্তের অতীত করে রেখেছি।

চীনে বা সোভিয়েত ইউনিয়নে—যে কোনো কমিউনিস্ট দেশে, এমন কি লন্ডনেও যদি রোগে পড়লে কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু ভারতে বা আমেরিকায় অসুখ হলে অসুখের চেয়ে চিকিৎসার ব্যয়ই প্রাণ হরণ করে নেবে। আমেরিকায় চিকিৎসা তো একটা র‍্যাকেট সেজন্য প্রত্যেকের মেডিকেল ইনসিওরেন্স করতে হবে তা না হলে চিকিৎসা করা সম্ভবই হবে না। দু-চারদিনের জন্য বেড়াতে গিয়ে যদি কারো অসুখ হয় তবে তার যে কি সর্বনাশ হতে পারে তা ভেবে তাকে সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। আমেরিকার তো ধনসম্পত্তির অভাব নেই—হাসপাতালের অভাব নেই, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষারও চূড়ান্ত সুযোগ-সুবিধা, কিন্তু সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুবিধা কি এবং ডাক্তারদের বিশেষ করে ডেন্টিস্ট ও চোখের ডাক্তারদের রোজগারের গলাকাটা রূপটি কি তা এখানে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

চীনের চাষীর ঘরে ঘরে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য যখন আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে সমস্ত দেশ জুড়ে, তখন বহু গুণে অর্থে বিত্তে উন্নত আমেরিকায় চিকিৎসাবিদ্যা এবং শাস্ত্রটা কতটা রুগীর স্বার্থে নিযুক্ত হচ্ছে, কতটা ডাক্তারের পকেটের স্বার্থে—এ তুলনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে অসঙ্গত হবে না। ১৯৭৩ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে এ সম্বন্ধে যে তথ্য লিখেছিলাম তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ আমেরিকায় যে দুটি ব্যাপার আমার অল্পদিনের ভ্রমণে বিশেষ করে লক্ষ্য হল তার একটি হচ্ছে চিকিৎসা-সঙ্কট, অন্যটি যুব বিদ্রোহ। চিকিৎসা-সঙ্কট এ-দেশেও ঘটে। রাজশেখর বসু মহাশয় অনেক দিন আগেই তার বিস্তৃত কাহিনী লিখেছেন। 'ডাক্তারের পাল্লায় পড়া' কথাটি সর্বদাই ব্যবহার হয়। কিন্তু সেটা যে কত দূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ও-দেশে তা দেখে রীতিমত ভীত হয়েছি। আমেরিকায় ডাক্তারী বৃত্তি অন্যান্য পেশার চেয়ে অর্থকরী। স্বামী-স্ত্রী যদি দুজনে ডাক্তার হন কিংবা একজন ডাক্তার, একজন অ্যানাস্থেসিস্ট, তা হলে তো সুখ-স্বর্গ। তা হলে তাঁদের বিস্তৃত লনের মধ্যে বিরাট বাড়ি ; তা হলে তাঁরা মাঝে মাঝে মেইডও রাখেন, দু-তিনখানা গাড়ি তো চড়েনই। অ্যানাস্থেসিস্টরা ডাক্তারদের চেয়েও বেশী রোজগার করেন। আর যদি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ও অন্যজন অ্যানাস্থেসিস্ট হন, তবে তো তাঁদের যে কোনো বৃহৎ শিল্পপতির মতই চালচলন হবে।

সাইকিয়াট্রিস্টদের ব্যবসার ধরনটিই আমাকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করেছিল। কারণ, অচিরে এই ধরনের রোগের প্রবর্তনা আমাদের দেশেও বেড়ে উঠবে বলেই আমার আশঙ্কা। মানসিক রোগের তো কোনো জীবাণু নেই, ডেটল ঢেলে তার শোধন হব না ; কাজেই, পশ্চিমে হাওয়ায় তা উড়ে এলে আর দূর করে কার সাধ্য! রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়—' ; মানুষের দুর্দশা নিয়ে ডাক্তারদের ব্যবসায়ের অধিকার অনেক উন্নত দেশে আজও নির্বাধ। ডাক্তারি আমেরিকায় একটি ইনডাস্ট্রি এবং ডাক্তারদের রাজনৈতিক লবি এত জোরালো যে তা টলাবার সাধ্য নেই কারুর। কেনেডি কিছু চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন, সফল হননি। (এইখানেই মাও-সে-তুং-এর কথা স্মরণীয়—Where right ideas come from এবং class struggle-এর প্রশ্নও আর অবান্তর বোধ হয় না।) আমেরিকায় অবস্থা এমন যে, কোনো লোকেরই সাধ্য নেই নিজ ব্যয়ে চিকিৎসা করে। তাই হেলথ ইনসিওরেন্সের জটাজাল ছড়ানো আছে। ইনসিওরেন্স করা থাকলে অনেকখানিই ইনসিওরেন্স কোম্পানী দিয়ে দেবে। তবে কতটা দেবে সেটা নির্ভর হবে প্রিমিয়ামের হার অনুযায়ী। কোন্ চিকিৎসায় কত খরচ পড়বে, আগে থেকে বলা শক্ত। হাসপাতালের মর্জি। একবার হাসপাতালে নামটি লেখালে শেষ পর্যন্ত কত টাকায় ফেরে পড়তে হবে, কেউই জানে না। আবার নাম না লিখিয়েও উপায় নেই ; এখানে যেমন দোকানে মুড়ি-মিছরির মত অ্যান্টিবায়োটিক বড়ি কিনতে পাওয়া যায় সেখানে তেমন নয়। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা নিষিদ্ধ। আয়ুর্বেদও নেই। অগত্যা সেই হাসপাতাল। খুব স্বাভাবিক ও নিরুপদ্রব একটি প্রসব হতে খরচ লাগে এক হাজার ডলার। এ-ক্ষেত্রে পরের দিনই প্রসূতি বাড়ি চলে যান। কিন্তু কোনো অপারেশন হলে এ খরচ সাত হাজার ডলার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। টাকার সম্পর্ক মানেই সন্দেহের সম্পর্ক। রুগী ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় সন্দেহ করেন ইচ্ছে করে কেস জটিল করা হয়েছে। এ-দেশেও সম্প্রতি এ রকম সন্দেহের বিষবাষ্প উড়ছে। প্রায়ই শুনি সিজারিয়েনের দরকার ছিল না, তবু ঝট করে করে দিল। সন্দেহের প্রমাণ-অপ্রমাণ নেই। আমেরিকায় ইনসিওরেন্সের খরচ দরিদ্র ও বিত্তবানের পক্ষে একই। কাজেই, দরিদ্রের পক্ষে চিকিৎসা রোগের চেয়েও ভয়াবহ। দাঁত ও চোখের রোগ আবার ইনসিওরেন্সের আওতায় পড়ে না। কাজেই, দন্ত ও চক্ষু চিকিৎসকরা সর্বস্বান্ত করে ছাড়তে পারেন এবং করেনও। একটি অল্পবয়সী ছেলে দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, আক্কেল-দাঁত আক্কেল দিচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু দন্ত-চিকিৎসকের কাছে যেতে পারলেন না খরচের ভয়ে, গেলেন ডেন্টাল কলেজের ছাত্র একজনের কাছে। ডেন্টাল কলেজের ছাত্ররা এভাবে রোজগার শুরু করেছে। অপটু হাতের ধাক্কায় যন্ত্রণা বেড়ে গেলেও অর্থচিন্তার লাঘব হয় রুগীর। একবার একটি ছেলে আমেরিকা থেকে দেশে বেড়াতে এসে মোটামুটি শক্ত দাঁত তুলে গেল খরচের ভয়ে। চক্ষু দুটিও যে তুলে যায়নি এই রক্ষে!

আমি জানি আমার এই মন্তব্যে এদেশেও অনেক ডাক্তার ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, হবার কথাই ; কারণ তাঁরা ঐ আদর্শই অনুসরণ করবেন ঠিক করেছেন। যে কেহ এদেশে রোগে ভুগেছে সেই আমেরিকার চিকিৎসা ব্যবস্থার কিছুটা আস্বাদ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অল্পদিনের জন্য বেড়াতে গেলে তো ইন্‌সিওর করা মুশকিল। অবশ্য মুশকিল কিছুই নয়, টেলিফোনেই হয়তো সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ; কিন্তু টাকা চাই তো। শুনেছিলাম কোনো ভারতীয় ছেলের কাজ সেরে গৃহমুখী হবার সময় পদস্খলন ঘটে। তখন সেই ভগ্ন পাটি হাসপাতালে মেরামত করতে এত খরচ হয় যে, এক বছর কাজ করে হাসপাতালের দেনা শোধ করে তবে বাড়ি ফিরতে পারে। এগুলো বানানো কথা নয়। সকলেরই নাম এবং ধাম দিতে পারতাম ; কিন্তু দেখেছি নাম দিলে লোকে রেগে যায়। তাই কার সিজারিয়ান হয়েছিল, কে দাঁত তুলেছিল, সেসব আর বললুম না। তবে আমেরিকায় একটা সুবিধা আছে যে, রুগীরাও প্রতিশোধ নিতে পারে, নেয়ও। কথায় কথায় ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়। ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ লেগেই আছে। অনেক সময় রুগীর আত্মীয়দের এবং রুগীর প্রতিশোধস্পৃহা এ প্রবণতা বাড়ায়। এ অবস্থায় ডাক্তারদেরও মোটা টাকা ইনসিওর করতে হয়, মামলার খরচ ও খেসারতের খরচ জোটাবার জন্য। ইনসিওরেন্সের অক্টোপাস ডাক্তার ও রুগী উভয়কেই জড়িয়ে রেখেছে। এমন একটা অবস্থায় ডাক্তার ও রুগীর মধ্যে যে মানসিক সৌহার্দ্য অভিপ্রেত তা হতে পারে কি? চরক সংহিতায় আছে, যে চিকিৎসক রুগীর কাছে বসে তার আত্মাকে দেখতে পায় না সে কখনো চিকিৎসক হতে পারে না। কিন্তু দেনা-পাওনার এই রকম নির্দয় ব্যবস্থা হলে আত্মার চেয়ে প্রেতাত্মা দেখার সম্ভাবনাই বেশী।

আমার এসব মন্তব্যে এ দেশে যেসব চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তাঁদের আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, মেডিকেল কলেজে যে গ্রীক ডাক্তারের শপথবাক্য পিতলের পাতে খোদাই করা আছে—ইংরেজ আমলে সেটা ঝকঝক করত কিন্তু এখন নিষ্প্রভ হয়ে আছে, সেটা তাঁরা মাঝে মাঝে পড়েন কি? পড়লে তাঁরা অন্তরকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই শপথ কতটা পালিত হয়? এই স্বল্পবিত্ত মানুষের দেশে এক থেকে তিন হাজারের কম কোনো অপারেশান হয় না—হাসপাতালে ঢুকলে (কয়েকটি ব্যতিক্রম হলেও) সাধারণ ভাবে কী দুর্গতি হয় তা কে না জানে? যে দেশে ডাক্তাররা নিজেদের অর্থলিপ্সার উদ্দেশ্যে মাসের পর মাস স্ট্রাইক করে জনসাধারণকে শিক্ষা দেন, সে দেশে সাধারণ ভাবে তাঁদের দেশের হিতৈষী বলা চলে না, তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। সব ক্ষেত্রেই মতই এক্ষেত্রেও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছে।

ডাক্তার-রুগীতে যে আত্মার সম্পর্ক হবে অবস্থা তার চেয়েও মারাত্মক যে আত্মীয় আত্মীয় নয়। এবং এই সমস্যার উপর নির্ভর করে সাইকিয়াট্রিস্টদের পসার জমে উঠেছে। সাইকিয়াট্রিস্টরা তাদের অক্টোপাসের শুঁড় সাধারণ মানুষের হৃদয়ে মগজে প্রবেশ করিয়ে রক্ত পান করছে বলেই আমার বিশ্বাস। আত্মীয়ের কাছে আত্মীয়ের কোনো আশ্রয় নেই বলেই ঘরের সমস্যা নিয়ে এরা ক্রমাগত ডাক্তারের কাছে ছোটে। 'আমার ডাক্তার বলেছে'—এ রকম কথা প্রায়ই শোনা যায়। নিজের পরিবার ও জীবন সম্বন্ধে ডাক্তারের হিতোপদেশের উল্লেখ করতে কারু সঙ্কোচ দেখলাম না। দু-একটা দৃষ্টান্ত দেবার প্রলোভন সামলাতে পারছি না। এবং চীনের প্রসঙ্গে যে এ দৃষ্টান্ত অবান্তর নয় তা পরিষ্কার হবে। দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সমাজব্যবস্থার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমার আমেরিকান বন্ধু পলি অত্যন্ত ভালো মেয়ে। তার বাবা তিনবার বিবাহ করেছেন, মা দুবার। কাজেই, বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কমই। একদিন শুনলাম, ওর মা তাঁর ছোট মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে আনছেন। ডাক্তার দেখিয়ে এসে মেয়েটি ঘরে শুয়ে পড়ল। ওর মা বললেন, এইমাত্র ওর গর্ভপাত করানো হয়েছে, ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরে যাবে। কথাটা এত অবলীলাক্রমে বলা হল যে, আমি হতবাক্। পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'পলি, আঠারো বছরের মেয়ের প্রথম সন্তান তোমরা নষ্ট করলে কেন? বিশেষ সে ছেলে যখন বিয়ে করতে রাজী ছিল?' পলি বলে, 'ভালো হত না। সে ভার নেবার যোগ্য নয়।' 'আহা, তোমাদের দেশে কে কার ভার নিচ্ছে!' পলি চিন্তিতভাবে বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু ওদের সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছেন, দুজনেই অপরিণত ; তাই এ সন্তান রাখলে ফল ভালো হবে না।' 'কি সর্বনাশ! পলি, তোমরা কি প্রেমে পড়বার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নাও নাকি?'

বিদেশে থাকলে আমাদের ভারতীয়দেরও এ সমস্যায় পড়তে হয়। শ্রীযুক্ত মান্নান এক সুন্দরী অষ্টাদশী রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের আট বছর পরে তাঁদের একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান হবার সময় ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর একটু বিষাদগ্রস্ত অবস্থা হয়—যাকে আমাদের সোজা বাংলায় বলে 'আঁতুড়ে বাই।' বন্ধুদের পরামর্শমত সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। আর যায় কোথায়! অনেক পরীক্ষা করে ডাক্তার মত দিলেন যে, তাঁর স্বামীর ব্যক্তিত্ব জোরাল হওয়ায় তাঁর ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়ে যাচ্ছে—অবদমিত হচ্ছে। সেই উপদেশের ফলে ভদ্রমহিলা শিশুকন্যাকে ফেলে রেখে স্বামীকে ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন একা থেকে তাঁর অবদমিত ব্যক্তিত্বকে উদ্ধার করবার জন্য! এরকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ডাক্তারি বিজ্ঞানে এত উন্নত দেশেও তাই মানতেই হবে, চিকিৎসা সমস্যা সমাধান একেবারে হয়নি। এবং অর্থগৃধ্নুতাই এই সমস্যা সমাধানের প্রধান বাধা।

চীনে সেদিন মেডিকেল হাসপাতালে বসে আমার মনে হচ্ছিল, এ-দেশ থেকে আমরা যদি আর কিছু নাও শিখতে পারি, অন্তত চিকিৎসাকে সহজলভ্য করে মানুষের যন্ত্রণার মুহূর্তগুলোকে একটু আরাম দিতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থাও তো আমেরিকার মতই ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছে। কেন? কারণ, চিকিৎসকরাও তো ব্যবসা করেন! কাজেই সেই প্রশ্ন আবার ফিরে আসে, "Where from correct ideas come?" কিন্তু correct ideas কি আমাদের দেশে ছিল না? আমার পিতার কাছে শুনেছি, তিনি যখন প্রফেসারি কাজ নিলেন তখন তাঁর জ্যেঠতুত দাদা প্রসিদ্ধ কবিরাজ ললিতমোহন কবিসাগর বলেছিলেন, এ ভালো হল না। আমরা তো বিদ্যা বিক্রয় করি না। তিনিও করতেন না। আমার পিতা দিনের পর দিন তাঁর অমূল্য সময় ছাত্রদের পড়িয়েছেন বাড়িতে কিন্তু কখনো টিউশানি করা কল্পনাও করেননি। যখন যৎসামান্য মাইনেয় চট্টগ্রাম কলেজে ছিলেন তখন কোনো বড়লোকের পুত্রের জন্য টিউশানির প্রস্তাব এলে তা প্রত্যাখ্যান করে বিনা মাইনেয় সানন্দে পড়িয়েছিলেন। সে ছিল অন্য যুগ কিন্তু এ যুগের মতও তো correct ideas চাই। সেটা হচ্ছে ছাত্রের মশাল। অধ্যাপককেও বাঁচতে হবে, মাহিনা চাই, কিন্তু টাকার জন্যই পড়ানো নয়, নোট বিক্রি, কোশ্চেন পেপার বিক্রি, এসব কাজ যে কোনো যুগেই অযোগ্য। এ অন্ধ গলি,-এখান থেকে পথ নেই।

হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে এইসব কথা আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। correct idea কাকে বলে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু দেখার কাকে। চাঁদসীর ওষুধের উপর রিসার্চ হোক, রিসার্চ হোক বহুবিধ প্রতিকার, রিসার্চ হোক ব্যাপকভাবে আয়ুর্বেদের। গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চাষীর ক্ষেতের কোণে কিছু ওষুধির চাষ হোক। ঔষধের দুর্মূল্যতার সমস্যা নিশ্চয় মিটে যাবে।

ঐদিন আমাদের হাসপাতাল থেকে বিদায় নেবার দিন। তাই আবার ঘরে গিয়ে বসা হল। টেবিলে সকলের সামনে চায়ের পেয়ালার পাশে পাশে আপেলের স্তূপ। এখানকারই বাগানের ফসল। জনে জনে ডাঃ কোটনিসের কথা বললেন। তিনি যে আন্তর্জাতিকতার আদর্শস্বরূপ, সে কথা বললেন। সেদিন কোচিন লানও কিছুটা স্মৃতি রোমন্থন করলেন। ডাঃ কোটনিস কিভাবে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করে দিবারাত্র পরিশ্রম করতেন সে-কথা বললেন। তিনি ডাঃ কোটনিসকে কমরেড কোটনিস বলে উল্লেখ করেছিলেন।

আমি বসে ভাবছিলাম—আমাদের দেশেও তো কত বিদেশী এসে আমাদের জন্য কত সেবা দান করে গেছেন, কতটুকু-কাকে মনে রাখি আমরা! আমাদেরও তো একজন বেথুন ছিলেন, যাঁর জন্য কিনা, বাঙ্গালীর মেয়ে আমি কলম ধরতে পেরেছি; কিন্তু কতটুকু তাঁদের স্মরণ রেখেছি আমরা! বেথুনের দুখানা ছবিও খুঁজে পাব না। ঐদিন আমাদের সকলকেই ডাঃ বাসু বলতে অনুমতি দিলেন। সকলেই ডাঃ কোটনিসের কথা বলছিলেন; আমি চীনা বন্ধুদের কথা বললাম। আমি বললাম যে, আপনাদের অন্তরে আন্তর্জাতিকতার রূপ এত স্পষ্ট বলে, বিশ্বভাবনার আদর্শ এত সত্য বলেই, আপনারা ডাঃ কোটনিসের এই স্মৃতিমন্দির তৈরি করেছেন। এতে আপনাদেরই চিত্তের ঐশ্বর্য প্রকাশ পাচ্ছে। ডাঃ কোটনিস মানুষের কাজ করেছিলেন কিন্তু সেকথা এত দুর্যোগের মধ্যে স্মরণ করে রাখা উচ্চতর মনুষ্যত্বের পরিচয় দিচ্ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে ফিরে আসার পর চীন সম্বন্ধে সর্বসমেত অন্তত পঁচিশটি (পরে সবসুদ্ধ একশত পাঁচ) জায়গায় বক্তৃতা করেছি। নানা লোকের নানা প্রশ্ন। সব প্রশ্নের উত্তর দেবার মত বিদ্যা অবশ্যই আমি সংগ্রহ করে আনতে পারিনি। এবং সব প্রশ্ন উত্তর দেবার যোগ্যও নয়। যেমন, একদিন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেখা করতে এলেন। তাঁর বিশেষ প্রশ্নটি ছিল,—চীনে প্রসাধনী (কস্‌মেটিকস) পাওয়া যায়? মেয়েরা কস্‌মেটিকস ব্যবহার করে? পাশ্চাত্ত্য জগতে এ প্রশ্ন কেউ করলে আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু এ-দেশে নয়। যে দেশ দারিদ্র্যের ভারে লুণ্ঠিত, অন্নবস্ত্রহীন, যে দেশের পথ চক্করে পীড়া ঘটায়, যাদের মন আছে তাদের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে। যে দেশে লেখাপড়া শিখেও সামান্যতম চাকরির জন্য ঘুরে ঘুরে জুতো ক্ষইয়ে ফেলছে কর্মক্ষম যুবকরা, আর নব্বই কোটি লোকের দেশ চীনে একজনও বেকার নেই—যে চীন কিনা অল্প দিন আগেই আমাদের চেয়েও দরিদ্র ছিল, সে চীন দেশ সম্বন্ধে যদি আমাদের এই জিজ্ঞাসা হয় যে, সেখানে মেয়েরা কস্‌মেটিকস ব্যবহার করে কিনা, তবে প্রশ্নের দৈন্যে, জিজ্ঞাসার এই সঙ্কীর্ণতায় মন ব্যথিত হয়। এ প্রশ্ন কিন্তু আরো অনেকে করেছে। কয়েকটি কুইলীন ফুলের সুগন্ধি এনেছিলাম—বিদেশ থেকে বন্ধুদের জন্য। ঐ উপহার সুবিধা—ভার কম, কিন্তু অন্তরকে স্পর্শ করে বেশী। তাই শুনে কোনো শিক্ষিতা মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন,—অ্যাঁ, চীনে পারফিউম পাওয়া যায়!—বা হোক, এই প্রশ্নটির উত্তর আমি তাঁদের ভালো করে দিইনি, এখানে দিচ্ছি। আমি দোকানে অনেক কসমেটিকস দেখেছি, কিন্তু কাউকে ব্যবহার করতে দেখিনি। শুনলাম একমাত্র অভিনয়ের সময় রং মাখে, তা বেশীরকমই মাখে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দূরের কথা, ছেলেসভাতেও মাখে না। আমার সাহিত্যিক প্রশ্নকর্তা বলেছিলেন, তিনি জানেন যে, হংকং থেকে স্মাগলড হয়ে কসমেটিকস চীনে যায়। যদি কেউ কিছু জানে, তবে যে জানে না সে তাকে কি বলতে পারে? কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যারা স্মাগলড করে নিয়ে যাবে তারা কি উদ্দেশ্যে নেবে? মাখবে কে? এখানে একটা কথা বলা ভাল যে, আমেরিকায় তো বটেই, এমন কি ইংল্যাণ্ডেও বর্তমান প্রজন্মের মেয়েরা রং মাখে না—কসমেটিকস ব্যবহারই করে না। বুড়ীরা মাখে। তাদের অনেক দিনের অভ্যাস ছাড়তে পারে না। কিন্তু আধুনিক মেয়েরা ছেলেদের মত পোশাক পরে। 'উইমেনস লিব' বা বর্তমানে নারীমুক্তি আন্দোলনের ওটাও একটা বক্তব্য যে, পুরুষের লীলাসঙ্গিনী হবার জন্য বেশভূষার ঐ অভিনব বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নেই। এটা মনে রাখতে হবে যে, কাপড়-চোপড়ের ফ্যাশন বদলে লাভবান হয় কে? ব্যবসায়ীরা। তারাই তাই আজ ম্যাক্সি, কাল মিনি, টপলেস, বটমলেস করে বোকা মেয়েদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়। ইয়োরোপেও খুব শুনতাম যে, রাশিয়ান মেয়েরা সাজে না। কমিউনিস্টরা মেয়েদের দিয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে তাদের কমনীয়তা দূর করে দিচ্ছে। সাজ-সজ্জা বন্ধ! শুনে শুনে বোধ হয় রুশদের লজ্জা হল। ওদের দেশে সোভিয়েট উইমেন বলে একটি পত্রিকা বের হয় তাতে ফ্যাশানের চর্চা শুরু হল। প্যারীর মত না হলেও নূতন নূতন ফ্রকের ডিজাইন দেখা যেতে লাগল। বছর দশ পনেরো আগে ঐ পত্রিকার মহিলা সম্পাদিকা কলকাতা ভ্রমণে এসেছিলেন। তখন তাঁর সম্মানার্থে একটি বিরাট মিটিং হয়। 'সোভিয়েট উইমেন'-এর পাঠিকাদের কাছে তিনি সমালোচনা শুনতে চান। তিনি বলেন, 'ঐ পত্রিকার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বলুন, যাতে আমরা তা সংশোধন করতে পারি।' সাধারণভাবে এ-কথার উত্তরে ত্রুটিবিচ্যুতির কথা কেউ বলে না। ভদ্রতা তো আছে। শ্রীমতী গীতা মুখার্জি তো একটি উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা দিলেন। প্রায় স্তবগান বললেই হয়। দুর্মুখ আমি ভাবলুম, জানতে যখন চেয়েছে তখন একটু বলাই ভালো। আমি বললাম, অপরাধ নেবেন না। আমার প্রশ্ন এই যে, আপনারাও কেন মেয়েদের পত্রিকায় আমেরিকা ইয়োরোপের মত ফ্যাশন প্যারেড শুরু করেছেন? পোশাকের ব্যবহার বা বৈচিত্র্যের উপর এত মূল্য আরোপ করা তো আপনাদের নীতি নয়। এখানে বলে রাখা ভালো, তখন আমি "রিভিশনিজম" ইত্যাদি বুলি কিছুই শুনিনি। আমার প্রশ্নটি যথার্থই স্বাভাবিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তরিক ছিল।

ফ্যাশন বদলের ব্যাপারটা একেবারেই ব্যবসায়ের জগতের কারসাজি। তার উপর নারীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য কিছুই নির্ভর করে না। ঝান্সির রাণী কাছা দেওয়া শাড়ি পরে যুদ্ধ করেছিলেন, আজও মহারাষ্ট্রের মেয়েরা সেই পোশাকই পরেন। তাতে তাঁদের মাধুর্য লালিত্য অক্ষুণ্ণ আছে। হাজার বছর ধরে বাঙালীর মেয়ে লালপেড়ে শাড়ি ও সিঁদুর পরে জননী ও জায়ারূপে মঙ্গলে সুন্দরে মিলে-মিশে আছে। মাও-সে-তুং বলেছিলেন—এসো নারী, তুমিই অর্ধেক আকাশ। কোন নারীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি? সে চিত্রাপ্সদা। "কোথা সে রমণী বীর্যবতী!" এই বীর্যবতী রমণীরা চীনদেশে পুরুষের পাশে কঠিন কর্মক্ষেত্রে সমমর্যাদায় সমদক্ষতায় সসম্মানে নিজের কাজে নিযুক্ত আছে। ওখানে উইমেনস লিবের কথাটা হাস্যকর শোনাবে।

যা হোক, কসমেটিকসের কথাটা যখন উঠেছে তখন এইখানে সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাটা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করে দিই।

খুব ঠাণ্ডার সময় কারু কারু বেশী গরম জামা পরলে যা না পরলেও সমস্ত শরীর ফেটে ফেটে যায়। তখন সারা গা অসহ্য চুলকায়। ১৯৭৫-এর সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে আমার ঐ রকম হয়েছিল। সে এত কষ্টকর যে, কোথাও স্থির হয়ে বসা যায় না। আমাদের দেশে অল্পস্বল্প গা ফাটে, তেল বা গ্লিসারীন মাখলে সেরে যায়। কিন্তু ওখানে তা হল না; প্রাণান্তকর কষ্ট হচ্ছিল। তখন একজন ইংরেজ মহিলা আমায় একটি লোশন দিলেন, তার নাম "অয়েল অফ উল্লা"। যাঁরা বিলিতী প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করেন তাঁদের এ বস্তুটির সঙ্গে পরিচয় আছে। ঐ প্রসাধনী ব্যবহার করে দু-দিনের মধ্যে আরাম পেলাম। যেন আগুনে জল পড়ল। চীনে এসে অবধি আবার ঐরকম কষ্ট পাচ্ছিলাম। একে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তায় ঝকঝকে বাতাস, সমস্ত শরীরের ভিতরটা ফেটে প্রায় কুমীরের চামড়ার পরিণত হয়েছিল। দু-দণ্ড বসে কোনো কথায় মন দিতে পারছিলাম না। সিজিয়াচুয়াং-এ অগত্যা আমি সু-কে বললাম, 'সু' তুমি কোনো হ্যাণ্ড লোশন ব্যবহার কর? সে বলল, সে কোনো দিন ওসব পদার্থ ব্যবহার করে না। তবে দোকানে গেলে আমি নিজে দেখে কিনে নিতে পারব। গেস্ট হাউসের সঙ্গেই ছোট্ট 'সুভেনির শপ' আছে সেখানে গেলাম। ভাষার অভাবে কোন বস্তু কি, তা বুঝে ওঠা শক্ত। জবাকুসুমের শিশির মত আয়তনের ছোট একটি শিশিতে সাদা একটি ক্ষীরের মত পদার্থ দেখে মনে হল, আমি যা চাই এটা সেইরকমই কিছু। কিনে ফেললাম সাহস করে এবং ব্যবহার করে আশ্চর্য হলাম। অয়েল অফ উল্লার চেয়েও কার্যকরী। অচিরে আমার জ্বালাযন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। এ কাহিনী লেখবার উদ্দেশ্য এই যে, ওখানে যেসব প্রসাধনী তৈরী হয় সেগুলি গুণগতভাবে বিলাতী জিনিসের সমতুল্য তাতে সন্দেহ নেই এবং বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। চীনে যেসব জিনিস তৈরী হয় তার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। দেশের জিনিসে ভেজাল দেওয়া যে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া এটুকু correct idea ও দেশের নেতৃবৃন্দ তাদের মাথায় ঢোকাতে পেরেছে।

১১ই সকালে সিজিয়াচুয়াং থেকে কিছু দূরে আমরা একটা কমিউন দেখতে গেলাম। যাবার আগে আমি বেশ কায়দা করে ক্যামেরাটা গলায় ঝুলিয়ে নিলাম। আসল কথা, আমি একেবারে ছবি তুলতে জানি না। ছবি তোলা দূরে থাক, কোনো যন্ত্রই আমার হাতে চলে না। সুটকেসের তালা বন্ধ তালা খোলা তাও আমার পক্ষে ভীতিপ্রদ। যতদিন আমার স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণে যেতাম ততদিন কোনো ভাবনা ছিল না। তারপর যখন থেকে আমার একলা চলার পা গজিয়েছে তখন থেকে ভয়ে ভয়ে থাকি—কোথায় ঘরে বন্ধ হয়ে যাব, তালা খুলতে পারব না, কিংবা সুইকেস আটকে যাবে—কে জানে। সেই আমি যাবার আগে পুত্রের ক্যামেরাটি নিয়ে খুব তালিম দিয়েছি—খাতায় ভাল করে লিখেও নিয়েছি কিভাবে কি করতে হবে। যদিও অনেকেই বলেছিল, চীনে ওরা ছবি তুলতে দেবে না। চীন সম্বন্ধে বা কমিউনিস্ট দেশ সম্বন্ধে যেসব প্রচলিত ধারণা আছে তার মধ্যে এটি একটি; অথচ, আমাদের দেশেই বোধ হয় ছবি তুলতে গিয়ে বিদেশীদের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে অনেকবার।

দীনেশ আমার ক্যামেরা দেখে খুব খুশী হল। সে বলল, খুব ভালো হয়েছে—আমিও একটা ক্যামেরা এনেছি, তবে এটা অন্যের, ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অনেকের ধারণা, কমিউন মানে একটা বাড়ি—যাতে অনেকে একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে খায়, এ ওর জামা পর্যন্ত পরে চলে যায়, কারণ নিজের বলে কিছু নেই। হয়তো এরকম ধারণা জন্মাবার গোড়ায় কোনো কারণ ছিল ; এখন অবশ্য কথাটির অর্থ অন্য। এটি একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভাগ। যে-কোনো গ্রামে সর্বনিম্ন বা সর্বপ্রথম প্রশাসনিক স্তর হচ্ছে টিম বা দল—এর একজন টিম লিডার থাকে—সে নির্বাচিত হয়। তারই নির্দেশে টিমটির কার্য নির্ধারিত হয়। তার উপর প্রডাকশন ব্রিগেড—কয়েকটি টিম নিয়ে একটি ব্রিগেড। তার উপরে অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে হচ্ছে কমিউন—কয়েকটি ব্রিগেড নিয়ে একটি কমিউন। তারপর কাউণ্টি বা ডিস্ট্রিক্ট্। তারপর কয়েকটি ডিস্ট্রিক্ট্ নিয়ে একটি প্রিফেকচার। তার উপর প্রভিনসিয়াল গভর্নমেণ্ট ও তার উপর সেণ্ট্রাল কমিটি। এই হচ্ছে শাসনব্যবস্থার বিভাগ।

আমরা যেখানে গেলাম সেটির নাম টুঙ্গুতাং প্রডাকশন ব্রিগেড ও পিপলস কমিউন। সিজিয়াচুয়াং থেকে কয়েক মাইল দূরে এই গ্রাম। শুকনো পপলার-শ্রেণীর মধ্য দিয়ে গিয়ে আপেল-ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ধুলার ঝড় তুলে গাড়ি চলল। একরের পর একর আপেল-বাগান। শীতের বাতাসে পাতা ঝরিয়ে শুকনো কালো কালো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। একটি দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। উপরে একটি হল-ঘরে সেই একইভাবে বিরাট লম্বা টেবিলের দুধারে, বসবার জায়গা হয়েছে। প্রত্যেকের চেয়ারের সামনে টেবিলে আট-দশটি করে সুপুষ্ট আপেল ও ছুরি। ভেজা তোয়ালে ও চা তো আছেই।

তারপর সমস্ত খবরাখবর দিতে শুরু করলেন ওখানকার রেভলিউশনারি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান (ইনি স্ত্রীলোক)। তাঁর নাম লি চি চেন। প্রডাকশন ব্রিগেডের রেভলিউশনারি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান (ইনিও স্ত্রীলোক) প্রভৃতি কর্তাব্যক্তিরা আমাদের ঐ স্থানীয় কমিউন, ব্রিগেড ও প্রডাকশন টিম সম্বন্ধে যথারীতি ওয়াকিবহাল করতে লাগলেন। এইরকম বলবার সময় আমরা সকলে খাতা পেনসিল নিয়ে তৈরি হয়ে পড়ি। অবশ্য সকলে নয়। তারাচাঁদ গুপ্ত, মণ্ডেল কোটানিস পাতার পর পৃষ্ঠা লেখেন ; ইন্দিরা বসু প্রায় কিছুই লেখেন না। তাঁর পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য—তাঁ বসু একটু আধটু লেখেন। তিনি তো সবই জানেন। বেচারা ঘিংড়া লেখবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর ইনটারপ্রেটারও তাঁর কথা বোঝে না, তিনিও ইণ্টারপ্রেটারের কথা বোঝেন না। এ অবস্থায় সীতা ও হনুমানের বাক্যালাপের মত অবস্থা হয়। দীনেশ একটু একটু লেখে, আর এদিক ওদিক চায়। আমারও সেই অবস্থা। একটা কথা ভালো করে বুঝতে না-বুঝতে অন্য কথায় চলে যায় আলোচনা। সবচেয়ে উদাসীন শ্রীশ্রীমহাকবি। তিনি প্রায় কখনই কিছু লেখেন না, কারণ তাঁর কাছে কাগজ কলম কিছুই থাকে না। হারিয়ে ফেলেন।

আজ তাই নোটবই-এর খাতা উল্টিয়ে বড়ই হতাশ লাগছে—যত কথা হয়েছিল তার সিকিও লিখে উঠতে পারিনি। সেই কোন জন্মে ক্লাসে নোট নিতাম, আর এখন কি পারি! নোটের বহর কমিয়ে আমি এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা যে গ্রামের মানুষ তা বোঝা যায়। পিকিং শহরের লোকেদের চেয়ে এঁদের চেহারায় পোশাকে পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রত্যেকেই খুব স্মার্ট, তৎপর এবং আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন। এতগুলি বিজাতীয় লোক দেখে এতটুকু ঘাবড়ায়নি। তাদের বক্তব্য একে একে বলতে শুরু করল। এই গ্রামে পাঁচ শত নয়টি পরিবার বাস করে। মোট লোকসংখ্যা ছয় হাজার তিন শত ছত্রিশজন। ছয়টি প্রডাকশন টিম নিয়ে এই কমিউন। এখানে রয়েছে ফলের বাগান। বিবিধ পশুপক্ষীর চাষ। এ ছাড়া চাষ হচ্ছে এক হাজার সাত শত বত্রিশ মো জমিতে (ছয় মো জমিতে এক একর। তিন বিঘায় এক একর। অতএব পাঠকরা হিসাব করে নিন। আমার পক্ষে অঙ্ক যত কম কষতে হয় ততই ভালো।) এক হাজার পাঁচ শত আটষট্টি মো জমিতে রয়েছে ফলের বাগান। অর্থাৎ আপেলের বাগান। সেই আপেলই আমাদের সামনে স্তূপ করা ছিল—আমরা খাচ্ছিলাম। বইয়ে দেখেছি শুকনো আপেলের গাছ। ওরই মরা ডালে কখন ফুল ফুটেছিল, কখন ফল ধরেছিল, কে জানে। এখন তো তার চিহ্ন নেই। আমার কেবল মনে হতে লাগল, এত আপেল তুলে ফেলে রাখল কোথায়? নোট লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছি, আপেলগুলো আবার ইঁদুরে খাবে না তো! আমি ফিসফিস করে চৌকে জিজ্ঞাসা করলাম—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল। উত্তরে জানলাম—আমরা যেখানে বসে আছি ঠিক তার নিচেই আপেলের মজুতখানা। ইঁদুরের বা অন্যান্য জীবের উৎপাত নেই। তাদের সব খতম করা হয়েছে। একবার এইসব "ফোর পেস্টস"-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাদের নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছে। তারা হচ্ছে, মাছি ইঁদুর মশা ও টুনটুনি।

শুনে যে কি আরাম পেলাম! আমাদের দেশে নাকি এক-চতুর্থাংশ ফসল এইসব প্রাণীর পেটে যায়। হনুমান এসে আম কলা পেঁপে মুচড়ে শেষ করে দেয়। কিন্তু হনুমান মারবে কে? সে তো রামের সেবক—হনুমানের তো পুজো হবে! আর ইঁদুরের তো পুজো হয়! কলকাতায় কার্জন পার্কের মধ্যে ইঁদুর-দেবতার পীঠস্থান ছিল। হাজারে হাজারে ইঁদুরকে জৈনরা খাদ্য দিয়ে পুষত। তাতে তাদের পুণ্য হত। এই দৃশ্য ছবি তুলে বিদেশে দেখাবার পর নাকি কার্জন পার্ক ইঁদুরমুক্ত করা হয়েছে। কারণ বিদেশে সে ছবি দেখে আমাদের লজ্জা হয়েছিল, তার আগে অত খেয়াল হয়নি। আবার যারা ছবি তুলেছে তাদের উপর খুব রাগও হয়েছিল। নিন্দনীয় কাজ করতে লজ্জা নেই, সেদিকে আঙুল দেখালেই রাগ। রাজস্থানে নাকি ইঁদুরের মন্দিরই আছে। থাকবে না কেন, ওরা যে সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন! তাই সেখানে রীতিমত ইঁদুর পুজো হয়, ভোগ দেওয়া হয়। এম-পিরাও পুজো দেন, প্রসাদ পান কি না জানি না। অন্তত ইঁদুরভক্তদের ভোট পান!

লি-চি-চেন বলছিলেন, এই স্থানটি রেভলিউশনের পূর্বে একেবারে বন্ধ্যা ছিল। দশ বছরের মধ্যে নয় বছরই শস্য ভালো হত না। উত্তর দিকে একটি নদী আছে, তার জল ভেসে এসে জমি স্যাঁতসেঁতে করে রাখত। জমি ছিল অসমতল—উঁচুনিচু। জল নিষ্কাশনের পথ ছিল রুদ্ধ। মাঝে মাঝে বন্যাও হত। কাজেই মোটামুটি শস্য নামমাত্র পাওয়া যেত। চৌদ্দটি জমিদার বা জোতদার ছিল—সমস্ত জমির অর্ধেকটাই তাদের অধিকারে ছিল। মহাজনদের কাছে দেনার দায়ে সাধারণ মানুষ বিকিয়ে থাকত। চব্বিশটি পরিবার খেতে না পেয়ে গ্রাম থেকে চলে গেল; ষোলটি পরিবার অনাহারে মরে যায়। সাঁইত্রিশজন মজুর জমিদারের জমিতে বরাবর দাসত্ব করত। আর, বেগার কাজের সময় এক শ' সাঁইত্রিশজন কাজ পেত। স্বাধীনতার পরে পার্টির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে আমরা জমিদারি প্রথা শেষ করে দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য 'টিম' বা দল গঠন করি। ১৯৫৫ সালে ছোট ছোট কো-অপারেটিভ গঠিত হতে থাকে। ১৯৫৮ সালে পিপল্‌স্ কমিউন হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্ত জমি তখন সকলের, কয়েকজনের কো-অপারেটিভ নয়। এইভাবে একত্রিত হয়ে কাজ করতে করতে আমরা আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের পরাজিত করেছি। আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর আদর্শ সামনে রেখে চলেছি বলেই। তাঁর আদর্শ সামনে রেখে আমরা একত্রভাবে সমগ্র গ্রামটির উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছি। আমরা শত শত গাছ লাগিয়েছি বাতাস আটকাবার জন্য—ঠাণ্ডা বাতাসে শস্যের ক্ষতি হয় বলে গাছের পর্দা গজিয়ে দিয়েছি বিস্তৃতভাবে। উঁচুনিচু জমি সমস্ত সমতল করে ফেলেছি—যাতে জল না আটকায়। প্রতি বছর শস্য উৎপাদন বেড়ে গেছে। ১৯৫৮ সালে এক মো জমিতে দুই শত চুয়ান্ন কিলোগ্রাম শস্য হল। এটা মুক্তির আগে যা হত তার ডবলেরও বেশী।

আমি বিস্মিত হয়ে চাষী মহিলার বক্তৃতা শুনছিলাম। কি দার্ঢ্য ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি এতখানি রাজনীতি বলছিলেন। শুধু যে তথ্য জানেন তাই নয়, তত্ত্বও জানেন। আমি ভাবলাম, নোট লেখা ছেড়ে এবার এঁর একটা ছবি নিই। মনের কোণে সেই ভয়টা উঁকিঝুঁকি মারছিল যে, ছবি তুলতে গেলে কেউ কিছু বলবে না তো! যাই হোক, পুত্রের নির্দেশগুলি মনে করে করে তিন-চারটি ছবি তুললাম। এক ভদ্রলোক আপেল খাচ্ছিলেন তাঁর বাদিত মুখের মং মনোযোগ সহকারে আমাকে আপেল কেটে দিচ্ছিল তাঁর এবং বক্তৃতাকারিণীর। মহিলা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে যেমন বলছিলেন বলে যেতে লাগলেন। তিনি যে শুধু তাঁদের কমিউনের উৎপন্ন দ্রব্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তা নয়, রাজনীতি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল। এইসব কমিউনে রীতিমত রাজনীতির ক্লাস হয়, আলোচনা হয়। অন্যের সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা দুই-ই হয়। প্রত্যেকটি গ্রামের কমিউনে উচ্চতম রাজনীতির বিশ্লেষণ ও আলোচনা প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার। এবং সুযোগ পেলেই এরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেভাবে রাজনীতি আলোচনা করে তা আমি অন্য কোনো দেশে দেখিনি। আমেরিকায় রাজনীতি সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই উদাসীন। আর, সোভিয়েট দেশে একেবারে নিশ্চুপ। সহজে কেউ মুখই খোলে না। ভদ্রমহিলা বলতে লাগলেন—কালচারাল রেভলিউশনের সময় অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে লিউ শাও চি (ইনি তখন চীনের দ্বিতীয় নম্বর। অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি।) যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা রিভিসনিস্ট পথ—অর্থাৎ ক্রুশ্চেভের নীতি। তিনি আবার ব্যক্তিগত জমি রাখার দিকে, ব্যক্তিগত বেচা-কেনার পরিধি বাড়াতে, ব্যক্তিগত কল-কারখানা ও নানা উদ্যোগের সূচনা করতে চলেছিলেন। জমির জন্য মজুর খাটানো, সুদ খাটানো, জমি বেচা-কেনা—এসবের আবার সূত্রপাতের চেষ্টায় ছিলেন। আমরা তাঁর পথ গ্রহণ করলাম না। আমরা আলোচনা করে দেখলাম তা হলে আমরা যে দুর্গতিতে ছিলাম, ক্রমে সেই দুর্গতিতে ফিরে যাব। সকলে মিলে কাজ করে একত্রিত শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বণ্টনে আজ আমরা সুখী, আমাদের কোনো অভাব নেই। আমরা চাই যাতে 'ডিকটেটরশিপ অফ দি প্রলিটেরিয়ট' কায়েম থাকে। ভদ্রমহিলা হিসাব দিতে লাগলেন—১৯৭৪ সালে আমরা মো প্রতি শস্য পেলাম ছয় শত আটানব্বই কিলো। ১৯৭৫ সালে আট শত ষাট কিলো, ১৯৭৬ সালে আট শত বাহাত্তর কিলো। আমরা এক মিলিয়ন সাত হাজার ক্যাট্টি (এই মাপটা জানি না) শস্য সরকারকে গত দশ বছরে দিয়েছি, আর প্রতি বছর পাঁচ মিলিয়ন ক্যাট্টি সবজি সরকারকে দিই। রেভলিউশনের আগে দু হাজার তিন শ' ক্যাট্টির বেশী উৎপন্নই হত না। হিসাবগুলি ঠিকমত বুঝতে একটু হোঁচট খাচ্ছিলাম। কারণ, অঙ্ক শুনলে আমার মাথা ঘোরে। তবে এটুকু বুঝলাম যে, একেবারে অহল্যা-মাটি প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। এবং যেমন এক দিকে একত্রিত শ্রমদান তেমনি অন্য দিকে মাটির দান দু হাত ভরে তুলে নিচ্ছে।

ভদ্রমহিলা বলেই চলেছেন, গত বছর আমরা দেড় মিলিয়ন কিলো ফল তুলেছি। প্রডাকশন ব্রিগেড দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার গাছ লাগিয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাইরে বেরিয়ে আমরা প্রডাকশন ব্রিগেডের কাজ দেখতে গেলাম। ছোট ছোট কামার-শালায় ঐ গ্রামের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে। তারপর সুতাকলে গেলাম। সেখানে সুতা ও বস্ত্র তৈরী হচ্ছে। ছোটখাটো ব্যাপার, কিন্তু গ্রামের অনেক কাজ চলে যায়। ইটের ভাঁটিও দেখলাম—স্ত্রী-পুরুষ পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরে কাজ করে যাচ্ছে। একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরীও দেখলাম। গ্রামে সিমেন্ট তৈরীর হচ্ছে। তা ছাড়া উদ্বৃত্ত সরকার কিনে নিচ্ছে। পরিচ্ছন্ন পথঘাট, নানারকমের তরুশ্রেণী, নানারকমের লোক নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছে—সমস্তটা নিয়ে গ্রামের একটি পরিপূর্ণ সুন্দর ছবি।

দেখতে দেখতে আমার হঠাৎ একদিনের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় গান্ধীশিষ্য সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত—কমিউনিস্টদের উপর খুব বিরূপ ছিলেন; এখনও আছেন কি না জানি না—একবার শ্রীনিকেতনে আমাদের কমিউনিজমের বিপদ বোঝাচ্ছিলেন। বছর কুড়ি আগের কথা, তার বেশী নয়। গল্পচ্ছলে তিনি বলছিলেন, যদি কমিউনিজম আসে তা হলে কি হবে জানো? আজ যারা তোমাদের সেবা করছে তখন তোমাদের তাদের সেবা করতে হবে। রুশ দেশে এমন হয়েছিল যে, ভৃত্যরা মিটিং করে গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে প্রভুপত্নীকে ঘুম ভাঙিয়ে বললে—চা কর, বড় ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে! শুনেই কল্পনা করার চেষ্টা করেছিলাম—আমার পুরাতন ও প্রিয় ভৃত্য জগবাহাদুর মধ্যরাত্রে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলছে, 'মেম সাব, লেবং থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি, মিটিং করে ক্লান্ত—একটু চা বানান', তা হলে কেমন হয়! তখনই ব্যাপারটার অসম্ভাব্যতায় ভীতি উড়ে গিয়ে হাস্যের উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু আজ মনে হয় ব্যাপারটা এত অসম্ভবই বা কি, খারাপই বা কি! ভাগ্যক্রমে যারা আমাদের চেয়ে অনেক বঞ্চিত, যারা চিরদিন আমাদের সেবা করে এসেছে, আমরা যদি তাদের সেবা করার কোনো সুযোগ পাই সেটা তো ভালোই! ত ছাড়া ওদের অসুখ হলে আমরা সেবা করিও। বিশেষ করে খেলাঘরের (অনাথ আশ্রম) কল্যাণে আমাদের এমন অনেক কিছুই আজ আনন্দের, যা আগে ধারণারও অতীত ছিল। এই খেলাঘরের খেলায় যাঁরা মেতেছেন তাঁদের কারু পক্ষেই আজ রাস্তা থেকে ধুলোকাদা-মাখা সর্বাঙ্গে পাঁচড়া বা ঘা এরকম পরিত্যক্ত শিশু কোলে তুলে নেওয়া বিন্দুমাত্র ঘৃণার বিষয় নয়, বরং গৌরবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্তু। আজ যদি আমার সেই পুরোতন ভৃত্য অশা দিনে, রাতে বা যে-কোনো সময়ে এসে বলে, মা আমাকে একটু খেতে দিন, তা হলে আমার পুত্রেমুখ দেখার সুখ হবে এবং অনায়াসে আমি তাকে রান্না করে খাওয়াব। সমস্তটাই নির্ভর করছে আমরা কি চোখে এই বৈচিত্র্যময় মানব-সম্বন্ধকে বিচার করব। শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র আরো বলেছিলেন, যত দূর মনে পড়ে কোনো বই থেকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, এই যে একটি গাছের তলায় ঝুরঝুরে হাওয়ায় তাঁতী বসে তাঁত বুনছে, কামার কামারশালায় কাজ করছে, ছুতোর চাষী সবাই শান্ত মনে যে যার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে শান্ত জীবনযাপন করছে—এসব উড়ে চলে যাবে ; পরিবর্তে এক অশান্ত হিংস্রতা তাণ্ডব করে বেড়াবে। কথাগুলি ঠিক এই কি না আমার মনে নেই, তবে ভাবটা এই। আজ আমার ভারি ইচ্ছা করছিল এই স্বয়ংসম্পূর্ণ সফলা সুফলা গ্রামটি যদি তিনি দেখতেন তা হলে আমার চেয়ে অনেক বেশী সুখী হতেন। কারণ, তিনি নিজেও এখন একটা বড় কাজে নিযুক্ত আছেন, অহল্যা-মাটিতে হলধর হয়েছেন।

এইসব ভাবতে ভাবতে দেখতে দেখতে চলেছি, হঠাৎ দেখি দীনেশ ও লী আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে কি বলছে। লী বললে,—মিসেস্ দেবী, তুমি যে ছবিগুলি তুলেছ তার একটাও উঠবে না—আমি তো চমকে উঠেছি,—কেন ?—সোজা কারণ এই যে, তুমি লেন্স অ্যাডজাস্ট করেছ, দূরত্ব ঠিক করেছ, অনেক হিসাব করেছ—শুধু শাটারটা খোলনি !—অ্যাঃ, অ্যাঃ !—দীনেশও মুচকি মুচকি হাসছে, আর দেশলাইকাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। এই ওর এক বদ অভ্যাস। কি করে যে দাঁতগুলো এখনও আছে জানি না !—দীনেশ, দাঁত খোঁচানো বন্ধ কর—কেন তোমরা আমাকে বলনি ! লী, তুমি কি বিশ্বাসঘাতক !—ওরা বলতে লাগল অত দূর থেকে অর্থাৎ টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে আমাকে বোঝানো যেত না। আসবার সময় আমার প্রজ্ঞাবান পুত্র আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, মা শাটার খুলতে ভুলো না। কি আর করা যাবে ! জীবনে অনেক কিছুই হারিয়ে যায়—টুংশু কমিউনের সেই আপেল-ঢালা টেবিলটার স্মৃতিচিহ্ন রাখা গেল না।

সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী দেখে বেরুতে বেরুতে শুনলাম এই গ্রামে যেটা একটা স্যাঁতসেঁতে বাসের অযোগ্য স্থান ছিল সেখানে পাঁচশোটি বাড়ি তৈরী হয়েছে। সম্পদও জমা হয়েছে কম নয়। এক হাজার সাতাত্তর মিলিয়ন ইউয়ান মজুত আছে। এ ছাড়া আছে চল্লিশটি ট্রাক্টর, চারটি ট্রাক, পঁচাশিটি ডিজেল পাম্প এবং আরো নানারকম শতাধিক যন্ত্রপাতি। প্রত্যেক বাড়ির নিজেদের উদ্বৃত্ত শস্য জমা আছে। চীনা ওষধির চাষ ও তার থেকে ঔষধ নিষ্কাশনের কারখানা রয়েছে।

আমরা একটি কো-অপারেটিভ মেডিকেল সেণ্টার দেখতে গেলাম। তিন-চারখানি সাদামাটা ঘরে ডিসপেনসারি, চারটি বেড ও একটি ঘরে আউটডোর রুগীদের দেখার ব্যবস্থা। অন্য একটি বড় ঘর পুরোপুরি আয়ুর্বেদীয় ঔষধে-ভরা। ঐখানে আমি প্রথম বেয়ারফুট ডাক্তার দেখলাম। ছেলেটি ঐ গ্রামেরই ছেলে—শহরে গিয়ে কয়েক মাসের শিক্ষানবিশি করে এসেছে। অল্পস্বল্প ডাক্তারি করতে পারে ; হার্টের রুগী বা কঠিন রুগী হলে শহরে নিয়ে যায়। আমি তার পায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি 'বেয়ারফুট ডাক্তার', তোমার পায়ে জুতো কেন ?—অবশ্যই বর্ষাকালে গ্রামের ভিতরে যেখানে রাস্তার কাদা হয় সেখানে জুতো তাকে খুলতে হয়, কিন্তু বেয়ারফুট ডাক্তার মানেই খালিপদ ডাক্তার নয়। রুমানিয়ার প্রসিদ্ধ লেখক জাহারিয়াস্তানকুর একটা প্রসিদ্ধ গল্প আছে, তার নাম 'বেয়ারফুট'। সেটি একটি নিঃস্ব বালকের কাহিনী। চীনের বেয়ারফুট ডাক্তাররা বেয়ারফুটও নয়, নিঃস্বও নয়। বেয়ারফুট ডাক্তারদের শিক্ষানবিশির সময় তিন মাস থেকে এক বছর। কখনো তারা শহরে গিয়ে শিখে আসে, কখনো শহর থেকে ডাক্তার এসে তাদের শেখায়। যে সময় ডাক্তারী কাজ থাকে না, তারাও ক্ষেতে-খামারে নেমে পড়ে এবং অন্য কর্মীদের মতই 'Work Point' পায়।

বেয়ারফুট ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা হলে পর আমরা গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে গেলাম। এক বাড়িতে এত লোক একসঙ্গে না গিয়ে দুজন তিনজন করে ভাগ করে গেলাম। আমি যে বাড়িতে গিয়েছিলাম সে বাড়িতে শুধু গৃহিণী ছিলেন, আর সবাই কাজে গেছে। একটি ছোট উঠোনকে ঘিরে সর্বসমেত আটখানি ঘর। আমরা একটি শোবার ঘরে বসলাম। প্রকাণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তক্তপোশে ঢালা বিছানা। চীনে সর্বত্রই দেখেছি বিছানার একপাশে লেপ ভাঁজ করা থাকে এবং লেপগুলির খুব সুন্দর প্রিন্ট। পোশাকের চেয়েও অনেক সুন্দর। মনে হয় যেন ওদের সব শৌখিনতা ঐ লেপে। এবং ওয়ার-ছাড়া লেপ এত ঝকঝকে কি করে থাকে তাই ভাবি। কিন্তু এরকম সর্বত্র দেখলাম। এমন কি, জেলেও। যা হোক, ঐ তক্তপোশ বা কাঠের তক্তা ইঁটের ঘাটির উপর বিছানো। নিচেটা ফাঁকা। সেখানে আগুন জ্বালানো থাকে। সারা রাত ধিকিধিকি আগুন জ্বলে বিছানা গরম রাখে। আমাদের কাঁচের গ্লাসে গরম চা দিলেন ও ভদ্রমহিলা অতীতের দুঃখ-কাহিনী বলতে লাগলেন। তাঁর শ্বশুর শোথ রোগে ভুগতেন, কিন্তু জমিদারের লোকেরা জোর করে হিঁচড়ে নিয়ে যেত এবং কাজ করতে না পারলে প্রহার করত। তখন ওদের সাত-আটজনের পরিবারে একখানি ঘর ছিল—তাও ভাঙাচোরা। এখন এতগুলি ঘর—প্রত্যেকে কাজ করছে। ঘরে তাঁর রেডিও, এবং সব দেশের অল্পশিক্ষিত মানুষের ঘরের মতই দেওয়ালে প্রচুর ক্যালেন্ডার। আমার তাসখন্দের একটি চাষীর বাড়ি মনে পড়ল। এখানে যেমন সুন্দর লেপ সেখানে তেমনি সুন্দর সুন্দর কার্পেটের বোঝা দেখেছিলাম, আর ঝকঝকে সামোভার। আমাদের চাষীর ঘরে আগে সুন্দর সুন্দর কাঁথা থাকত শুনেছি, এখন আর কিছু নেই। ভালোমত ঘরই বা ক'জনের আছে। আমি যে গ্রামে বেশির ভাগ থাকি সেখানে রাস্তার ওপারে চার-পাঁচটি সন্তান নিয়ে একটি কুঁড়ি বেঁধে যে মুচি পরিবার বাস করে তাদের শতচ্ছিন্ন কাঁথার কথা মনে পড়ে আমার বুকের ভিতরটা মোচড় দিতে লাগল। প্রচণ্ড শীতের রাতে শিশুগুলি ও তাদের পিতা সমানে কাশে। আমার ঘুম আসে না। আমি বলি,—ও হারানের বউ, ছেলেগুলোর গলায় একটু সর্ষের তেল মালিশ করিস।—

—তেল কোথা পাব গো মা, তুমি যদি দাও তো করি। আর একখানা কম্বল দিও মা গো!—

—আচ্ছা হারানের বউ, আমি একখানা কম্বল দেব ঠিকই, কিন্তু সেটা গায়ে দেবে কে?—

—ঐ তোমার ছেলেই (হারান) দেবে। ওর যে বড় হাঁপের কষ্ট গো মা!—রাস্তার দু'ধারের বাসিন্দা আমরা; মধ্য রাতে প্রায়ই আমাদের এরকম কথোপকথন চলে। অথচ আমাদেরও তো ত্রিশ বছর স্বাধীনতা হয়েছে! কিছু পারলাম না কেন? এসব ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এলাম। একটি উঠোনকে ঘিরে নয় খানি ঘর। রান্নাঘরও আলাদা। রান্নার ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে করবার মত। চীনের গ্রামের ঘরগুলি কতকটা আমাদের মত কিন্তু উনুন উঁচু—ইয়োরোপের মত।

আমরা সবাই নানা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে যার গাড়িতে উঠে আর কিছু দূর গেলাম—যেখানে পশুপালন-ক্ষেত্র। প্রথমেই শুয়োরের খোঁয়াড়গুলো দেখলাম—শত শত খুপরি খুপরি ঘরে শত শত শুয়োর। ঘর পরিচ্ছন্ন, একটু দুর্গন্ধ নেই। সমস্ত মল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শস্যক্ষেত্রের জন্য।

১৯৭৩ সালে আমেরিকাতে পিট সিগারের ইম্প্রেসেরিও লেভেনথল আমাকে বলেছিল, —চীনের গ্রামের বাড়িগুলো তো তোমাদেরই মত কুটির, কিন্তু কি পরিচ্ছন্ন! You can even eat in a pigsty—শুয়োরের খোঁয়াড়ে বসেও তুমি খেতে পার।—তারপর আরও যা বলেছিল তা সত্য হলেও সেজন্য তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। অপ্রিয় সত্য সব সময় সহ্য করা যায় না, বিশেষত বিদেশীর মুখ থেকে তো নয়ই। লেভেনথল বললে, —চীন থেকে ফিরে আমি আর আমার স্ত্রী কলকাতায় রিটস্ হোটেলে ছিলাম। প্রথম দিনই যেই বেরিয়েছি, আমার স্ত্রীকে একটা কুষ্ঠরোগী ও তিনটে ভিখারীর ছেলে ঘিরে ধরল। আমার স্ত্রী তো সেই যে হোটেলের ঘরে ঢুকল আর বেরোয়নি। কলকাতা দেখার সাধ তার মিটে গেল। তা. Why don't you take to Chinese ways? (তোমরা, চীনাদের ব্যবস্থার অনুকরণ করছ না কেন?)—আমার খুবই রাগ হল। আমি বললাম, —হোয়াই ডোন্ট ইউ? তোমরাই বা অনুকরণ করছ না কেন? ওদের কাছ থেকে শিখতে তো পার! এই তুমিই তো বলছিলে ওখানে চুরি নেই, গুণ্ডামি নেই। একটা শার্ট ফেলে এসেছিলে, তোমার পিছন পিছন এয়ারপোর্টে এসে গেল! রাস্তায় পুলিসের গাড়ি টহল দিচ্ছে না, ট্র্যাফিক কন্ট্রোল ছাড়া পুলিস নেই। আর তোমাদের সন্ধ্যাবেলায় ম্যানহ্যাটানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক পা হাঁটা যায় না। কলকাতায় তা যায়, অন্তত মেয়েরা নিরাপদে রাত দশটায় হেঁটে বাড়ি আসে। আর তোমাদের পুলিসকারের হুঁ হুঁ চিৎকারে কানে তালা লাগে। হোয়াই ডোন্ট ইউ টেক্ টু দি চাইনীজ ওয়েজ?—আমাদের ঝগড়া যখন মেছোবাজারের মত জমে উঠেছে—পিট সিগার মাটিতে কার্পেটের উপর পা ছড়িয়ে বসেছিলেন—এইবার তিনি আমাদের থামাবার উদ্দেশ্যে বললেন—চীনের কাছ থেকে আমরা সকলেই অনেক কিছু শিখতে পারি। আমি বললুম,—"তা হলে আপনি একটা গান করুন।" তিনি গান ধরেছিলেন—"হোয়াট ডিড্ ইউ সী মাই ব্লু-আইড্ সন" আমি বললাম,—"না, একটা আশার সংগীত গান।" তখন তিনি তাঁর উদাত্ত মধুর কণ্ঠে মার্টিন লুথার কিং-এর সেই স্বপ্নের গানটি গেয়ে উঠলেন—"ওয়ান ডে উই শেল ওভারকাম"; আর সেই নুইয়র্কের ছোট্ট ঘরটা সমুদ্রের বাতাসে ভরে গেল—ওজনের আভাসে আমরা শুদ্ধ নিশ্বাস ফেললাম।

চীনের পিগস্টাইর পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার সেদিনের ঝগড়াটা মনে পড়ল। লেভেনথল ঠিকই বলেছিল—কি পরিচ্ছন্ন এই সবচেয়ে নোংরা জীবের বাসস্থান! কিন্তু ওদের তো খাওয়া হবে! সত্যি, ভাবলে মাংসই খাওয়া যায় না। আমি বললাম, 'মং, তোমরা যখন এইসব জন্তু মারো তখন দয়ামায়া করে মারো তো—ডু ইউ কিল্ দেম ইন এ হিউম্যান ওয়ে?" মং খুব অবাক হয়ে বললে, "মেরে ফেলা হবে তার আবার 'হিউম্যান ওয়ে' কি?" আমি বললুম, "দেখ, আমাদের দেশে মুসলমানেরা পশু কাটে আড়াই পোচে—তাকে বলে জবাই। পশুটো অনেকক্ষণ কষ্ট পায়, হিন্দুরা কাটে এক কোপে—তাতে কষ্ট কম। কিন্তু আজকাল ইয়োরোপে শুনেছি এমন ব্যবস্থা হয়েছে যে, এক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রাণীটাকে মেরে ফেলা হয়; সে কোনো কষ্টই পায় না। পশুটা তো মরবেই; মরতেই জন্মেছে। অ মরে না-হয় আমাদের পেটেই গেল; কিন্তু মারবার সময় কষ্ট দেওয়া ভালো নয়।—বেড়ালে মাছেতে হল সখ্য। বিড়াল কহিল, ভাই ভক্ষ্য, বিধাতা স্বয়ং জেনো সর্বদা কন তোরে, পশ গিয়ে বন্ধুর রসময় অন্তরে, সেখানে নিজেরে তুমি সযতনে রক্ষ!" মং বললে, "হ্যাঁ, সে শুনেছে তাদের দেশেও এ বিষয়ে কোথাও কোথাও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে এ বিষয়টা সে কখনো ভাবেওনি, জানেও না।"

ঐখানে গোপালন, মুরগীপালন ছাড়াও আর একটা জন্তু দেখলাম, তার নাম 'মিঙ্ক'। খুব সুখী প্রাণী। তার চামড়া দিয়ে খুব দামী কোট হয়। ওটা বিদেশে চালান যায়। এক-একটা কোট চার হাজার মতন দাম পড়ে। ইন্দিরা গান্ধীকে নাকি রাশিয়া থেকে একটা মিঙ্ক কোট দেওয়া হয়েছিল। তাই নিয়ে বহু মন্তব্য শোনা গেছে। প্রত্যেকটি ছোট ছোট জন্তুর চামড়া জুড়ে ঐ নরম মসৃণ খুব গরম কোট হয়। আমার মনে আছে, রবীন্দ্রনাথকেও রাশিয়াতে একটা ঐ ধরনের কোট দিয়েছিল। তার সারা গায়ে জন্তুটার ছোট ছোট লেজ ছিল। যত দূর মনে হয়, সেটাকে বলা হত আস্ত্রাখানের কোট। আস্ত্রাখান একটা জায়গার নাম। কিন্তু জন্তুটা মিঙ্ক কি না কে জানে। ঐ কোট কালিম্পং-এ আমি দুবার গায়ে দিয়েছিলাম। পরে শুনেছি সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি গায়ে দেওয়ার জন্য নয়, অযত্নে রাখার ফলে। আমাদের বরাবর বলে দেওয়া হয়েছিল, মিঙ্কের খাঁচার কাছে হাত দেবে না। ওরা ওদের তীক্ষ্ণ দাঁতে সুযোগ পেলেই কামড়ে দেয়। আর সু ঠিক তাই করল—কামড় খেল, রক্তপাত হল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধল। আমাদের সঙ্গেই তো ফার্স্ট এইড নিয়ে ঘুরছে, এতক্ষণে তারা একটা কাজ পেল।

মেঠো রাস্তা দিয়ে চলেছি আমরা। ধুলো-ভরা পথ এখনো পাকা হয়নি। ঐখান দিয়ে নদী যেত। তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষেতে নানারকম সবজি রয়েছে, লোকজন কাজ করছে। সব নিয়ে একটা সমৃদ্ধ-সুন্দর ছবি। এইখানে কথা-প্রসঙ্গে শুনলাম মাও-সে-তুং-এর 'ইন এগ্রিকালচার লার্ন ফ্রম তাচাই—চাষের ব্যাপারে তাচাই-এর কাছে শেখ'—এই উপদেশটি পালন করেই এরা এমন সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সারা চীনে নানা স্থানে বড় বড় করে লেখা আছে ঐ কথাটি। এবং মুখে মুখে অবিরত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মাও-সে-তুং-এর দুটি বাণী—একটি পূর্বোক্ত উপদেশ, অন্যটি 'ইন ইণ্ডাস্ট্রি লার্ন ফ্রম তাচিং।' শেষেরটি পরে আলোচনা করা যাবে। এখন তাচাই-এর কথা যতটুকু শুনেছি এখানে বলি। আমরা 'তাচাই' দেখতে যাইনি, কারণ সেখানে তখন প্রচণ্ড শীত। একে উত্তরে, তার উপর পাহাড়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই আমাদের সমস্ত প্রোগ্রামই আমরা বদলে দক্ষিণ দিকে করেছিলাম। ঐ একই কারণে বরফের রাজ্য তাচিং-এও যাওয়া হয়নি। নইলে ওরা এই দুটি দেশ দেখাতে বড় ভালোবাসে। এই দুটি স্থান ওদের নূতন জীবনের, নূতন মানুষের পরম কীর্তি বলে তারা মনে করে। শীতের জন্য আমাদের সিদ্ধান্তই বহাল রইল। যাঁরা আমাদের চীন ভ্রমণকে রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে মিশিয়ে ভাবছেন "মা আমায় ঘুরাবি কত, চোখবাঁধা বলদের মত" তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলছি যে, ওদের যেগুলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য তা আমাদের দেখা হয়নি।

আমরা শুনেছিলাম যে, ১৯৫২ সাল থেকেই চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবস্থা চালু করতে চাইছিলেন, কিন্তু লিউ শাও চি তাতে বাধা দিচ্ছিলেন। লিন পিয়াও মাও-এর মতেই ছিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে কো-অপারেটিভ শুরু হল। কিন্তু মতান্তর চলছিলই। তা সত্ত্বেও তাচাই-এর চাষীরা ঠিক পথ কি তা বুঝতে পেরেছিল। তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াবার, ব্যক্তিগত লাভের পথ ত্যাগ করে মাও-সে-তুং-এর স্বয়ং-নির্ভরতার উপদেশ গ্রহণ করেছিল।

সান্সি প্রভিন্সের একটি পাহাড়ের উপর তাচাই গ্রামটি অবস্থিত—রুক্ষ ও বন্ধ্যা। এইখানে লিউ শাও চি-র মত, যাকে ওরা ক্রুশ্চেভের পথ বলে, তার সঙ্গে মাও-সে-তুং-এর পথের যে দ্বন্দ্ব তার মীমাংসা হয়ে গেছে। রায় দিয়েছেন কৃষকরা। তাঁদের কর্ম দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, মাও-সে-তুং-এর নীতিই শ্রেষ্ঠ। তাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে, পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করে, ব্যয়সংক্ষেপ করে, উৎপাদন বাড়িয়ে জগতের কাছে প্রমাণ করলেন—কৃষকের একান্বিত উদ্যম কি অসাধ্য সাধন করতে পারে! উৎপাদনের এবং উন্নতির প্রধান শত্রু কি? লোভ। ব্যক্তিগত লোভ। ব্যক্তিগত লোভই সমষ্টিগত উন্নতির শত্রু—এবং ফলে ক্রমে ব্যক্তিগত লোকসান। এই কথাটা ওরা বার বার বলে। এবং সেই সঙ্গে কৃষকরা বর্ণনা করে, মাও-সে-তুং হাল ধরার আগে তাদের কি অবস্থা ছিল, কি দুর্দশার দিন ছিল, দুর্ভিক্ষে বন্যায় কত মানুষ মরত। পঙ্গপাল ও প্রাকৃতিক দুর্ভোগে কত শস্যহানি হত। না ছিল ডাক্তার না ছিল শিক্ষার সুযোগ। আর আজ দেশ স্বয়ংনির্ভর। এটা হতে পারল কি করে—কি করে পাহাড় কাটা হল, নদীর মুখ ফেরানো হল, বড় বড় সেতুবন্ধ ম্যাজিকের মত হয়ে গেল? এতদিন হয়নি কেন? ব্যক্তিগত লোভই তার প্রতিবন্ধক। তাচাই-এর দরিদ্র কৃষকেরা তাদের বন্ধ্যা ভূমিকে স্বর্ণপ্রসবিনী করে এ কথা প্রমাণ করেছে। ছোট ছোট শিশুরাও ছোট ছোট ঝুড়ি করে মাটি এনেছে দাঁড়িতে ঝুলিয়ে।

আজকে এসব কথা লিখতে বসে আমি যে গ্রামটিতে থাকি তার কথা মনে হচ্ছে। এমন কিছু অজ পাড়াগাঁ নয়, কলকাতা থেকে বাইশ মাইল দূরে। সেখানে কারু কারু চাষের জমি আছে, কেউবা অন্যের ক্ষেতে চাষ করে। কিন্তু প্রত্যেকের ফসল পাহারা দেওয়া এক ব্যাপার! ধান হলে ধান রাখতে পারবে না, ফল হলে ফল পেড়ে নেবে, ইঁদুরে বাদুড়ে তো খাবেই! পুকুরে মাছ রাখতে পারবে না। পাহারাদারকে বেঁধে রেখে মাছ ছেঁকে তুলে নিয়ে যাবে। নেহাত যদি না নিতে পারে, পুকুরে ফলিডল ফেলে মাছগুলি মেরে দিয়ে নিশ্চিন্ত। আমি পেলাম না, কিন্তু ওর তো গেল! আমার নিজের অনাথ আশ্রম খেলাঘরের ছেলেরা তাদের নিজেদের দু বিঘা জমিতে সর্ষে বুনেছিল। ছেলেদের কাজ তো—দু-চার দিন লক্ষ করে নি! দু বিঘে জমির সমস্ত সর্ষেগাছ উপড়ে দিয়ে গেল কে বা কারা। তাতে তাদের সামান্যই লাভ হল, কিন্তু এই তেলের বাজারে খেলাঘরের অন্তত মণ দুই তেল লোকসান হয়ে গেল। এক ঘর চামার বাস করে—একজন পুরুষের দশটি সন্তান, খাওয়াবে কি? মাঝে মাঝে চুরি ডাকাতি—মাঝে মাঝে মাঠে চরছে গরু, তাকে বিষ খাইয়ে দিল। তার চামড়াটা তো পাওয়া গেল! আবার প্রতিশোধও তো আছে। করেছে কি করে নি, তাকে দশজনে মিলে পিটিয়ে আধমরা করে দিচ্ছে। দশজনে মিলে একজনের বিচার হতে পারে, কিন্তু দশজনে মিলে একজনকে মারা যায় না—এ শিক্ষাটুকু শহরের লোকেরও হয়নি, তো গ্রামের কি করে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিয়ে খুব আমাদের মাথাব্যথা। নিরক্ষরতা দূর হলেই কি শিক্ষা হয়? যথার্থ শিক্ষা অন্য বস্তু। সে বিষয়ে মহাভারতের যুগের পরে এ-দেশে বোধ হয় আর চেষ্টাই হল না।

যা হোক, আমি আমার বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা মত জিজ্ঞাসা করলাম, "যে শস্য আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, তাকে যত্ন করার উৎসাহ আমার কোথা থেকে বা কেমন করে আসবে? আমরা তো দেখি ন্যাশনালাইজড ফার্মে কাজই হয় না। ব্যক্তিগত লাভের আশাই তো কাজের প্রেরণা, নয় কি?" আমি অনেকের কাছেই উত্তর পেলাম যে, আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হয় কিন্তু সেটা ক্ষুদ্র দৃষ্টি। তাকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, সামগ্রিক লাভটা তারই লাভ, তা হলে সে আরো বেশী প্রেরণা পাবে। কারণ, সে লাভটা ম্যাটিরিয়াল এবং মরাল অর্থাৎ, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক। আমি বললাম, কিরকম করে বোঝাতে হবে—তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে? আমার উত্তরকর্তা বলে উঠলেন, তলোয়ার দিয়ে খোঁচালে তো সে আর বোঝবার জন্য বেঁচেই থাকল না। বোঝাতে হবে যুক্তি দিয়ে। ধরা যাক, একটা গ্রামে যে যার নিজের মাটিটুকুতে নিজের শস্য ফলাচ্ছে; কিন্তু নিজের চেষ্টায় সে যন্ত্রপাতি আনতে পারবে না। আজ যে কমিউনে এতগুলি ট্রাক্টর, এত যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে, এর জন্য ব্যক্তিগত ব্যয় কতটুকু, লাভ কতখানি, তা বোঝা কঠিন নয়। একলা চাষ করে যতটুকু পেত তার চেয়ে বহু গুণে বেশী লাভ হচ্ছে তার। তাচাইতে এই পরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে। সেই দুর্গম বরফ-ঢাকা পাহাড়ের উপর, যেখানে মানুষ গুহায় বাস করত, মো প্রতি ফলন ছিল এক শো ক্যাটিরও কম, ১৯৬৪ সাল থেকে সেখানে মো প্রতি ফসল হচ্ছে এগারো শো ক্যাটি। একেবারে অভাবনীয় উন্নতি। ১৯৫৮ সালে গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ডের সময় খানিকটা এগিয়ে গেল গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা। আর ১৯৬০ সালে যখন রাশিয়া সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে দত্ত ঋণ ফেরত চাইল তখন আর একবার এগিয়ে যাবার পালা। লিউ সাও চি-র সঙ্গে মাও-সে-তুং-এর মতভেদের ব্যাপারটা যতদূর বুঝলাম এই যে, লিউ সাও চি বাহিরের উন্নতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন, মাও-সে-তুং অন্তরের। লিউ সাও চি ভাবছিলেন, আমাদের দরিদ্র দেশে ব্যক্তিগত লাভের প্রেরণা হলে তবেই উৎপাদন বাড়বে। মাও-সে-তুং ভাবলেন, পরস্পরের একান্তিত হবার শক্তি সামগ্রিক উন্নতির প্রচেষ্টায় ও ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থের জন্য উদ্বুদ্ধ হলে উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্মশক্তি দুইয়েরই সীমা থাকবে না।

লং মার্চের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা হান সু য়ান এক জায়গায় লিখেছেন।—লং মার্চের সময় তিনি ডাক্তারদের সঙ্গে সাইকোসোমাটিক (মানসিক কারণে উৎপন্ন ব্যাধি) রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। কর্মের উৎসাহ ও আশার উদ্দীপনা তাঁর মতে মানুষের আয়ু বাড়িয়ে দেয়। কারণ, এমন অবস্থা অনেক সময় হয় যখন কেবল শারীরিক শক্তিই দীর্ঘস্থায়ী পরিশ্রম করবার জন্য পর্যাপ্ত নয়, আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ও উল্লাসই শরীরকে কষ্ট সহ্য করবার শক্তি দেয়, তখন তার আত্মাই (স্পিরিট) বাহ্য শক্তির রূপ নেয়। এ কথাগুলি একেবারেই এশিয়ার কথা, কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে কট্টর বস্তুবাদী বলে যে আমাদের ধারণা তার সঙ্গে এ তো মেলে না।

তাচাইতে এই আত্মিক শক্তির পরীক্ষার প্রচণ্ড সফলতা দেখা গেছে। ফসল ফলাবার অসাধ্য সাধনে তো বটেই, মানবতায় উৎকর্ষ সাধনেও। ওখানে শুনলাম কার কি প্রাপ্য তা তার ওয়ার্ক পয়েন্ট অনুসারে ঠিক হয়। এই ওয়ার্ক পয়েন্টটি ঠিক কিভাবে নির্ধারিত হয় তা আমি বলতে পারব না। তবে মোটামুটি একজন বয়স্ক সুস্থ মানুষ 'দশ পয়েন্ট' প্রতিদিন রোজগার করে। একটি চাষীর বাৎসরিক আয় চার শত ইউয়ান। তার মধ্যে খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র ও সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে এই কমিউনে প্রত্যেকেই বৎসরে ১০০ ইউয়ান সঞ্চয় করতে পারে। এবং এক বাড়িতে চার-পাঁচজন কর্মী থাকলে সঞ্চয় মন্দ হয় না। যাই হোক, আমেরিকার চাষীর সঙ্গে কোনো তুলনা অবশ্যই নেই। সেইখানেই জীবন দর্শনের কথা ওঠে। মাও-সে-তুং মানুষকে অর্থগৃধ্নু করে তুলতে চাননি। তবে সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে তার মনকে উচ্চতরভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। ত্যাগ, সমাজ গঠন, চরিত্রগঠন, যথার্থ মানুষ হওয়াই হবে উদ্দেশ্য। অর্থের জন্যই সব নয়, বিত্তের জন্যই সব নয়। এ কথা নূতন নয়, মানুষের ইতিহাসে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। বারবারই আমার মনে আসছে মহাভারতের যুগের কথা। গান্ধারী অপরাধী পুত্রকে ত্যাগ করতে বললেন। কর্ণ নিজ লাভের পথে না গিয়ে বীরের ধর্ম পালন করলেন। অর্জুন অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যখন জয়দ্রথকে বধ করবার সংকল্প করে বললেন কাল সন্ধ্যার পূর্বে জয়দ্রথকে যদি বধ করতে না পারি তখন আশ্রিতকে কদন্ন দিয়ে যে নিজে মিষ্টান্ন খায় আমার যেন সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকে গতি হয়। এ সব কথা শুনলে তখনকার মূল্যবোধের একটা চেহারা মনে আসে—অনেক কথা আছে যা এ যুগে খাটে না। কিন্তু মানুষ তৈরী করবার চেষ্টার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। তারপরে আর ব্যাপকভাবে চরিত্র গঠনের চেষ্টা চীন ছাড়া আর কোনো দেশে হয়েছে বলে ভাবতে পারছি না। উনিশ শতকের প্রথম দিকে "ভদ্রলোকের" একটা কল্পনা ইয়োরোপে হয়েছিল। তাদের আদর্শ কিং আর্থারের নাইটরা।

আমি শুনলাম তাচাইতে কৃষকরা নিজেদের 'ওয়ার্ক পয়েন্ট' নিজেরাই ঠিক করে এক মাস অন্তর কমিটির কাছ পেশ করে। এর মধ্যে জালজুয়াচুরির কি চেষ্টা হয় না? মানব-চরিত্র যা জানি তাতে মনে হয়, নিশ্চয় হয়। কিন্তু তা অবশ্যই সামান্য, তা না হলে এ পরীক্ষা চলত না। তাই মনে হয়, ব্যক্তিগত সততা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস জন্মাবার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই মাও-সে-তুং-এর বিপ্লবের চরম লক্ষ্য, রক্তমোক্ষণই নয়। তাচাইতে যে পরীক্ষা হয়েছে তা মাও-সে-তুং-এর ভাবনার অনুকূল। তাঁর চিন্তাকে গ্রহণ করে সেখানের কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা কেবল বাহ্যিক সাফল্য নয়, কেবলই ফসল ফলানো নয়, উৎপাদন বাড়ানো নয়, তার মূলে যে সত্য আছে, যে সত্য গ্রহণ করতে না শিখলে কোনো কিছুই সফল হয় না, সে হচ্ছে চরিত্রবল। যতই ফসল ফলাও, দুটো চোরে 'ধর্মগোলা' ইঁদুরের চেয়েও দ্রুত বিনষ্ট করতে পারে। মাও-সে-তুং তাচাইকে তাই তাঁর দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের সামনে আদর্শরূপে তুলে ধরে বলেছেন—ইন এগ্রিকালচার লার্ন ফ্রম তাচাই—প্রতি বৎসর সেখানে সহস্র সহস্র মানুষ তীর্থযাত্রা করে। এই যে, কমিউনটি আমরা দেখলুম, এখানকার বাসিন্দারাও তাচাইকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে সফলতা পেয়েছে।

এদের এসব কথা শুনে আমার খুবই হতবুদ্ধি লাগছিল। নেতারা তো অনেক উপযুক্ত কথা বলেন, কিন্তু শোনে কে? জোর করে লোনালে কিন্তু এ রকম মানবিক ফসল ফলতে পারে—এই মুখের শোভা দেখা যায়? মাও-সে-তুং-এর লং মার্চের কাহিনী যেটুকু শুনেছি, আমার মনে হতে লাগল, তারই মধ্যে এই সফলতার বীজ আছে। তিনি গ্রাম দিয়ে শুরু করেছেন। গ্রামের পর গ্রামে তিনি তাঁর আদর্শ ও মতের সত্যতা প্রমাণ করেছেন এবং মানুষকে ভালোবাসা দিয়েছেন। তাই আজ শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের মুখে মাও চুসি, মাও চুসি। তাঁর জন্যই সব। তাঁর জন্যই মরা গাঙে বান এসেছে—শুকনো ডালে ফুল ফুটেছে। মানুষ মানুষের জন্য ত্যাগ করতে আনন্দ পেয়েছে।

ধুলোমাটির রাস্তা দিয়ে আমরা ফিরছিলাম, কে একজন বললে, এইটা ছিল নদীর পথ, এ পথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নইলে জমিটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকত। চারিদিকে শুকনো আপেলের বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমার দালাই লামার কবিতাটা মনে পড়ল—"তুমি যথাসময়ের বর্ষাধারা, যা এই পৃথিবীর উপর বর্ষিত হয়েছে।" এরা কথায় কথায় বলে জীবনের সুর—তাই বোধ হয় আমার মনের মধ্যে সেই গানটা গুন গুন করে এল—

যে শাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না একেবারে
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে—
যা কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবনহারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে, ভুখার পরে।

আমি যে ছোট্ট গ্রামখানিতে বাস করি, আমি যেখানেই যাই তাকে ভুলতে পারি না। আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেখানে ভুখা দূর করবে কে? ঐ নৃশংস চামারের অভুক্ত দশটি শিশুর মুখে অন্ন দেবে কে? ও নৃশংস হল কেন? তারই বা উত্তর কি? আজ ত্রিশ বছর আমরা স্বাধীন হয়েছি।—চীনের দু বছর আগে। আমি বললাম, 'লী, আমার একটা গান মনে আসছে।'—'কি গান সেটা?' 'কিছু না, হোয়াই ওয়াজ মাও-সে-তুং বর্ণ ইন চায়না—ইজ ইট জাস্ট অ্যা কোইনসিডেন্স? মাও-সে-তুং কেন চীনে জন্মালেন? এটা কি একটা আকস্মিক ঘটনা?'

সে বললে, 'হোয়াট ডিড ইউ সে—কি বললে?'—'নাথিং কিছু না।'

আমি ভাবছিলাম, জন্মলে মরিতে হবে—মাও-সে তুং তো মারা গেছেন—তার পরে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কেউ দেশ সম্বন্ধে, নিজের সন্তানদের সম্বন্ধে কিছু ভাবেন তিনিই শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবেন। এবং এটাও ঠিক যে, এই ভাবনার দ্বারাই শিক্ষার গতিপথ দেশের ও কালের প্রয়োজন অনুসারে ক্রমাগতই পরিবর্তিত হয়, এবং হওয়া উচিত। যেমন জীবনদর্শনের পরিবর্তন হচ্ছে, জীবনযাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে তেমন শিক্ষার ধারাও প্রবহমান স্রোত না হলে তা পচা ডোবায় পরিণত হবার সম্ভাবনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু তাঁর জীবনের বেশির ভাগ শ্রম ও সম্পূর্ণ অর্থসামর্থ্য তিনি দান করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন মিলিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার একটা পরিকল্পনা ছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ যে তা থেকে কতটা উপকৃত তা হয়তো অন্য প্রদেশের লোকেরা জানেই না। নাচে গানে রূপে রসে শিল্পে কলায় আজ যে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এত আয়োজন তার কোনো চিহ্নও আগে দেখা যেত না। শুধু তো তাই নয়, দেশের নানা স্থান থেকে গ্রামীণ শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করে আনা, গ্রামের মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা, চাষের উন্নতির কল্পনা, পেস্ট কণ্ট্রোল প্রভৃতি তখনকার দিনে আর কে ভেবেছিল! গাছের তলায় আসনে বসে যে বিদ্যালয়ের তিনি আরম্ভ করলেন সেকি তাঁর বেঞ্চি কেনবার পয়সা ছিল না বলে?

১৯১৩ সালে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে এসেছিলেন। তিনি ফিরে গিয়ে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে লিখেছেন, "দিল্লী থেকে কলকাতার পথে আমি শান্তিনিকেতনে একদিন কাটিয়েছিলাম। এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানে গেলে কি রকম যে একটা ভাবে অভিভূত হতে হয় তা পরিষ্কার করে বোঝানো যায় না। সেখানে সরকারের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের কর্মী বা কর্মচারী নয়, তাদের ব্যবস্থাও যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা নয়। সেখানে স্বনির্ভর ভারতের স্বতঃস্ফূরণ। বিদেশী কোনো কিছু চাপিয়ে জবরদস্তি বা উৎখাত করার চেষ্টা নেই।....কবি আমাকে বললেন, ওরা আমার ছেলেদের বেঞ্চিতে বসাতে চায়; কিন্তু আমি মনে করি যে, মাদুরে বসাই ভালো। অতএব আমার প্রতি ভ্রূকুটি ঘনিয়ে আসে, পুলিসের খাতায় নাম ওঠে।......বর্তমানে এই বিদ্যালয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের কাজে বিশেষ উৎসাহী হয়েছে। আমাকে তাঁরা ছেলেদের কাছে কিছু বলতে বলেছিলেন। ......তাঁরা বললেন, আমাদের বলুন জনসাধারণের শিক্ষা-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিত। বস্তুত, তাঁরা নিজেরাই কার্যের দ্বারা এই প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিলেন এবং আমাকে দেখাচ্ছিলেন কি করে এ কাজ করতে হয়। ......শান্তিনিকেতনের চারপাশের গ্রামগুলিতে সাঁওতালদের বাস। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঐসব গ্রামে মাঝে মাঝে ব্যাট বল নিয়ে যায় ও আপন মনে খেলা শুরু করে দেয়। খেলা খানিকক্ষণ চলতে থাকলে চারিদিকে আস্তে আস্তে যখন ভিড় জমে যায় তখন ছেলেরা খেলা থামিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে, গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে শুরু করে। এইভাবে একটি সান্ধ্য স্কুলের শুরু হয়...এবং ছাত্ররাই তাদের শিক্ষা দেয়। যেদিন আমি সেখানে ছিলাম সেদিন বারজনের মত ছাত্র এসেছিল এবং গাছের তলায় তাদের শিক্ষা চলছিল। ......আমি যখন চলে আসি তখন তারা ছাতিম গাছের তলায় মাদুরের আসনে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অনুসারে দল বেঁধে বসেছিল,...মাঝখানে ছিলেন শিক্ষক। চারিদিক শান্তিপূর্ণ, সুন্দর, প্রফুল্ল। আমি তাদের ফেলে আর এক জগতে চলে এলাম যেখানে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে পড়া উপযুক্ত ও সুবুদ্ধি শিক্ষকেরা ঘর্মাক্ত কলেবরে কামারের মতন জগদ্দল হাতুড়ি পেটাচ্ছেন ভারতীয় মনকে অদ্ভুত এনভিলের উপর রেখে অদ্ভুত আকারে বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে নেবার জন্য।"...আজ এই অদ্ভুত আকারে বাঁকাবার পরিণতি এমন হয়েছে যে, বস্তিতে বাস করে যে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী সেও বলে, 'আমার ছেইলেডারে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ঢুকাইয়া দেবেন?' তার কল্পনায়ও নেই যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ঢুকে তার পুত্র জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।

গান্ধীজীরও শিক্ষাব্যবস্থার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল। তিনিও পরীক্ষা-ব্যবস্থার অসায়তা বুঝেছিলেন। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত ডিগ্রীহীন অনেকে আছেন যাঁরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে গ্র্যাজুয়েটের চেয়ে ন্যূন নন। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর আশ্রমে পরীক্ষার চলন করেননি।

আমাদের দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরা শিক্ষা নিয়ে যা ভেবেছেন তার সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগ করতে কেউই সমর্থ হননি। এঁদের সকলের পদ্ধতির মধ্যেই চিন্তার একটি সামান্য ধর্ম ছিল যে, এঁরা সকলেই শিক্ষার দ্বারা জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন—ব্যক্তিবিশেষের জীবনের সামঞ্জস্য এবং ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্য। যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ স্বকীয়তা সৃষ্টি করেছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও তার মর্যাদা দিতে পারল না। তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কোনো ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে যে স্কুল বিল্ডিংগুলি তৈরী হল তা যেমন কুৎসিত, পরিবেশের সঙ্গে অসমঞ্জস, তেমনি ব্যয়সাধ্য। ট্রেনে যেতে যেতে ইতস্তত যে বড় বড় কোঠাবাড়িগুলো দেখবেন—অযত্নরক্ষিত, ফাটল ধরা, চারিদিকে কাগজ ছড়ানো, মলিন ও শ্রীহীন, জানবেন সেটাই স্কুল বাড়ি, গ্রামের পরিবেশের মধ্যে এক অবাঞ্ছিত উপস্থিতির মত দাঁড়িয়ে আছে।

যা হোক, ক্রমে ক্রমে পাসের উৎসাহ এমন বেড়ে গেল ও পরীক্ষা পাস জীবনের এমনি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল যে, পড়াশুনো হোক বা না হোক, পাস হওয়া চাই। এই ব্যবসায়ে মেতে উঠলেন শিক্ষক অধ্যাপক পাব্লিশার। শত শত নোট বই মানে বইতে বাজার ছেয়ে গেল। ক্রমে না পড়ে টুকে লেখার জন্মগত অধিকার দাঁড়িয়ে গেল। একটি কুৎসিত দৃশ্য দেখেছিলাম: সংস্কৃত কলেজের সামনে দিয়ে যাচ্ছি—দেখি তিনতলা থেকে একটি দড়ি নেমে আসছে আর নিচে পরীক্ষার সাহায্যকারীরা উত্তরপত্র বেঁধে দিচ্ছে, আর রাস্তায় চতুর্দিকে দণ্ডায়মান দর্শক হি হি করে হাসছে। আমি অধ্যাপকের কন্যা, আমার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ অধ্যাপক—এই দৃশ্য, শিক্ষার এই অপমান আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না।

এক দিকে এই, অন্য দিকে বইয়ের বোঝা, বিষয়ের বোঝা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পিষ্ট করে দিচ্ছে। এভাবে চললে কারুর ভিতরে কোনো প্রতিভা থাকলে তাঁর স্ফুরণ অসম্ভব। এক দিকে যেমন পড়ার চাপ, অন্য দিকে তেমন সত্যকার পঠনপাঠনের অব্যবস্থা। কোনো রকমে মুখস্থ করে কিংবা টুকে পাস করলেই হল। ব্যাপার এত দূর যে, ডাক্তারি পরীক্ষায় পর্যন্ত অসদাচরণের ত্রুটি নেই। অথচ তাদের হাতেই থাকবে মানুষের জীবনমরণের ভার।

কিছু দিন থেকে আর এক সমাজসেবার হিড়িক শুরু হয়েছে—বস্তিতে বস্তিতে স্কুল করা ও সেই সঙ্গে দুধ রুটি বিলানো। ঐ দুধ রুটি বা অন্যান্য খাদ্যের লোভে দরিদ্র মা-বাপেরা ছেলেমেয়ে স্কুলে পাঠায় ও সেগুলি এনে সবাই ভাগ করে খায়। পঠনপাঠন কি হয় জানি না, কিন্তু বেঞ্চে ডেস্কে বসে দু-চার পাতা পড়ার ফলে খেটে খাওয়া দুঃখজীবী মা-বাবার সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তু। সে শুধু যে মা-বাবাকে ছোট মনে করে তা নয়, হাতের কাজকেও ছোট মনে করে। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য চাপরাসীর কাজ। আর লক্ষ লক্ষ চাপরাসীর তো প্রয়োজন নেই, তাই শেষ পর্যন্ত বেকারের নিষ্ফল-জীবনই তার ভাগ্যে জোটে।

চীন যাবার মাস খানেক আগে আমাদের খেলাঘর আশ্রমে একটি শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার ডেকেছিলাম। আমাকে সাহায্য করেছিলেন সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। আমি বুঝতে পারছিলাম না—এই যে আমি রাস্তা থেকে বা হাসপাতাল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কিংবা নিতান্ত অনাথ ছেলেদের এনেছি, যাদের মধ্যে কেউ হয়তো দশ বছর পর্যন্ত অক্ষরই চেনেনি, এদের কি শিক্ষা দেব? পাস করাবার চেষ্টাতেই ঝুঁকে পড়ব, না হাতে-কলমে কাজ করতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যমত পড়াশুনোর ব্যবস্থা করব? আমার ভাবতে আনন্দ হচ্ছে যে, আমি শেষোক্ত পন্থাটিই বেছে নিয়েছিলাম এবং এই আশ্রমের ছেলেরা কৃষি, মৌমাছি পালন, গো-পালন, তাঁত, ছুতোরের কাজ ইত্যাদি ছাড়াও নানা রকম কাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে স্কুলে থাকাকালীনই খেলাঘরের জন্য কিছু কিছু উপার্জন করছে। তবু আমার সন্দেহের নিরসনের জন্যে আমি শিক্ষাবিদ্‌দের একটি সভা ডেকেছিলাম। শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাব আমায় দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অমিয়কুমার মজুমদার, অধ্যক্ষ রঞ্জিতকুমার দে, গৌরীকিশোর ঘোষ, নিখিলরঞ্জন রায়, দেবাশীষ দাস, রথীন্দ্রনাথ রায়, ডঃ আরতি সেন, গৌরী আইয়ুব, অধ্যক্ষা মৃণালিনী দাশগুপ্তা প্রভৃতি। আমার প্রশ্নগুলি ছিল এই : ১। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের ও তথাকথিত শিক্ষিতজনের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে কেন ? ২। স্কুলের, এমন কি কলেজেরও পরীক্ষায় পাস করা ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশের বিদ্যা, প্রাপ্ত নম্বরের মানের তুলনায় কম কেন ? ৩। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নানা শ্রেণীবিভাগ—যেমন, সরকারী বেসরকারী স্কুল, নিম্নমান উচ্চমান স্কুল, বুনিয়াদী ও সাধারণ বিদ্যালয়, মাতৃভাষার মাধ্যম ও ইংরেজীর মাধ্যম স্কুল ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত বৈষম্যের সৃষ্টি করছে কি না ? এই বৈষম্য থাকতে সংহতি আসতে পারে কি ? ৪। ইংরেজী মাধ্যমওলা স্কুলের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁকের নিশ্চয় কিছু বাস্তব এবং অপ্রতিরোধ্য কারণ আছে। যদিও সেটা কতটা শখ, কতটা আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার লোভ বা প্রয়োজন, তার বিচার হয়নি। বরং দেখতে পাচ্ছি মাতৃভাষা ও দেশের সঙ্গে অপরিচয় হেতু অন্তরের দৈন্য বাড়ছে। মহাত্মা গান্ধীর তথা আজকের সমস্ত সোস্যালিস্ট দেশে শরীরশ্রমের আদর্শ সামনে থাকলেও আমাদের দেশে কেন তার যথাযথ প্রয়োগ হল না ?

এই সমস্ত সমস্যাগুলি আমি উপস্থাপিত করেছিলাম এবং আলোচনায় সকলেই স্বীকার করেছিলেন যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে অচল অবস্থায় পৌঁছোচ্ছে। একটা বৃহৎ গোষ্ঠী ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষার ফলে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পরানুকরণপ্রিয়তা নির্লজ্জভাবে বেড়ে চলেছে। এ ছাড়া পড়ার চাপ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় কোনো বিষয়েই যথেষ্ট জ্ঞান হচ্ছে না, উপরন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের পথ একেবারে রুদ্ধ। কখন তারা সাহিত্য-শিল্পের চর্চা করবে ? আর বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির দুর্দশা আরো শোচনীয়। শিক্ষকরা শেখান না ; ছাত্ররা পড়েন না, শুধু ডিগ্রী আহরণ করেন। আমার ঐ ক্ষুদ্র খেলাঘরে আমি যে হাতের কাজের সঙ্গে শিক্ষাকে ওতপ্রোত করতে পেরেছি তার একমাত্র কারণ—এই ছেলেদের জগতে কেউ নেই, আমাদের খেলাঘর শিক্ষাকেন্দ্রে না এলে এদের হত পথেই বাসা। কিন্তু যদি বাপ-মা থাকত তা হলে এ পরীক্ষার সুযোগই আমি পেতাম না। আমাদের দেশেও কর্মশিক্ষার কথা উঠেছে এবং প্রতি স্কুলেই তার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু ধরতে গেলে তা নেহাতই ছেলেখেলা। সম্প্রতি অনেকগুলি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের সুযোগ হওয়ায় এই ওয়ার্ক এডুকেশান-এর পরিচয় আমি পেয়েছি। পূর্বেও পেয়েছিলাম, কিন্তু চীনে গিয়ে যা দেখলাম তার সঙ্গে আজকের এ-দেশের কর্মশিক্ষার সঙ্গে মিল খুব কমই। আমাদের এই কর্মশিক্ষায় অনেকখানি ফাঁকি আছে। প্রথম ফাঁকি—এর মর্মটা কি তা ছেলেমেয়েদের বোঝানো হয় না। গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমরা কেন ভাবি যে, মাথাটাই সব—হাত-পা কিছু নয়। যারা তাদের হাতকে শিক্ষা দেয় না, সাধারণ শিক্ষার খোদল কাটা পথে চলে, তারা জীবনের সঙ্গীত শুনতে পায় না। তাদের সব ইন্দ্রিয়গুলো শিক্ষিত হয়নি। খালি বই পড়তে শিশুও আনন্দ পায় না। কেবল বাক্যরাশি তার মগজকে ক্লান্ত করে দেয়। তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়।......আমি যদি কবি হতাম তা হলে পাঁচটি আঙুলের সম্ভাবনার উপর কবিতা লিখতাম।" ('Building for Peace'—D. P. Nayer)

এই কবিতা চীনে কি রকম দেখে এলাম তা বলব। প্রথমেই বলতে হবে গান্ধীজীর ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার সঙ্গে তার খুব অসঙ্গতি নেই। একমাত্র তফাত এই যে, মাও-সে-তুং তার ব্যাপক ও যথাযথ প্রয়োগ করতে পেরেছেন। এদেশে তা ব্যুরোক্র্যাটদের দ্বারা খেয়ালী লোকদের পাগলামি বলে বর্জিত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত ইংরেজ আমলের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আমাদের বিশ্বাস অটুট রয়েছে। শিল্পপতিদের উদ্বৃত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় স্কুলগুলিও সেই পুরাতন আভিজাত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। সেখানে ছেলেমেয়েদের ঢোকাবার জন্য মা-বাপেরা ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকছেন। কতগুলো অসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যবোধের জন্য তাঁরা ভাবছেন ছেলেমেয়ে কত উঁচুদরের স্কুলে পড়ছে তার উপরই তাদের মানসম্মান নির্ভর করছে। সেই প্রচণ্ড খরচ সামলাতে, স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে তাদের কত খেসারত দিতে হচ্ছে কে জানে! হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রষ্টাচারী হতে বাধ্য হচ্ছেন। দিল্লীতে শুনলাম কারু বাড়িতে টেলিভিশন না থাকলে তার সহপাঠীরা ক্ষেপায়—তোর বাবা একটা টেলিভিশনও কিনতে পারল না! গান্ধীজী লিখছেন, "যে শিক্ষা ভালোমন্দের তফাত করতে শেখায় না, যা মনের ভিতর সৎবুদ্ধির উদ্রেক করে না, অসৎকে নষ্ট করতে শেখায় না তা কোনো শিক্ষাই নয়।"

১১ ডিসেম্বর বিকেলে সিজিয়াচুয়াং-এ আমরা একটি মিডল স্কুল দেখতে গেলাম। স্কুলটির নাম নেই, নম্বর দশ। দশ নম্বর মিডল স্কুল। আমাদের অবশ্য নাম ভালো লাগে। নম্বরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক স্থাপন করতে আইনস্টাইন জাতীয় মানুষরাই পারেন। যা হোক, তবু এর একটা মানে আছে। মানে সম্ভবত এই যে, ঐ স্থানে এটি দশ নম্বর স্কুল। আরো ক'টি স্কুল আছে জানি না, তবে ঐ নম্বর হয়তো বোঝাতে চায় যে, সব মিডল স্কুলেই শিক্ষার মান মোটামুটি একই। ফলে পাড়ার বা কাছাকাছি স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে পারেন অভিভাবকরা। আমাদের এখানে স্কুলে স্কুলে এত পার্থক্য, কি শিক্ষাদান ব্যাপারে, কি সাজগোজে যে, পছন্দমত স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে আনা-নেওয়ার কাজে হয়রানির অন্ত নেই। চীন দেশে গ্রাম ও শহরে শিক্ষার মানে কিছু তফাত থাকলেও শহরের স্কুলগুলি একই। এখানে যেমন পারিপাট্যে কোনো কোনো স্কুল ফাইভ স্টার হোটেলের তুল্য এবং উচ্চবিত্তের জন্য নির্দিষ্ট হলেও উদ্বাহুরিব বামন অনেকেই সেদিকে প্রাণপণ করে ছোটেন, ছেলেমেয়েকে শুধু বিদ্যায় নয়, চালে-চলনে দোরস্ত করবেন বলে, সে ব্যবস্থা চীনে চলবে না। সেখানে সবাই সমান। এদেশে অবশ্যই এটা অত্যাচার বলে গণ্য হবে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে, এক প্রজন্মের মধ্যেই এর সুফল দেখা যাবে।

আমরা আগেই শুনেছিলাম, ১৯৬৬ সালে যে কালচারাল রেভলিউশন হয়েছিল তা শুরু হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্র থেকেই। এই ১০নং বিদ্যালয়ে প্রথম সে বিষয়ে কিছুটা শুনলাম আমরা। যথাসময়ে যথানিয়মে আমরা সকলে লম্বা টেবিলে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে বসলাম। আমাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান, চেয়ারম্যান রেভলিউশনারি কমিটি ও চেয়ারম্যান প্রপাগাণ্ডা কমিটি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কালচারাল রেভলিউশনের পরে এই সব কমিটি হয়েছে। প্রপাগাণ্ডা কথাটা শুনতে আমাদের ভালো লাগে না। আমাদের কাছে ওর মানে মিথ্যা প্রচার। চীনে সে অর্থ নয়, সেখানে অর্থ—সত্যকে উদ্ধার ও প্রচার। তা না হলে কেউ গর্বভরে বলতে পারে না যে, আমি প্রপাগাণ্ডা কমিটির চেয়ারম্যান। আমাদের দেশে এটা ঠাট্টার মত শোনাবে। এই জন্যেই প্রথম দিকে আমার ওদের কথা বুঝতে মুশকিল হত। মনে হত আমার চেনা পৃথিবীটাকে ওরা উল্টে ধরেছে।

কালচারাল রেভলিউশনের অর্থ ছিল বর্তমান প্রজন্ম, যারা পূর্বেকার অবস্থা জানে না, যুদ্ধ দেখেনি, মোটামুটি সচ্ছল সমৃদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত, তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, সর্বদা সজাগ দৃষ্টি না রাখলে পূর্বাবস্থা ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষের মধ্যে কর্তৃত্ব করবার, ভোগ করবার, পরস্বাপহরণ করবার, পরশ্রমজীবী হবার যে চেষ্টাটা সর্বদা মাথা তোলবার চেষ্টা করে সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তিকে বড় করে তুলতে চায়, ওদের ভাষায় সেটা লিউ শাউ চি-র 'লাইন' (অন্তত আমি যা বুঝেছি)। মাও-সে-তুং বিদায়ের পূর্বে সে সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করে দেন। এবং আন্দোলনটা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চীন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার নাম হচ্ছে ডিকটেটরশিপ অফ দি প্রলিতেরিয়েত। অর্থাৎ প্রলিতেরিয়েতের প্রাধান্য থাকবে, সর্বক্ষেত্রে, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। তা না হলে সর্বত্র অসাম্য বাড়তেই থাকবে এবং মাথার উপর কর্তৃত্বের যে এক বিরাট কাঠামো তা নিচের মানুষদের এমন কি ছাত্রদেরও, দমন করে পিষ্ট করে ফেলবে। কালচারাল রেভলিউশনের পূর্বে পড়াশুনোর ব্যবস্থা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবস্থারই অনুকরণে। প্রায় মানুষ-মারা কল। জুনিয়র ও সিনিয়র মিডল স্কুল ও কলেজ। সর্বত্রই পড়ার চাপে ছেলেমেয়েরা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত। সর্বদা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে একটা 'টেনসন' চলেছে—প্রশ্নগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন ছাত্র ঠকাবার জন্য করা। যেন একটা অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ছাত্র ও শিক্ষকদের পরস্পরের শত্রু করে রেখেছে। এই ভাবনা নষ্ট করে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনবার জন্যই কালচারাল রেভলিউশন।

এই দশ নম্বর স্কুলে তাই আমরা দেখলুম পিপলস লিবারেশন আর্মির সদস্য, শ্রমজীবী বা ওয়ার্কারদের মধ্যে থেকে গঠিত প্রপাগান্ডা দল ও স্কুল কর্তৃপক্ষ—এই তিনে মিলে রেভলিউশনারি কমিটি। এরাই স্কুলের প্রলিতেরিয়েত মেজাজ ঠিক রাখবে। সমস্ত ব্যাপারটা খাপছাড়াভাবে শুনে আমার বড়ই বিপন্ন বোধ হচ্ছিল। এত বড় একটা দেশ—যেখানে এত আশ্চর্য উন্নতি, যেখানে শুনছি সর্বদাই উৎপাদন ও নানা পরিকল্পনা প্রতি বছর লক্ষ্য পার হয়ে যাচ্ছে সেখানে শিক্ষা ব্যাপারে মজুর বা চাষারা তাদের চাষাড়ে চিন্তা দিয়ে কি উন্নতি ঘটাবে! ওখানে আমার সর্বদাই এই বিপদ হত। আর সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁর কোনো বিস্ময় প্রকাশ করতেন না। তাঁদের সঙ্গে আমি বিশেষ কিছু আলোচনা করিনি। তাই আমার বোঝাটা বাইরে থেকে আরোপিত হল না। ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের মত হল। যা প্রথমে অন্ধকার আবছা ছিল, তা ক্রমে প্রকাশ্য হল।

সংবর্ধনার প্রথম স্তরে আপেলের সঙ্গে গ্যাং অফ ফোরের নিন্দা হল। ওদিকে আমি কানও দিই না, মনও নয়। কারণ, পিছনের সমস্ত ইতিহাসটা জানা না থাকলে ও দু পক্ষের কথা না শুনলে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। যা হোক, এখানে যা শুনলাম তা এই যে, কালচারাল রেভলিউশনের সময় তাঁরা অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে, যাকে আজকের ভাষায় বলা হয় 'আলট্রা লেফটিজম', সেই কীর্তি করে, দেশের মধ্যে প্রায় গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিচ্ছিলেন। অর্থাৎ আর এক রকম ডিকটেটরশিপ হচ্ছিল। প্রলিতেরিয়েতের নয়, একটি গ্রুপের। এ ধরনের প্রচেষ্টার সঙ্গে অবশ্য আমাদের পরিচয় আছে। নকশাল আন্দোলনের সময় বিদ্রোহী তরুণদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে বিপথে চালিত করে কোনো কোনো নেতা কি ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় ছিলেন না? এই রকমই সেই বিশৃঙ্খল বিদ্রোহ স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠে দপ্ করে নিবে গেল। কারু কাজে লাগল না।

এই দশ নম্বর মিডল স্কুল ১৯৫৮ সালে অর্থাৎ 'দি ইয়ার অফ দি গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড'-এর বছরে স্থাপিত। এখানে প্রাইমারী স্কুল শেষ করে ছেলেমেয়েরা আসে। বলা বাহুল্য আজকের চীনে সর্বত্র কোএডুকেশন। প্রাইমারীর পর তিন বছর জুনিয়র স্কুল ও পাঁচ বছর সিনিয়র স্কুল শেষ করলে স্কুলের গণ্ডী পার হওয়া গেল। এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দু হাজারের বেশী। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মী মিলিয়ে এক শ' ষাটজন। কর্তৃপক্ষ যখন আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম বলছিলেন তখনই আমরা বুঝতে পারলাম, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি গ্রন্থকীট তৈরি করা বা ডিগ্রীধারী কতগুলি অকর্মণ্য জীব তৈরি করা নয়। কেউ যেন মনে না করেন, আমার ডিগ্রীতে কোনো আপত্তি আছে। কিন্তু এটা মানতেই হবে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যা অনেক লোককেই অকর্মণ্য করে ফেলে। তার উপর আজকাল এ-দেশে তার চর্চাও অত্যন্ত পল্লবগ্রাহী।

আমরা শুনলাম, এই বিদ্যালয়ের মধ্যেই অনেক কারখানা আছে। সেখানে ছেলেরা হাতেকলমে কাজ করে ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে বিদ্যালয় কতকটা স্বয়ংনির্ভর হচ্ছে। আমরা বেথুন হাসপাতালের স্বয়ংনির্ভরতা দেখেছি, এখন বিদ্যালয়েও সে চেষ্টা দেখলাম। মাও-সে-তুং-এর 'স্বয়ংনির্ভর হও' উপদেশের চর্চা দেশের সর্ব ক্ষেত্রে চলেছে।

এইসব আলোচনা হচ্ছে এমন সময় তারাচাঁদ গুপ্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে 'পুজো-আচ্চা হয়? মন্দির আছে?" কেন যে হঠাৎ তাঁর ধর্মভাব জাগল জানি না, তাও আবার চীনের উপর তিনশ' খানা বই পড়বার পর। যা হোক, ওরা বললে—মন্দির আছে, বাড়িতেও কেউ কেউ পূর্বপুরুষের পূজা করে। তবে তার সংখ্যা সামান্য এবং বৃদ্ধরাই করে থাকেন। তাতে কোনো নিষেধ নেই। তারাচাঁদ গুপ্ত আবার প্রশ্ন করলেন, "তা তোমরা নিজেদের এথিস্ট (নাস্তিক) বল, কমিউনিজম তো ধর্মে বিশ্বাসী নয়—তবে তোমরা কেন কাউকে মন্দিরে যেতে বা পূজা করতে দেবে?" দোভাষী মুচকি হেসে, "এতে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কাজের মধ্যে দিয়েই মানুষ এগিয়ে যাবে, কুসংস্কারের আবরণ বা অদৃষ্টবাদ আপনি চলে যাবে!" তারাচাঁদ গুপ্ত আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই নব কালাপাহাড়কে থামিয়ে বললুম, "করুক না কেউ পূর্বপুরুষের পূজা, আপনার তাতে কি?"

পরে আমি একজনের কাছে শুনেছিলাম, একে বলে 'ডগমা' এবং 'রেড বুকে' দেখি মাও-সে-তুং লিখেছেন, বরং গোবরও লোকের কাজে লাগে, কিন্তু 'ডগমা' কোনো কাজে লাগে না। মাও-সে-তুং কি জানতেন গোবর কত কাজে লাগে? সার বা গোবর গ্যাস জানলেও নন-কন্ডাকটর অফ এ'টো হিসাবে গোবরের অসাধারণ মূল্য তাঁর নিশ্চয় জানা ছিল না। এ'টো নিয়ন্ত্রণ সাধনা থেকে আমরা আজও মুক্ত নয়।

যাক। ছাত্রছাত্রীর মত বিদ্যালয়ের বিষয়ে সমস্ত তথ্য জেনে নিয়ে তারপর স্কুল দেখতে বেরুলাম। বিদ্যালয়ের বাড়িটি খুব পরিষ্কার, তবে একেবারে সাদাসিদে। টেবিল-ডেস্কও তাই। কিন্তু প্রত্যেক ঘরেই প্রায় কিছু না কিছু পোস্টার আছে, গ্যাং অফ ফোরের বিদ্রূপাত্মক কার্টুন আছে। মনে হয় চীনেরা জন্ম-আর্টিস্ট। এই বিদ্যালয় থেকে ওরা যখন বেরিয়ে যায় তখন ওদের বয়স সতের। একে বলে গ্র্যাজুয়েশন। ডিগ্রী দেওয়া হয় কি না বুঝলাম না। সম্ভবত নয়। এরা শেখে চীনা ভাষা আর কোনো একটি বিদেশী ভাষা। দুটি বিদেশী ভাষা সাধারণত শেখানো হয়—ইংরেজী ও রুশ। কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ইতিহাস, ভূগোল ছাড়াও এগ্রিকালচার সম্বন্ধে কিছুটা পড়ানো হয়। অঙ্কন-বিদ্যা ও সঙ্গীতও পাঠ্যক্রমের মধ্যে রয়েছে। পাঠ্যক্রম শুনে মনে হল অনেকটা আমাদের মতই; তবে সবই মাতৃভাষার মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে বলে সহজে অধিগম্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাজে পরিণত করা হচ্ছে বলে তা আর পুস্তকস্থা বিদ্যা নয়, তা অভিজ্ঞতার বস্তু হয়েছে। যেমন শুনলাম কেমিস্ট্রির ছাত্ররা এখানে কালি আর অ্যালকহল বানাচ্ছে। আমরা কালির কারখানা দেখতে গেলাম, অ্যালকহলের দিকে যাবার ইচ্ছা থাকলেও দমন করা হল। কারণ, আমাদের সঙ্গে যে মহাকবি ছিলেন তাঁর যদি মদের পিপেয় ডুবে এমন তেমন কিছু হয়ে যায় তা হলে আমাদের যা হোক, চীনের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তিনি ইতিমধ্যে আমায় বলেছেন যে, চীন সম্বন্ধে একটি মহাভারতের তুল্য বড় কাব্য লিখবেন।

কালি যে শুধু তৈরী হচ্ছে তাই নয়, দোয়াতে পুরে কাগজের বাক্সে ভরে প্যাকিং কেসে করে বিক্রির জন্য চলে যাচ্ছে। সরকার কিনে নেবে। বারো-তেরো বছরের ছেলে-মেয়েরা দ্রুত বাক্সে দোয়াত ভরে রাখছে। আর একটি কারখানায় দেখলাম, ছোটখাট এগ্রিকালচারের যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে। এখানে ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে হাতেকলমে কাজ শিখছে। ফিজিক্সের লেবরেটরি, কেমিস্ট্রির লেবরেটরি, ও বহু বিষয়ে লাইব্রেরী গড়ে তোলার কাজে ছেলেরা হাত লাগায়। এখানে থিয়োরী, ওদিকে হাতেকলমে কাজ। কোনোখানে প্যাকিং বাক্স বানাচ্ছে। কোনো দোকানে প্যাকিং বাক্স দরকার, তারাই জিনিসপত্র দিয়ে গেছে, প্যাকিং বাক্স তৈরী হলে কিনে নিয়ে যাবে মজুরি দিয়ে। ঐ স্কুলে মোটর মেরামতের কারখানা রয়েছে। সেখানে রীতিমত মোটর মেরামত হচ্ছে। কেমিস্ট্রির ছেলেরা 'সয়েল কেমিস্ট্রি' শিক্ষা করছে, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করছে, সেই পরীক্ষার ফল চলে যাবে চাষীদের কাছে; তারা কার্যক্ষেত্রে মিলিয়ে নেবে মাটি পরীক্ষার ফল কার্যকরী কিনা।

এ সব ওয়ার্ক এডুকেশন ঠিক আমাদের স্কুলে আজকাল যে খেলা খেলা কাজ হচ্ছে তার ধারেকাছে নয়। আসল কথা, কর্ম শিক্ষার মর্মটাই এখানে ছেলেমেয়েদের বোঝানো হয় না। একটি প্রসিদ্ধ বালিকা বিদ্যালয়ে সেদিন পুরস্কার বিতরণ করতে গিয়ে দেখলাম মেয়েরা সুন্দর সুন্দর সূচীশিল্প করেছে। ধরে নিলাম সেটা সত্যিই মেয়েরা করেছে। কারণ, অনেক সময় তাও করে না—মাসী পিসী সোয়েটার বুনে দেন, ভাল নম্বর ওঠে। আর যারা নিজেরা ভুলটুল করে নিজের হাতে বানায় তারাই কম নম্বর পায়! এই নম্বরেই আমাদের সর্বনাশ করেছে। যাক, সেই বালিকা বিদ্যালয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, সূচীশিল্প মেয়েরা চিরকালই করে, এর মধ্যে কর্মশিক্ষার বিশেষত্ব কি? আপনাদের মেয়েরা এই বিদ্যালয় ঝাড়ামোছা করতে পারবে? বিদ্যালয়ের উদ্যানটি দেখাশোনা, গাছ লাগান করতে পারবে? এবং পারলেও তাদের অভিভবকরা করতে দেবেন?

চীনের এই কর্মশিক্ষা শুধু হাতের কাজ শেখা নয়, 'পেপার মেশে'র বাটি বানানো বা তুলোর ফুল বানানো নয়, এ একটা আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আনার শিক্ষা। মাও-সে-তুং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক দিয়েছিলেন যে, বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে পার্থক্য ভুলে যাক। তাঁর সেই ডাকে সাড়া দিয়েই দেশে এক নূতন ভাব জেগে উঠেছে। মাও-সে-তুং দেখলেন, এই যে নূতন প্রজন্ম, এরা কিছুই জানে না—কি করে দেশের সুখ সমৃদ্ধি এসেছে, শ্রমিক-কৃষকদের দানই বা কি।

বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে ; ওদিকে বুরোক্র্যাট একদল তৈরী হচ্ছে, যারা অহঙ্কারী, দাম্ভিক। এ বিষয়ে রুশ দেশের বুরোক্র্যাসীর বিস্তৃত রূপও তাঁর চোখের সামনে ছিল। জমিদাররা বিত্তবানরা 'ছোটলোক' বলে সাধারণ মানুষকে ঘৃণা করত। এরাও কি করে না ? তবে লাভ হল কি ? কেবল বিত্তই তো বিভ্রম ঘটায় না, বিদ্যাও ঘটায়। কিছু পুঁথিগত বিদ্যা শিখে, দু-চারটি ডিগ্রী জুটিয়ে মানুষ উন্মত হয়ে ওঠে। এবং শুনে শুনে যা বুঝলাম, মাও-সে-তুং-এর মতে দাম্ভিকতা সর্বকর্ম পণ্ডকারী। দাম্ভিক মানুষ নিজেকেও বিচার করতে পারে না, অন্যকেও না। ও দেশে একটা কথা প্রায়ই শুনতাম—বিচার ও আত্মবিচার, ক্রিটিসিজম ও সেল্‌ফ ক্রিটিসিজম। ক্রিটিসিজম এ-দেশে বেশ প্রচলিত আছে, কিন্তু সেল্‌ফ ক্রিটিসিজম বড়ো একটা শোনা যায় না ! যা হোক, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটি কারণ এই দর্পহরণ। এবং আমার মনে হয় ঐ প্রপাগাণ্ডা টীমের কাজ হচ্ছে এই দিকে লক্ষ্য রাখা। আমরা শুনলাম এই স্কুল থেকে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ আঠার শত ছাত্রছাত্রী এখন চাষের কাজ করছে গ্রামে গ্রামে এবং তাচাই-এর মত আদর্শ কমিউন গড়ে তোলার কাজে গ্রামবাসীদের সাহায্য করছে। আর কিছু ছেলে নানা ফ্যাক্টরীতে কাজ করছে, কিছু মিলিটারীতে। এদের দু বছর এইভাবে শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তারপর প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মপথ স্থির হবে। গ্রামের কাজে বহুবিধ ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার, উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগের সুযোগ আছে। 'তাচাই'-এর পথ নিতে গেলে অহল্যাকে হল-কর্ষণযোগ্য করতে হবে। সহজে মাটি বয়ে আনবার ট্রাক্টর ট্রলি তৈরি করে ঐ গ্রামের লোকেরা তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। কোথাও নদীর মুখ ফেরাতে হবে, কোথাও ভগীরথ হতে হবে।

আমি ভাবছিলাম, এত ছেলে যে গ্রামে যাচ্ছে, এরা থাকে কোথায় ? গ্রামের মধ্যে এরা গিয়ে মত্ত হস্তীর মত উৎপাতরূপে প্রবেশ করে নাকি ? আমার মনে পড়ল, ডঃ আরতি সেন একবার আমাদের "খেলাঘরে" পরিচিতি ছেলে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তারা কর্মশিক্ষা দেবে ও নেবে। আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম। চীনে শুনলাম এ ব্যবস্থা খুব ভেবেচিন্তে করা হয়। গ্রামে গ্রামে "মে সেভেন্থ ডে স্কুল" নামে স্কুল বা বোর্ডিং স্থাপিত হয়েছে—সেখানেই ছাত্রছাত্রীরা থাকে এবং গ্রামে কাজ করে। কখনো কখনো চাষীদের বাড়িতেও থাকে। চাষীদের বাড়ি আমি দেখেছি। সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। অন্তত রঙিন ঝকঝকে লেপের কোনো অভাব হয় না ! এই ছাত্ররা শুধু যে উন্নত প্রণালীর পশুপালন, চাষ ইত্যাদিতে সাহায্য করছে তা নয়, সন্ধ্যেবেলায় গ্রামবাসীদের নিয়ে পড়াশুনো করছে, পলিটিকস আলোচনা করছে, মার্কস ও মাও-সে-তুং-এর মতামত বোঝাচ্ছে, কুসংস্কার দূর করছে। সমাজবোধ জাগিয়ে তুলছে। এইভাবে দু বছর এখানে কাজ করবার পর কমিউন বা ব্রিগেডের কমিটি তাদের কে কে ইউনিভার্সিটিতে যেতে চায় তা জেনে সেইভাবে তাদের মন্তব্য পাঠাবে। এদিকে কাজের মাধ্যমেই ঠিক হয়ে যাবে কে কি করতে চায়। তার কর্মক্ষেত্র স্থির হয়ে যাবার পর সে যদি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তা হলে তখন তার বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মক্ষেত্রের কমিটির সুপারিশ পাঠাতে হবে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় তার যোগ্যতা বিচার করে ভর্তি করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া তাই খুব সহজ ব্যাপার নয়। হাতে কোনো কাজ নেই, সম্পূর্ণ বেকার, তাই ল' পড়ি বা জার্নালিজম পড়ি, বাংলায় এম এ-টা দিই, সে রকম হবে না। যে পড়া যথার্থই তার কাজে লাগবে, রুচি এবং দক্ষতায় তার প্রমাণ দিয়ে তবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে হবে। আমাদের এখানে একটি শিশুকে কোনো ভালো স্কুলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করাতে হলে তাকে প্রায় 'কম্পিটিটিভ' পরীক্ষা দিতে হবে—যেন আই এ এস হতে চলেছে। শিশুর পক্ষে যোগ্যতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াটা 'নেই কাজ তো খই ভাজ' হওয়া ঠিক নয়, কিন্তু উপায় কি ? বেকার ছেলেরা সময় কাটাবে কি করে ? আমি একটি লেখক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে হঠাৎ আইন পড়তে ভর্তি হল কেন? সে বলল, বসে বসে কি করব বলুন?—এ রকম নিরর্থ কাজ ওরা করতে দেবে না। একবার ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলে তার আর কোনো খরচ নেই, সমস্ত সরকার বহন করবে। এ কথা এখানে বলা ভালো, চীনে স্কুলে পড়া সম্পূর্ণ অবৈতনিক নয়। জুনিয়র স্কুলে ছ' মাসের মাইনে তিন ইউয়ান বাট সেণ্ট ও সিনিয়ার স্কুলে ছ মাসে চার ইউয়ান। তবে কোনো পরিবারের সামর্থ্য কম থাকলে সরকার সাবসিডি দেয়। পরীক্ষাব্যবস্থা কিছুটা খোলা, কিছু বন্ধ। অর্থাৎ কোনো কোনো বিষয় ক্লাস-ঘরের ভিতরে, কোনো বিষয় কর্মক্ষেত্রে—বাহিরঙ্গনে। কোনো বিষয় পরীক্ষা হয় কোনো বিষয় নয়। শিক্ষকদের মাইনে ১৪০ থেকে ১৫০ ইউয়ান পর্যন্ত।

এই বিদ্যালয়ের কর্মশিক্ষা প্রসঙ্গে শুনলাম, দূরে কোনো পর্বতের উপরে এরা সতেরো শত মো জমি হলযোগ্য করেছে এবং একটি স্কুল-বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। নিজ হাতে।

শিক্ষার প্রসঙ্গটা যখন উঠেছে তখন এখানেই আমরা যে একটি মাত্র ইউনিভার্সিটি দেখেছি সেখানে যা শুনেছিলাম তা লিখে রাখা ভালো। তা হলে শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ ছবিটা পাওয়া যাবে। দুঃখের বিষয়, পিকিং-এ বা অন্য কোনো শহরে আমরা ইউনিভার্সিটিতে যাইনি। আমরা ইউনিভার্সিটিতে গেলাম একেবারে শেষে—ক্যানটনে। চীন ছাড়বার দু দিন আগে ৭ই জানুয়ারীতে। আমার ইচ্ছা ছিল পিকিং-এ একটা ইউনিভার্সিটি দেখি। কিন্তু প্রথম থেকেই সে ব্যবস্থা করা হয়নি। সিংহুয়া ইউনিভার্সিটিও দেখার ইচ্ছা ছিল—যেখান থেকে কালচারাল রেভোলিউশান শুরু। কিন্তু নয়জনের দলে বিশেষত দলের মধ্যে যে অজ্ঞতায় সর্বশ্রেষ্ঠ তার কথায় তো সব ঠিক হয় না। যা হোক, মং-এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব যখন নিঃসংশয় হল তখন আমি তাঁকে বললাম একটি ইউনিভার্সিটি নিশ্চয় দেখতে হবে। ভ্রমণের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউনিভার্সিটি দেখব বলে বিরক্ত করছি। বিজয়বাবু আমাকে বলেছিলেন, 'গোয়াং চাও (Kawng Chao) -তে ইউনিভার্সিটি দেখবেন এখন।' আমি বললাম, 'গোয়াং চাও আবার যাব কবে?' তিনি বললেন, 'কি মুশকিল, গোয়াং চাও যে ক্যানটন, আপনি তাও জানেন না!' বিদেশে কোথায় যেন কলকাতাকে 'কালকুত্তা' বলে আমাকে অমনি হতভম্ব করেছিল।

ক্যানটন শহর থেকে পনের মাইল দূরে চুং সেন বিশ্ববিদ্যালয়—অর্থাৎ সান ইয়াৎ সেন বিশ্ববিদ্যালয়। সান ইয়াৎ সেন-কে ওরা বলে চুং সেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতার মধ্যে ঢুকতে চোখ জুড়িয়ে গেল উদ্যানশোভায়। আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বাইরে পরিচ্ছন্নতার অভাব তখনই মনে পড়ল। পোস্টারে পোস্টারে ভিতরটা কুশ্রী। এরাও খুব পোস্টার দেয়; কিন্তু সেগুলি ছবির মতন। শিক্ষার স্থল—তা কুঁড়েঘরই হোক, বা প্রাসাদই হোক—সেখানে সৌন্দর্যের প্রয়োজন আছে।

> "তুমি মানসের মাঝখানে আসি
> দাঁড়াও মধুর মূরতি বিকাশি
> কুন্দবরণ সুন্দর হাসি
> বীণা হাতে বীণাপাণি।"

বীণাপাণি যেখানে তাঁর চরণকমল রাখবেন তার চারপাশে পদ্ম ফোটা চাই। তার পরিবর্তে দেখি আবর্জনা ও কাগজ ছড়ানো। একমাত্র শান্তিনিকেতন ছাড়া এ বিষয়ে বাংলা দেশই সবচেয়ে উদাসীন। বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া, বম্বের বিশ্ববিদ্যালয়—সবই কাননঘেরা।

উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ির বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে শত শত বিঘা জমি ধু-ধু করছে। কোনো সময়ে কোনো একজন উপাচার্য সেখানে বাগান করবার চেষ্টা করেছিলেন; তারই ক্ষতচিহ্নস্বরূপ শুকনো চৌবাচ্চা প্রভৃতি পড়ে আছে। বর্তমান উপাচার্য স্নেহাস্পদ অম্লান দত্তকে বলেছিলাম কয়েক হাজার গাছ এখানে ওখানে কুঞ্জ করে লাগিয়ে দিতে। হাতার মধ্যে একটি ছোট নদী আছে। তার নামটি খুবই সুন্দর। কিন্তু এখন মনে পড়ছে না। অন্য দেশ হলে ঐ নদীর দু পাশে উইলো তার এলোকেশ নামিয়ে দিত। মাঝে মাঝে কিছু গভীর করে জল রেখে তাতে পদ্ম ফোটাত। আমি অনেকবার অম্লানকে বলেছিলাম যে. তিনি যেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে দর্শনযোগ্য করে তোলেন। শুনলাম—এ কথা উঠলেই হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার টাকার প্রশ্নও উঠবে এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট তেড়ে আসবে। খুবই সম্ভব। কারণ, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট তো জানে না লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুজনের চরণপাতের জন্যই কমল ফোটা চাই। তারা কুবেরের সিন্দুকে কুলুপ এঁটে বসে আছে, অথচ কোন ছিদ্রপথে যে তার থেকে সম্পদ পালিয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম—আপনার ছাত্র-ছাত্রীরা লাগাক। কয়েকজনকে কয়েকটি গাছ লাগাবার ও রক্ষা করবার ভার দিন। কারণ, যত্ন না করলে আর যাই হোক উদ্যান হবে না। ওখানে এত জমি যে, বেশ সন্তোষজনক ফসল উৎপাদনও হতে পারে। কিন্তু কে তা করবে? ছাত্ররা বা অধ্যাপকরা তো ওখানে মালীগিরি করতে আসেননি। তাঁরা বিদ্যাচর্চা করতে এসেছেন। যা হোক, আমি কল্যাণীর অজান দত্তকে বলেছিলাম, 'আপনি নিজে কয়েকটি গাছ লাগাবেন ও জল দেবেন। সেই গাছগুলো আপনার বাড়ির সামনে, নয় হোস্টেলের সামনে বসাবেন। তা হলে দেখবেন সবাই করবে।' আমার আনন্দ হচ্ছে ভেবে, এ আমি তাঁকে দুই বছর আগে বলেছিলাম —চীন দেখবার পরে নয়। তিনি আমাকে খবর পাঠিয়েছেন যে, কয়েক হাজার গাছ লাগানো হয়েছে। কিন্তু তাতে জল দিচ্ছে কে তা জানাননি। সেইটে জানতেই আমার আগ্রহ আজ অনেক গুণে বেড়ে গেছে।

কি মুক্ত কি বদ্ধ—দুনিয়ার কোথাও আজ হাতের কাজে কারু এত অনীহা নেই, যত ভারতীয়দের আছে। সম্প্রতি একজন ইংরেজ ভদ্রলোক 'খেলাঘর' দেখতে এসে ছেলেদের দুধ দুইতে দেখে খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন, "এরা কাজ করছে দেখে বড় ভালো লাগল—ভারতীয়রা কিছু পারে না।" একজন ইংরেজের মুখে এ কথা শুনে স্বভাবতই আমার ভ্রূ কুঞ্চিত হল—'অর্থাৎ?' 'দেখ, আমার শ্বশুরের ভারতীয় পার্সী। তিনি আমার কাছে এক বছর ছিলেন। তিনি কিছু পারেন না।' 'তিনি তো খুব বড় ব্যবসায়ী—তাই না? তবে?' 'তা ঠিক। কিন্তু তিনি একটা ফিউস সারাতে পারেন না। স্ক্রু ড্রাইভার চালাতে পারেন না। এক কাপ চা করে খেতে পারেন না, গ্যাস স্টোভ জ্বালাতে পারেন না।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি গ্লাসে জল ঢেলে খেতে পারেন?' 'না, তাও আমি দেখিনি।'

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যা, সৌন্দর্য ও কর্মকে একসঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে, তবেই জ্ঞান জন্মাবে। নানাঃ পন্থা।

চীনের কথা বলতে গিয়ে দেশের কথা মনে আসে। কারণ, যেখানেই যাই, যা দেখি, দেশকে তো ভোলা যায় না! আমি ইচ্ছে করেই অন্য দেশের নঞর্থক দিকটা বলি না। কারণ, সেটা তারা নিজেরা বলুক। আমার দেশের অপূর্ণতা, অকৃতকর্মের দায়িত্ব যেহেতু আমার নিজেরও, সেহেতু এটা আত্মসমালোচনা—আত্মসমালোচনাই একমাত্র পথনির্দেশক।

সান ইয়াৎ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহটি বিরাট। মাঝে মাঝে থাম—ইয়োরোপীয় স্থাপত্য। ১৯২৪ সালে সান ইয়াৎ সেন এর স্থাপনা করেন। তখন একে বলা হত গোয়াং চৌ ইউনিভার্সিটি। ১৯২৬ সাল থেকে স্থাপয়িতার স্মৃতিতে এর নাম বদল হয়। ওরা যখন সান ইয়াৎ সেনের নাম উল্লেখ করে তখন বলে 'বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভলিউশনারি সান ইয়াৎ সেন।' আমি আর বৎসলা পরস্পর ইশারা করে হাসি ; আমাদের বেশ মজা লাগে। এতগুলি বিশেষণ! ওরা কিন্তু সর্বদাই বিভিন্ন মানুষ সম্বন্ধে এ ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করে রাজনীতির ক্ষেত্রে তা স্থানটি নির্দেশ করে দেয়। এটা যেন একটা ফর্মুলা। যারা অঙ্ক কষে তাদের ফর্মুলা দিয়ে বুঝতে সুবিধা হয়, কিন্তু আমি তো অঙ্ক কষি না! না এরিথমেটিক, না পলিটিক্স—কোনো বিষয়ের অঙ্কেই আমার উৎসাহ নেই। আমি নিশ্চয় জানি, মানুষ ফর্মুলা নয়। তাকে কোনো বিশেষণের গণ্ডীতে বাঁধা যায় না। মানুষ ক্রমাগতই তার নিজের সীমারেখাকে নিজেই উত্তীর্ণ হতে থাকে। বিশেষত সান ইয়াৎ সেনের মত মানুষ সম্বন্ধে সে কথা নিশ্চয়ই সত্য। বর্তমান প্রজন্মের চীনারাও তাঁকে শ্রদ্ধা করে খুবই ; তবে তিনি যে মার্ক্সবাদী ঠিক নয়, বোধ হয়, ঐ বর্ণনার দ্বারা তাই বোঝায়।

যথারীতি সোফায় বসে চায়ের পেয়ালা পাশে নিয়ে নোটবুক বাগিয়ে তথ্য লেখবার জন্য তৈরী হলাম। এখানেও ১৯৬৬ সালের পরে রেভলিউশনারি কমিটি হয়েছে। সেই কমিটির মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রথম অভ্যর্থনা জানালেন এবং ডাঃ কোটনিসের আন্তর্জাতিকতার প্রশংসা করলেন। এসব বিষয়ে ওরা খুব নিখুঁত। প্রত্যেক জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছে। এর পর বলতে উঠলেন ফিজিক্সের প্রফেসর লিটিয়েং চিং (উচ্চারণ ভুল হতে পারে, বানানও, কারণ বক্তৃতা শুনতে শুনতে তো জিজ্ঞাসা করা যায় না, মশায়, আপনার নামের বানান কি?) তিনিও চৌ এন লাই-এর কথা উধৃত করে বললেন, স্বর্গত ডাঃ কোটনিসের স্মৃতি এ-দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না।

প্রথমে এখানে পড়ানো হত ফাইন আর্টস, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, আইন ও শিক্ষক শিক্ষণ। ১৯৫২ সাল থেকে কিছু পরিবর্তন হয়। আর্টস ও সায়েন্সের বিষয়গুলিকে ঢেলে সাজানো হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর এগারোটি ডিপার্টমেন্ট—সাহিত্য, ফিলসফি, বিদেশী ভাষা, ইকনমিকস, ফিজিক্স, অঙ্ক, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, জিয়োগ্রাফী, খনিজ বিদ্যা ইত্যাদি। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে কিছু অতিরিক্ত শিক্ষণীয় বিষয় থাকে—সর্বসমেত বত্রিশটি এরকম বিষয় আছে। শিক্ষক আছেন এক হাজারেরও বেশী। ছাত্র তিন হাজার। এই তিন হাজার ছাত্র নিয়মিত ক্লাস করে। এ ছাড়া শর্ট টার্ম ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সর্বসমেত প্রতি বছর দশ হাজার ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে।

এই তথ্যগুলি পরিবেশন করবার সময় আমি লক্ষ করছিলাম ফিজিক্সের অধ্যাপককে। তাঁর সঙ্গে ও মিলিশিয়া যাঁরা ছিলেন তাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখলাম না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অলিভ রঙের পোশাকে যুবকযুবতী অনেক ছিল। অধ্যাপক বলছিলেন যে, কালচারাল রেভলিউশনের অনেক আগে থেকেই চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং বলছিলেন, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। সেই মান্ধাতার আমলের, খুড়ি, ফিউড্যাল আমলের ভাবনাচিন্তা যখন সব বদলে গেছে তখন শিক্ষার গতিপথও ভিন্ন হওয়া চাই। কিন্তু লিউ শাও চি বদলাতে চান না। তাঁর সেই আগের ভাবে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণও তাঁর মত। তিনিও প্রভাবশালী, তাই যদিও সোস্যালিস্ট দেশে ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কিরকম হবে সে সম্বন্ধে মাও-সে-তুং ভাবছিলেন কিন্তু কিছু করে উঠতে পারছিলেন না। লিউ শাও চি মাও-সে-তুং-এর পরই, তাঁরও যথেষ্ট প্রভাব। কালচারাল রেভলিউশনের পরেই এই আমূল পরিবর্তন সম্ভব হল।

পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচলনা সংসদ ছিল প্রফেসর ভাইস-প্রফেসরদের দ্বারা গঠিত। মাও-সে-তুং বলতেন, শিক্ষাব্যবস্থা খালি বুর্জোয়া ইনটেলেকচুয়ালদের করতলগত থাকলে চলবে না। তাকে সচল করতে সকলের সহযোগিতা চাই। তারপর ১৯৬৮ সালে আমরা দুটি কমিটি তৈরি করলাম। একটি সি পি সি-র (কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না) পার্টি কমিটি, অন্যটি রেভলিউশনারি কমিটি। এই দুই কমিটিতেই ছাত্র, শিক্ষক, কেডার (কেরানী) ও শ্রমিক আছে। নানা বয়সের মানুষ এরা। আমরা একজন ইঞ্জিন ড্রাইভারের সঙ্গে পরিচিত হলাম—তিনি ঐ কমিটিতে আছেন।

ফিজিক্সের প্রফেসর—এখন আর প্রফেসর নয়, শিক্ষক ; এখন সকলেই শিক্ষক, ভেদাভেদ নেই—বেশ বয়স্ক মানুষ। আমার মনে হল এত বয়স্ক মানুষ এরকম একটা পরিবর্তন মেনে নিলেন কি করে? আমাদের সিন্ডিকেটে একজন ইঞ্জিন ড্রাইভার ঢোকালে কেমন হয়? এ তো অত্যাচার! আমি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ পরিবর্তন মেনে নিতে আপনাদের আপত্তি বা অসুবিধা হয়নি? বিদ্রোহ জাগেনি?' 'কারু কারু খুবই হয়েছে, আমারও হয়েছে। বহু তর্কবিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেকেই বুঝেছি যে, এই পরিবর্তনের ফল ভালোই হবে। অনেকে এখনও সন্দিহান।' আমি বললাম, 'আপনি—আপনি এত বয়সে এতখানি পরিবর্তন করতে পারলেন আপনার চিন্তাধারায়?' 'চাউ এন লাই বলেছেন, মানুষ তার মৃত্যুর এক দিন আগেও শিখতে পারে—যতদিন বেঁচে আছে ততদিনই শেখার সময় আছে।' আমি বললুম, 'তা হলে তো আমারও আশা আছে!' ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠল। এতটা হাস্যরসের উদ্রেক হবে তা আমি আগে ভাবিনি। কারণ, কতকটা হালকাভাবে বলা হলেও আমার মনের মধ্যে এ-প্রশ্নটা ছিল যে, আমি কি সহ্য করতে পারতাম, না তাতে কোনো ফল হত!

আমার আবার সেই 'খেলাঘর' ও 'বাদু গ্রামের' কথা মনে পড়ল। সেখানে একজন চাষীকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে গ্রামের কোনো সজ্জন বলেছিলেন, এর খুব চাষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা আছে। কখন কি ফলন হবে, সব বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে। আমি ভাবছিলাম, তার সঙ্গে পাশাপাশি বসে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে, এমন কি শিক্ষালাভ করতে, আমার আপত্তি হতে পারে না। কারণ, তার নিজের বিষয়ে সে আমাকে অবশ্যই শেখাতে পারে। কিন্তু তাকে যদি আমি একজন কমিটির সভ্য করে কর্তৃত্বভার দিতাম তাতে সুফল ফলত না। বেশির ভাগ ফসলই তার নিজের ঘরে উঠত। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশেরই এই ব্যক্তিগত লোভ নানাভাবে শিকড় নামিয়ে দিয়ে গোটা ইমারতকেই নড়বড়ে করে দেয়। এখানে এইসব যে পরীক্ষা হচ্ছে তা সফল হচ্ছে এইজন্য যে, গোড়ার ধাপগুলো ঠিকমত বসানো হয়েছে। আমরা যদি মাঝখান থেকে একটা কিছু পছন্দমত পন্থা বেছে নিয়ে অনুকরণের চেষ্টা করি তা হবে আমাদের পূর্বদৃষ্ট অনেক আন্দোলনের মতই নিষ্ফল। এইসব কথা মনে মনে ভাবতে ভাবতেই আমি বলেছিলুম, তা হলে আমারও শিক্ষার এখনও আশা আছে! তা হাস্যোদ্রেক করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা হাসির নয়, শিক্ষাকে সর্বদিকব্যাপী করতে হলে তা জীবনব্যাপীও হওয়া চাই। ক্রমাগতই ভাবতে হবে, বুঝতে হবে এবং সময়োচিতভাবে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আমার মনে হচ্ছিল, মাও-সে-তুং যে অবিচ্ছিন্ন রেভলিউশন (কন্টিনিউয়াস রেভলিউশন)-এর কথা বলেছেন তা হয়তো এই। কি জানি!

এদিকে ফিজিক্সের অধ্যাপক বলেই চলেছেন নানা তথ্য। আমরা ছাত্র ভরতির ব্যাপারে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের এবং যাদের কাজের অভিজ্ঞতা আছে তাদের প্রাধান্য দিই। সিনিয়ার মিডল স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে এই কার্যিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য হয় গ্রামে, নয় ফ্যাক্টরীতে, কিংবা সৈন্যদের কাছে শিক্ষা নিতে হবে। সম্প্রতি হুয়া কুয়া ফেং-এর একমাত্র কন্যা গ্রামে শিক্ষানবিসি করছেন।

আমাদের এখানে যেমন পশ্চাৎপদ শ্রেণীদের—সিডিউল্ড কাস্ট বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা আছে, ওখানেও তেমনি উচ্চলোকের ছেলেদের চেয়ে শ্রমিকদের ছেলেদের ভরতি ব্যাপারে বিশেষ সুযোগ আছে। ক্যাপিটালিস্ট ও জমিদারদের ছেলেরা যদি রাজনৈতিক মতে উদার হয় তা হলে তাদেরও তেমনি সুবিধা পায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "জমিদার বা ক্যাপিটালিস্ট এখন কোথায়?" তাতে বুঝলাম, তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন নয় এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও যথেষ্ট অবস্থাপন্ন।

অধ্যাপক আরো বললেন, আমরা সাংস্কৃতিক রেভলিউশনের পরে যে প্রধান পরিবর্তন এনেছি তা হচ্ছে এই যে, আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নানা কর্মের যোগ ছিল না ; এখন যা শিখছে তার তৎক্ষণাৎ ব্যবহার হচ্ছে। আমার মনে পড়ল মিডল স্কুলের কেমিস্ট্রির ছেলেরা মাটি ও সার নিয়ে পরীক্ষা করছিল। সেই পরীক্ষার ফলাফল শুনলাম তখুনি চাষীদের জানানো হবে এবং তারাও সেই অনুসারে কাজ করে তাদের মতামত জানাবে। এটাই 'ওপেন ডোর' শিক্ষা। অনেক সময় চাষীদেরও বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে ডাকা হয়। তাতে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ মানুষকে চিনবার সুযোগ পায়। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বললেন, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কমিউনে গিয়ে 'এনটিমোলজি' (কীটতত্ত্ব) সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে এল এবং এ বিষয়ে রিসার্চ করল। তারা দেখেছিল যে, চাষীরা বেসব কীটঘ্ন ব্যবহার করে তাতে নানারকম ক্ষতি হয়, আবহাওয়া দূষিত হয়। এখন তারা রিসার্চ করে উপযুক্ত জিনিস বের করেছে। এবং ক্ষেতে তা ব্যবহার হচ্ছে। বায়োলজির শিক্ষক ফুচি লুং এই কাজের দ্বারা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। আমাদের দেশে পোকার উৎপাত কৃষির ক্ষেত্রে এক সর্বনাশা ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'চায়না রিকনস্ট্রাক্টে'র ষষ্ঠ সংখ্যার এটা পাওয়া যাবে।

শুনতে শুনতে মনে পড়ল কত যুগ আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রকে ও জামাতাকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করতে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখা একখানা চিঠি 'দেশ' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। মোটামুটি তার ভাবার্থ এই—যে নিরন্ন চাষীরা আধপেটা খেয়ে তোমাদের এই বিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছে, ফিরে এসে যদি তাদের এক গ্রাস অন্ন বাড়িয়ে দিতে পার তবেই তোমাদের এ কাজ সার্থক হবে। আর তা না পারলে নিতান্তই অপরাধ ঘটবে। কোটেশনটা এখন খুঁজে পাচ্ছি না ; কিন্তু বক্তব্যটা মনে আছে। সম্ভবত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ নিজেও মনে মনে বুঝতে পারছিলেন, তাঁরা সে আশা সফল করবেন না, করেনওনি। চীন এখন যা বলছে তা কি আমাদের দেশে অনেক আগেই ভাবা হয়নি?

শিক্ষকটি বলে চলেছিলেন, শিক্ষা বিজ্ঞানচর্চা ও উৎপাদন—এই তিনটি কাজ হাতে হাত ধরে চলে, শিক্ষা কেবল বইতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে না। আমি ভাবছিলাম, কোন পৌরাণিক কালে বলা হয়েছে:

পুস্তকস্থা যা বিদ্যা পরহস্ত গতং ধনম্
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্।

একসময়ে বিদ্যা মানুষকে প্রকৃতির কাছ থেকে, অন্য মানুষের কাছ থেকে এত সরিয়ে নিয়ে যেত না যতটা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ও শিল্পের প্রসারের সঙ্গে হয়েছে। আমার বি-এ পড়ুয়া কাকা অনায়াসে একটা গাছ কেটে ফেলতে পারতেন—এখনকার বিলিতী স্কুলে পড়া ছেলের কাছে যা কল্পনাতীত। এদের পেশী নষ্ট হয়ে গেছে।

এর পর অধ্যাপক ওয়াং চি শি বলতে উঠলেন। তিনি চীনা ভাষার শিক্ষক। তিনি বললেন, আমরা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছি। তার বহিরঙ্গ ও আভ্যন্তরিক পরিবর্তন ঘটেছে।

আমি ভাবলুম, আবার চাষবাস কৃষক শ্রমিক উৎপাদন বলতে শুরু করবে। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম—এই দুইয়ের সংযোগ ঘটানো ছাড়া আর কি হয়েছে?' কারণ, ক্রমাগত 'থ্রী ইন ওয়ান'-এর তত্ত্ব শুনতে শুনতে আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। 'থ্রী ইন ওয়ান' হচ্ছে শেখা, তার প্রয়োগ ও উৎপাদন—এই তিনের সমন্বয়।

ওয়াং চি শি আমাদের বিস্মিত করে বললেন, "প্রধান পরিবর্তন এই যে, আমরা আর আমাদের ছাত্রছাত্রীদের শত্রু মনে করি না।" এবার আমাদের হাসবার পালা!

যা হোক, ভেবে দেখলাম এখানে আজকাল ছাত্রশিক্ষকের সম্পর্ককে দুই যুদ্ধশিবিরে স্থিত সম্মুখসমরে অবতীর্ণ দুটি শত্রুদল ছাড়া কি ভাবা যেতে পারে! পুরাকালে গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্কের কথা অনেক শোনা গেছে কিন্তু মহাভারতের আরুণি ও উদ্দালকের কথা মনে পড়লে তা কি ভাবা যায়? কৃতকর্ম পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত শিষ্যকে অন্ধ করে ফেলে তবে শান্তি। আর গুরুপত্নীর কুণ্ডল আনতে গিয়ে কি বিপত্তি! চীন দেশেও ঐরকমই ছিল। এখন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে অনেক ধাক্কা সইতে হয়েছে। অধ্যাপকটি বলছিলেন, বিষয় নির্বাচনেও আমরা ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করি। সমস্ত বিদ্যালয়ে কায়িক শাস্তি বন্ধ। এবং প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অবিবেচনা প্রকাশ করে বা অন্য কোনো উপায়েই আমরা ছাত্রছাত্রীদের মুশকিলে ফেলবার চেষ্টা করি না।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এইসব পরিবর্তনে শিক্ষকরা কি উৎসাহী হয়েছেন? তিনি বললেন, পুরোনো শিক্ষকরা সবাই আছেন। আলাপ আলোচনা করে তাঁরাও বুঝেছেন, বর্তমান নীতিই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ আনবে। এঁরা ছাড়া নূতন শিক্ষকও এসেছেন সৈন্য, শ্রমিক ও চাষীদের মধ্য থেকে। বায়োলজি ডিপার্টমেন্টে আমাদের একজন চাষী শিক্ষক এসেছেন যিনি বীজ চয়নে অত্যন্ত দক্ষ। এই ইউনিভার্সিটি শিক্ষা ব্যাপারকে নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়মিত ক্লাস ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে ক্লাস এবং সংক্ষিপ্ত (শর্ট টার্ম) কোর্স ছাড়াও আমাদের অধ্যাপকরা প্রায় চল্লিশটি মজুরদের ও কৃষকদের শিক্ষায়তনে শিক্ষা দেন। অনেক অল্পবয়সী চাষী ও শ্রমিকই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান, উচ্চশিক্ষা পেতে চান। তার জন্য তাদের নিজ নিজ ফ্যাকটরীতে এবং কমিউনেই শেখার ব্যবস্থা রয়েছে—সেখানে গিয়ে আমাদের পড়াতে হয়। তাঁদের জ্ঞানস্পৃহা একমাত্র এভাবেই মেটানো সম্ভব। একে চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং বলেছেন 'দুই পায়ে' কাজ। এক হচ্ছে কাজ করতে করতে পড়া, আর এক হচ্ছে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, তবে এখনও অনেক বাকি আছে কাজ। অনেক ভাঙাগড়া চলেছে, বহু প্রশ্নের আজও সমাধান হয়নি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে, তিন থেকে সাড়ে তিন বছর পড়া, তারপর কিছুদিন বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ করা। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কেউ বি-এ, কেউ এম-এ, কেউ ডক্টরেট পেত। ১৯৫৮ সাল থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে, এখন ওসব কিছু নেই। সৈন্যদের যেমন র‍্যাঙ্ক নেই—কে ক্যাপটেন, কে কর্নেল বোঝার উপায় নেই—বিদ্যার ক্ষেত্রেও কে এম-এ, কে ডক্টর বোঝার উপায় নেই। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "ডিগ্রী কেন তুলে দেওয়া হল তা বুঝলাম—পাস-ফেলও কি নেই?"—"বিশেষ নয়। একটি বিশেষ সময়ে পরীক্ষা হচ্ছে—সেদিন হয়তো কারুর শরীর ভালো নেই, মন ভালো নেই, বাড়িতে বিপদ হয়েছে, অথচ ঐ পাসের উপর এতই মানসিক ঝোঁক ছিল যে, ফেল করলে কেউ কেউ অনেক সময় আত্মহত্যা করে বসত। অথচ এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়।"

এখানে আমি বিশ্বাস করলাম, ছাত্রছাত্রীদের এরা সত্যই শত্রুভাবে দেখে না। পরীক্ষাটা ছাত্রজীবনে কি ভয়ানক একটা সময়! দিনরাত্রি জেগে পড়া—ভয়, আতঙ্ক—তারপর আজকাল আবার জুটেছে প্রশ্নপত্রের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো। শিক্ষা তো হচ্ছে না, নৈতিক ভ্রষ্টতাও চূড়ান্ত ঘটছে। দোষ দেব কাকে? যেখানে পরীক্ষা পাসের উপর সব কিছু নির্ভর করে—জীবিকা, মানসম্মান, এমন কি বিবাহ পর্যন্ত, সে দেশে পাসের জন্য যে 'যেন তেন প্রকারেণ' কার্যসাধনের পথ ছেলেরা এবং তাঁদের অভিভাবকরা বেছে নেবেন তাতে আশ্চর্য কি! আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাবার সময় আপনারা তাকে কোনো চিহ্ন দেন না?" উত্তরে জানলাম, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট জাতীয় কিছু দেওয়া হয়। "সেটা তাদের কি কাজে লাগে? ওরা স্মারকচিহ্ন (স্যুভেনির) হিসাবে রেখে দেয়। চাকরি পাবার জন্য ওসবের দরকার হয় না। কে কতটা পড়াশুনা সত্যি শিখেছে তা কাজের মাধ্যমেই বোঝা যায়। কারণ, হাতে-কলমে কাজ করবার পর তাদের থীসিস্ দিতে হয়। সেই থীসিসের মাধ্যমেই বিদ্যাবুদ্ধির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।"

সত্যিই পরীক্ষা নিয়ে আমরা জীবনের একটা সময়ে একেবারে উন্মত্তের মত ব্যবহার করি কিন্তু যথার্থ কি তা দিয়ে পরবর্তী জীবনে যোগ্যতার পরিচয় হয়? আমার পিতা বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কখনো স্কুল কলেজে ভালো ছাত্র ছিলেন না। কোনো দিন স্ট্যান্ড করেননি। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমার সঙ্গে যারা ফার্স্ট হত, গোল্ড মেডেল পেত, তারা আজ কোথায়?'

আমি লী-কে বললাম যে, কিছুদিন আগে আমার স্বামী তাঁর আলমারী গোছাতে গোছাতে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেলে দিচ্ছিলেন। তার মধ্যে দেখি বেশ একটু সম্ভ্রান্ত চেহারার গোটানো একটা পার্চমেন্ট কাগজ। তুলে দেখি তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর মানপত্র। আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'এটা ফেলে দিচ্ছ?' তিনি হেসে বললেন, 'ও আর আমার কি কাজে লাগবে?' সত্যিই ডিগ্রী পদগৌরব, জাঁকাল উপাধি—এসব মানুষের অল্প দিনই কাজে লাগে, স্থায়ী বস্তু তার কর্ম ও চরিত্র। যাই হোক, লী শুনে খুব অনুযোগ করতে লাগল—এ গল্পটা আমি সভাস্থলে কেন বললুম না।

চৌ আমাকে বললে যে, আগে যেভাবে পড়ানো হত তাতে পড়ার আনন্দ কমই ছিল। দেখ, আমি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স সবই পড়েছি; কিন্তু সে যেন গিলে এসে উগরে দেওয়া। সব ভুলে গেছি। সে বিদ্যা আমার কাজে কমই লেগেছে। চীনের স্কুলে পাঠ্যোবধির ব্যবস্থা বোধ হয় ভালোমতই ছিল। কালচারাল রেভলিউশনের সুযোগে ছাত্ররাও তার কিছুটা প্রত্যুত্তর দিয়েছে। কালচারাল রেভলিউশন প্রসঙ্গে তার কিছু বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

হল-ঘর থেকে উঠে আমরা বেড়াতে বেড়াতে লাইব্রেরী দেখতে চললাম ও কিছুটা ব্যক্তিগত আলোচনা করবার সুযোগ পেলাম। ইনি দর্শনের অধ্যাপক। এঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ইনি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণাণের বই পড়েছেন, দাশগুপ্তের বই পড়েননি। লাইব্রেরীর পরে আমরা একটা ক্লাসে ঢুকলাম। ছাত্রছাত্রীরা বেঞ্চ ছেড়ে দিল। আমরা বসে পড়লাম ছাত্রছাত্রী হয়ে। পড়ানো হচ্ছিল চীনের প্রাচীন সাহিত্য। এক কবির কবিতা ও জীবন—যাঁর নাম সম্ভবত চুয়ান (নাও হতে পারে)। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪০ সালে জন্মেছেন। সেই সময়ে তিনি দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। আমার স্পার্টাকাসের কথা মনে পড়ল। এখানে আমার মনে হল এঁরা এঁর চিন্তার সারবত্তা অন্যান্য লেখকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে তুলনা করছিলেন। এঁর চিন্তা এতটা এগিয়ে ছিল বলেই ইনি কালজয়ী। কোনো রুশ লেখক এঁর বিষয় প্রশংসা করে লিখেছেন এ কথাও বলা হল। আমরা সামনের সীটে বসেছিলাম, কিন্তু শিক্ষক প্রথম একবার অভ্যর্থনা জানিয়ে তারপর আমাদের দিকে যেন মন না দিয়ে পড়িয়ে যেতে লাগলেন। 'যেন' বলছি এইজন্য যে এরকম কতগুলি আজব জীব সামনে বসে থাকলে কেউ তাদের ভুলে যেতে পারে, এ তো আমার মনে হয় না। তিনি বলছিলেন—প্রথম আমরা ভাবছি তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার কথা, তারপর ভাবছি। তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষের কথা। তাঁর কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তি দুইই ছিল মনোহারী। তিনি আরো একটি আশ্চর্য কর্ম করেছিলেন। ক্ল্যাসিক্যাল ভাষার দুর্বোধ্য ব্যূহ ভেদ করে লোকভাষার ধারাকে সচল করেছিলেন। তিনি তাঁর চারপাশের সমাজের ছবি এক ঐশ্বর্যময় কল্পনায় ও সৌন্দর্যে ভরে দিয়েছেন। এখানে একটা কথা আমার বিস্ময়ের সঙ্গে মনে এল যে জগতে যাঁরা সর্বদাই প্রথা সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে, সমাজের নিয়মের অচলায়তন ভেঙে এগিয়ে যান তাঁরা যে দেশেরই মানুষ হোন, তাঁদের চিন্তাধারায় ঐক্য আছে। জগতের প্রথম বিশ্ববী শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধ লোকভাষাকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি নাস্তিক, যিনি জাতিভেদের গণ্ডী ভাঙলেন। যজ্ঞ বিধির নিন্দা করলেন। নূতন দার্শনিক মত প্রচার করলেন। তিনিই লোকভাষাকে তাঁর ভাবপ্রচারের উপযুক্ত ধারক বলে মনে করেছিলেন। তারপর এ যুগে কথ্যভাষার প্রচলন করতে এগিয়ে এলেন বীরবল ও রবীন্দ্রনাথ। শুরু করলেন 'সবুজপত্র' তাঁদের অভিযান। বীরবলই এ বিষয়ে পত্রপ্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথ সহজেই এর মূল্য বুঝতে পারলেন। সেজন্য তাঁর নিন্দাও হল। কেউ কেউ বললে, ছিঃ, শ্বশুর জামাইকে অনুসরণ করলে!

লাইব্রেরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমি প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা সম্বন্ধে আরো জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম: 'খোলা প্রশ্ন' বলতে কি বোঝায়? শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র লিখে দেন—ছাত্রছাত্রীরা বই দেখে উত্তর লিখতে পারে। সে বই অবশ্যই টেক্সট বই, নোট নয়। সাহিত্য ও কলার ছাত্ররা প্রবন্ধ লেখে—তা নিয়ে সকলে মিলে আলোচনা হয় ও সুপারিশ করা হয়। ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলতেই থাকে। নম্বর দেওয়া উঠে গেছে; শুধু মন্তব্য লেখা হয়: বিদ্যালয় ছাড়বার আগে রিপোর্ট লিখে পেশ করতে হয়।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে গেলে এদেশে তাই আমাদের পদে পদে ঠোক্কর খেতে হবে—কারণ এ গোটা সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। যেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসা যথা নোটবই 'মেইডইজি' বই ইচ্ছামতো ছাপানো চলে সেখানে এ ব্যবস্থা চলবে কি করে?

এসব কথা শুনতে শুনতে ছবি তোলার জন্য মাঠের মধ্যে এগিয়ে গেলাম। আমরা সেখানে 'বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভলিউশনারি' সান ইয়াৎ সেনের প্রস্তরমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। আমরা সবাই তুললাম, শুধু লী এল না। ও কিছুতেই ছবি তুলবে না। এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার বেশ মনোমালিন্য হয়ে গেল। আমরা কি নিজেদের ছবি তুলতে এসেছি, না এখানকার ছবি তুলতে এসেছি? আমাদের মধ্যে কেউই ছবি তোলবার লোক না থাকায় এই এক মুশকিল হয়েছে, আমরা যা চাই সেরকম তুলতে পারিনি। আমার ছবি তোলার বিপর্যয়ের কথা আগে লিখেছি। আর বিখ্যাত লেখিকা হানসুয়ানের সঙ্গে আমার একটা ছবি খুব কায়দা করে হানসুয়ানের চেয়ারের হাতলে বসিয়ে দীনেশ তুলেছিল। তারও সদ্গতি হল না। যেসব জিনিস আর কখনো পাওয়া যাবে না তা সামান্য হলেও তার জন্য মন কেমন করে।

শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সিজিয়াচুয়াং-এর মিডল স্কুল থেকে একেবারে ক্যানটনের শেষ দিনে পৌঁছে গেলাম; অতএব আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে ১০ নং মিডল স্কুলে—সেখানে এখনও একটু কথা বাকি আছে।

স্কুল ও ওয়ার্কশপগুলো দেখার পর প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে আমরা জিমনেসিয়ামে গেলাম। বিশাল ফুটবল খেলার মাঠ। স্কুলবাড়ি ঘোরা, মাঠ পেরোনো—এ সবই আমার পক্ষে রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠছিল। শীতের বাতাস, পায়ের ব্যথা—সব জড়িয়ে তখন একটু বসতে পারলে হয় এমন অবস্থা। জিমনেসিয়ামের মধ্যে বসা গেল। স্কুলের বেঞ্চ ও টেবিল দিয়ে বসার জায়গা হয়েছে। প্রকাণ্ড টিনের আটচালা। ছোট বড় ছেলে-মেয়েদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিমনাস্টিক দেখতে ভালই লাগল। স্কুলের সঙ্গে জিমনাস্টিক শেখবার সুবিধা সব স্কুলেই আছে কি-না জানি না।

তারপর হল কালচারাল ফাংশন। অনেকগুলি নাচ ও বাজনার আসর হল। বাজনার বিশ্বভাষা বুঝতে তো অসুবিধা নেই। উপভোগ্য কনসার্টের মাঝে মাঝে ব্যালে। নাচের মধ্যে ইয়োরোপীয় ভঙ্গীর সঙ্গে চীনা ভঙ্গীর সংমিশ্রণ খুব সুন্দরভাবে ঘটেছে তা আমিও বুঝতে পারলাম ; এবং অতটুকু-টুকু ছেলে-মেয়েদের নৃত্য খুব 'পারফেক্ট' মনে হল—ছন্দে লয়ে মানে এবং সৌন্দর্যে। জিমনাস্টিকের একটি নৃত্য 'চাইনীজ জায়ান্ট' জেগেছে। এই জাগরণের নৃত্য খুব শক্তিশালী। এরা বাছাইকরা ছেলে-মেয়ে নিয়েছে। কারণ, সাধারণত স্কুলের মেয়েদের প্রাইজ ডিস্ট্রীবিউশনের নাচ এত নিখুঁত হয় না। অঙ্গভঙ্গিমা আমাদের চেয়ে একেবারে অন্য। আমাদের মণিপুরী নাচের অঙ্গলালিত্য নেই, ব্যালের উদ্দামতা আছে।

এই গেল সামান্য আঙ্গিকের কথা ; এখন বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তু কেজো। আর সবচেয়ে আমার আপত্তি হল যখন মাও-সে-তুং-এর গান ধরল। গানের মধ্যে মাওচুসি মাওচুসি—এ আবার কি! কানুর গীতির মতন মাও-সে-তুং গীতি! এতে আমি ও বৎসলা পরস্পর ইশারা করলাম—নাচেও পলিটিক্স! কারণ, তখন আমাদের চীন দেশে এক সপ্তাহও হয়নি—আমরা বুঝতে পারিনি চীন দেশে মাও-সে-তুং একজন পলিটিসিয়ান মাত্র নন, তিনি দেশের মানুষের মন-প্রাণ জুড়ে আছেন। চীন দেশে তিনি কানুই। যাই হোক, তখন মাও-সে-তুং-এর নামে বাঁধা গান আমার কাছে কিছুটা উপহাস্য বোধ হলেও কানুর তুলনা মনে এসেছিল বোধ হয় তার আগের নাচটায়—গোয়ালিনীদের দুধ দোয়ানোর নাচে। বালতি হাতে নিয়ে নেচে নেচে দুধ দোয়া দেখেই বোধ হয় ঘোষের নন্দনের কথা মনে এসেছিল।

যা হোক, আমি সম্ভবত লী-কেই বললাম, 'তোমাদের সবই কাজ! নাচের মধ্যেও দুধ দোয়ানো!' তখন সে বললে, 'সব কিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য আছে। দুধ দোয়ানোর কি সৌন্দর্য নেই?' কথাটা বলামাত্র 'ডাকঘর'-এর সেই আশ্চর্য লাইনটা মনে পড়ল। দইওলা অমলকে বলছে যে, অমলই তাকে বুঝিয়েছে দই বেচাতেও কত আনন্দ। সামান্য সাধারণ দৈনন্দিন কাজ, তার মধ্যেও রূপের লীলা রয়েছে। তা দেখবার চোখ যখন পাই—তখনই আমরা বাস্তবের মধ্য থেকে তার বাস্তবতার গণ্ডী উত্তীর্ণ হই। তখনই 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি কেটে যায়,' আর তখনই 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর'—এ গানের অর্থ বুঝতে পারি।

১২ই ডিসেম্বর সকালবেলা আমরা সিজিয়াচুয়াং-এর উপকণ্ঠে একটি সুতোর কারখানা দেখতে গেলাম। দেশে-বিদেশে অনেক কারখানা দেখেছি আমি, বেশির ভাগই ওষুধের কারখানা। আর কুইনাইন কারখানার মাঝখানেই প্রায় বাইশ বছর কাটল। যতদূর মনে হয় কলকাতার কাছাকাছি কোনো একটি কাপড়ের ও সুতোর কল দেখতে গিয়েছিলাম। সে বহুদিন আগের কথা। সেই ভ্রমণে দৃশ্যগোচর বস্তুর মধ্যে কারখানার মালিকের বাড়ির আহার্যবস্তুর কথাই আমার মনে আছে, আর কিছু নয়। এর থেকেই পাঠক বুঝে নেবেন কারখানা দেখার উৎসাহ আমার কতটা। তাছাড়া দেশে যখন আহমেদাবাদের একটাও কাপড়ের কল দেখলুম না তখন এখানে দেখে তুলনা করব কার সঙ্গে।

এই প্রসঙ্গে মনে হচ্ছে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া ভালো। আমাদের দেশের সঙ্গে চীনের ব্যবস্থার তুলনা করা আদৌ উচিত কি-না। আমাকে অনেকে বলেছেন, উচিত নয়। কারণ, চীন একটা পুরোপুরি সোস্যালিস্ট দেশ। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে তারা যে উন্নতি সাধন করেছে তা এখানে কি করে সম্ভব! আমি একথা মানতে পারি না। কারণ যেহেতু আমার দেশ আমার নিজের শরীর মন ও অঙ্গ, যেহেতু আমার দেশ আমার সত্তার একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশ সেহেতু বা কিছুতে আমার উৎসাহ, যা কিছু আমার ভালো মনে হয়, গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তার তুলনা না করে পারব কি? রাশিয়া ও চায়নার তুলনা করে আমার লাভ কি হবে? তাদের উন্নতি বা অবনতিতে মানুষ হিসেবে আমারও হর্ষ বিষাদ হতে পারে, কিন্তু নিজের দেশের সঙ্গে যে আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ জড়িত সেকথা ভোলা যায় না। তাই যেখানেই যাই, যদি কোনো উন্নতি বা সার্থকতা চোখে পড়ে তখন দেহ মন জুড়ে একটি ধ্বনি বাজতে থাকে; সে স্মরণ করায় নিজেরই অকৃতার্থতা। এবং একথাও আমি মানি না যে, সকলের ঠিক একই পদ্ধতিতে সমাজে সমন্বয় সাধন করতে হবে, বা একই লক্ষ্যে পৌঁছবার ভিন্ন পথ থাকবে না। যদি লক্ষ্যটা পরিষ্কার নির্দিষ্ট থাকে তাহলে নিজ নিজ দেশ ও জাতির জীবন ও মননের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা কি পথ তৈরী করে নিতে পারি না? লক্ষ্যটা কি? বেশি রকম জটিলতার মধ্যে না গিয়ে খুব সহজ করে মাও-সে-তুং-এর ভাষায় বলা যেতে পারেঃ "গিভ এজ মাচ এজ ইউ ক্যান, টেক এজ মাচ এজ ইউ নিড" অথবা, উপনিষদের ভাষায় 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্—' ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর, লোভ করো না। কেন লোভ করব না? কেনই বা ত্যাগ করব? কেনই বা যথাসাধ্য শ্রম দেব এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খুধু নেব? কারণ, শেষ পুরস্কার পাবে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সমষ্টির জন্য ত্যাগ করবে। একজন মানুষ যখন সমাজের জন্য শ্রম উৎসর্গ করবে—লোভতাড়িত পশুর মত নয়, মানুষের মত ব্যবহার করবে,—তখনই সে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবে। মানুষ যখন সমাজবদ্ধ জীব, অন্য মানুষের সাহায্য ছাড়া সে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না। অন্য মানুষের ভালো-মন্দর সঙ্গে তার ভালোমন্দ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, তখন সমগ্রের মঙ্গলচেষ্টা তার পক্ষে অসম্ভব কর্ম নয়। অনেকে বলেন, জোর না করলে মানুষ এক কণা ছাড়বে না—তার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চাই। কিন্তু অন্য পথে কেউ কি সত্যি সত্যি চেষ্টা করেছে? আর যে সংগ্রাম করে, সেও তো সুযোগ পেলে সংগ্রামের ফসল তোলে—এও দেখা গেছে। মানুষের মধ্যে মঙ্গলের শ্রেয়ের আদর্শ নেই—একথা বিশ্বাস করা যায় না। সংগ্রামের চেয়ে সম্ভাবের ইচ্ছাটাই সত্যতর। তাই সকলে মিলে দেশ গড়ার কাজে লাগলে সকলে মিলেই তার জন্য ত্যাগ করা যায়, যে ত্যাগ শেষ পর্যন্ত ফলবাহী। সেই সকলকে মেলানোর কাজটাই নেতার কাজ।

'কটন' মিল দেখতে যাবার আগে আমার এইসব কথা মনে হচ্ছিল। কারণ, ইনডাসট্রির ক্ষেত্র থেকেই আমরা শ্রেণী-সংগ্রামের সংগ্রামমুখিনতা এবং উৎপাদনের সফলতা ও বিফলতা দেখতে পাই। উৎপাদনের সফলতার উপরই একটা দেশের উন্নতি নির্ভর করে। আবার শ্রেণী-সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রও সেটাই। মনে মনে এই বিপরীতকে মেলাতে চেষ্টা করছিলুম। সরকারী কারখানাই আমার পরিচিত বেশী। সেখানে মালিক ও মজুরে পার্থক্য শুধু মজুরির তারতম্যে—শোষক ও শোষিত নেই। কিন্তু সেখানেও বিরুদ্ধতা গড়ে ওঠে। সম্ভবত পরস্পরের বোঝাবুঝির অভাবই তার কারণ। পূর্ণ সহযোগিতা হলে অসম্ভব সম্ভব হয়। সেই পূর্ণ সহযোগিতার রসায়ন—দেশপ্রেম।

এই প্রসঙ্গে একটি টেলিফোনে 'ক্রস কানেকশনে'র সংলাপ তুলে দিচ্ছি। দুটি উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর মাতার বিশ্রম্ভালাপ..."তুমি ভাই একেবারেই আসো না।"

"গাড়ি পাই না, পেট্রলের যা দাম!"

"সে কি, তোমার ছেলে অত বড় একসিকিউটিভ—ফ্যামিলির জন্য গাড়ি পায় না?"

"পায়, তবে পেট্রল তো শুধু কাজের জন্য।"

"সে কি! আমার ছেলে একেবারে ট্যাঙ্ক ফুল করে নেয়, তারপর যত ইচ্ছা চড়! তবে আমিও আজকাল বেরুতে পারছি না। ওর রোজ দেরি হয়। ফ্যাক্টরীতে গণ্ডগোল চলেছে। ইউনিয়ানের কল্যাণে। এখন তো ওদেরই রাজত্ব—কেবল এটা চাই, ওটা চাই..." ইত্যাদি। মনে হয় দু দিকে দুই যুদ্ধক্ষেত্র। সেটা শোষক ও শোষিতের নয়—দুই লুব্ধ বাহুর।

আমরা যে তুলোর কারখানায় ঢুকলাম তারও নাম নেই—নম্বর। সিজিয়াচুয়াং-এর এক নম্বর কারখানা। সেখানেও একইভাবে অভ্যর্থনা হল। গ্যাং অফ ফোর-এর নিন্দা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাঃ কোটনিসের অ. জাতিকতার কথা। চীনের এই অকৃত্রিম বন্ধুকে কেউ ভুলবে না সে কথা, ডাঃ বাসুর কথা ইত্যাদি। তারপর চা পানের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন। এই কারখানা ১৯৫৪ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় স্থাপিত হয়। ক্রমে সমস্ত যন্ত্রপাতি নিজেরাই তৈরি করে এখন এটি বৃহৎ কারখানায় পরিণত হয়েছে। এখন এখানে আটাত্তর পার্সেন্ট কর্মীই মহিলা। তিপ্পান্ন হাজার স্পিন্ডল্, এক হাজার তিন শত পঞ্চাশটি তাঁত চলছে। কারখানার যন্ত্রপাতি সমস্তই কর্মীরা নিজেরা বানিয়েছে। অর্থাৎ, সুতাকলের কর্মীরা শুধু সুতোই বানায় না, সুতাকলও বানায়। স্বয়ংনির্ভরতার ব্যাপারটি প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কারখানার পরিচয় দিতে দিতেই অভ্যর্থনাকারীরা রাজনীতির কথা তুললেন। লিউ শাও চি ভেবেছিলেন ব্যক্তিগত লাভের সুযোগ বাড়ালে দ্রুত উৎপাদন হবে ও ফল পাওয়া যাবে। এ মত আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম। আমরা মাও-সে-তুং-এর পথ বেছে নিলাম। চাই শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা, বৈপ্লবিক চেতনা ও প্রলিতেরিয়েতের ডিকটেটরশিপ। তাই কর্মীরাই দায়িত্ব নিল এবং মাও-সে-তুং-এর আহ্বানে 'তাচিং দেখে শেখ' ধ্বনিত করল।

পূর্বে আমরা তাচাই-এর কথা বলেছি। বন্ধ্যা জমিতে কি অক্লান্ত পরিশ্রমে ফসল ফলিয়েছে জনসাধারণ! শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই একযোগে হাতে হাত ধরে তাচাইকে যেভাবে সফল করেছে সেটা শুধু শস্যলাভ নয়, একটা বৃহৎ আদর্শের সিদ্ধিলাভ। আদর্শটি এই—যারা হাতেকলমে কাজ করছে তাদের প্রাধান্য দাও, স্বাধীনতা দাও—তারা কোনোক্রমেই নিকৃষ্ট নয়। যেমন কৃষিকর্মে তাচাই আদর্শ তেমনি বৃহৎ শিল্পে তাচিং আদর্শ। তাই মাও-সে-তুং-এর আহ্বান—'ইন ইন্ডাস্ট্রি লার্ন ফ্রম তাচিং'। তাচিং হচ্ছে একটি 'অয়েল ফিল্ড'। এখানে যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে শ্রমিকরা, বিশেষ করে একজনের নেতৃত্বে অদ্ভুত কর্মযজ্ঞ নিষ্পন্ন করেছিলেন সেই ব্যাপারের সিনেমা-ছবি আমরা দেখেছি। সে সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বলতে হবে। তার আগে সুতো কারখানার ভ্রমণটা সেরে নিই।

এঁরা আরো বললেন যে, কালচারাল রেভোলিউশনের আগে এটা একটা সামান্য কারখানা ছিল, এখন সেখানে সিন্থেটিক সুতো হচ্ছে এবং আড়াইগুণ উৎপাদন বেড়ে গেছে—উৎকর্ষেও উন্নত হয়েছে। প্রতিদিনই উন্নতির দিকে চলেছে। 'গত বছর আমরা ছত্রিশ দিন আগেই লক্ষ্যে পৌঁছেছিলাম। এ বছর ছেষট্টি দিন আগেই আমাদের বৎসরের নির্দিষ্ট কর্ম শেষ হয়ে গেছে। আমরা কনফুসিয়াসের সেই বাক্য মানি না যে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বোকা, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা জ্ঞানী। আমরা শ্রমিকদেরই নেতৃত্ব দিচ্ছি। তারা প্রাণপণ করে কাজ করছে। কেডাররা অর্থাৎ কেরাণীরা ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ব্যবহার করছে, যাতে সময় বাঁচে। আমরা সেই নীতি গ্রহণ করেছি—সামর্থ্য অনুসারে দাও, প্রয়োজন অনুসারে নাও। টাকার জন্য কাজ ক'রো না। এই প্রতিষ্ঠানের তোমরা প্রভু, দাস হয়ো না। শ্রমিকরা রাত্রে পড়াশুনো করে—বিশেষ করে মার্কস, লেনিন ও মাও-সে-তুং। তাই তাদের চিন্তাশক্তি সুসংবদ্ধ, যুক্তিনির্ভর।' মাইনে ইত্যাদি বিষয়ে আগে যা লিখেছি মোটামুটি সেইরকম। যে কোনো কারখানায় ঢুকতে গেলে বয়স অন্তত সতেরো হওয়া চাই। অর্থাৎ, মিডল স্কুল পার হবার বয়স।

সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ ও আলোচনা শেষ করে আমরা ফ্যাক্টরী দেখতে ঢুকলাম। সেটা ভালই হল। কারণ, ফ্যাক্টরীর মধ্যে কোনো আলোচনা হওয়া সম্ভব ছিল না—এত প্রচণ্ড শব্দ। ঢুকতেই আমাদের মুখে সাদা কাপড়ের মুখোশ পরিয়ে দেওয়া হল। যাতে ধোনা তুলোর টুকরো নাকে মুখে ঢুকে না যায়। কেউ কেউ কানেও তুলো গুঁজলেন। আমি গুঁজিনি। ভাগ্যিস গুঁজিনি। কারণ, মাও-সে-তুং পত্নী চিয়াং চি নাকি ফ্যাক্টরী দেখতে গিয়ে কানে তুলো দিত, তাতে তাঁর খুব নিন্দে হয়েছিল, 'ইস, সোস্যালিস্ট দেশের কন্যা—ফ্যাক্টরীর শব্দ শুনলে কানে ব্যথা লাগে! নবাবনন্দিনী আর কি!'

বিরাট কারখানা সব ঘুরে ঘুরে দেখা আমার পক্ষে বড়ই ক্লান্তিকর। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, শুধু আমার দোভাষীরা কেউ না কেউ আমাকে সহায্য করছে। এসব সময় ঐ গানটা খুব মনে পড়ে—'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু, পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু...' পিছিয়ে পড়লে বড় আত্মগ্লানি হয়। শারীরিক ও মানসিক দুই অর্থেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা জায়গায় দেখলাম সাদা কাগজ ঝুলছে—তাতে অনেক কিছু লেখা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "এটা কি লী? এতে কি লেখা আছে?" সে বললে, "সমালোচনা।"

"কার সমালোচনা?"

"ওদের কর্মকর্তার। ডিরেকটরের সমালোচনা করেছে।"

"অর্থাৎ, সমালোচনা লিখে ঝুলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে কাজকর্ম করছে?"

আমি শুনলাম এ সর্বত্রই হয়। হেমাঙ্গবাবুর লেখা চীনের অভিজ্ঞতাও পড়লাম—হাসপাতালে একদিন তিনি দেখলেন তাঁর নার্সের আঙুলে লাল কালির দাগ। জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, সে একটু আগেই একজন বড় ডাক্তারের বিষয়ে সমালোচনাপত্র লিখে টাঙিয়ে দিয়ে এসেছে। বড় ডাক্তারটি অত্যন্ত ভদ্র ও ভালো। তিনি ওদের ওপরওলা। তাঁকে হেমাঙ্গবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নামে নিন্দাবাদ লেখা হয়েছে আপনি জানেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবং মোটামুটি স্বীকার করলেন যে, অভিযোগগুলি সত্য। যেসব বিষয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করা উচিত ছিল তা তিনি নিজেই 'অটোক্রেটিক' ভাবে স্থির করেছিলেন।

আমি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "সর্বত্রই কি এভাবে সমালোচনা লেখা হয়? ফ্যাক্টরীতে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে?" উত্তরে জানলাম, এরা পরস্পরের কার্যের সমালোচনা সর্বত্র এইভাবে পোস্টারে টাঙিয়ে দিলে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা আত্মসমালোচনাও হয়। এরা সেলফ-ক্রিটিসিজম্-এর কথা খুব বলে।

পোস্টার কয়েকটি ঝুলিয়ে দিয়েছে; তাতে বোঝা যাচ্ছে অভিযোগ আছে। কিন্তু সমস্ত ফ্যাক্টরীর মধ্যে কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই। যে যার টুলে বসে বা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে যেন ঐ যন্ত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করছে। মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাস্য করলেও তাদের কাজের সূত্র ছিন্ন হচ্ছে না।

কিছু দিন আগে এ-দেশের 'ঘেরাও' উৎসবের কথা মনে পড়ল। অভিযোগ থাকা মানেই তো তাণ্ডব। উৎপাদন বন্ধ করাই প্রগতি। কিন্তু চীনে তা নয়। বিপ্লবের অর্থই হচ্ছে উৎপাদন বাড়ানো। উৎপাদন বাড়লে তবেই অবস্থান্তর ঘটবে, নইলে নয়। এখানে কথা হচ্ছে—কার অবস্থান্তর? লাখপতিরা কোটিপতি হবেন—এটা কি অবস্থান্তর? এটা ব্যক্তিবিশেষের অবস্থান্তর হলেও দেশের নয়। তাই এই টানাটানি দুই লোভী হাতের। কেউ দশ টাকা বাড়াতে চায়, কেউ দশ হাজার। কেউই বাড়াতে চায় না দেশের এবং সকলের সম্পদ। আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ন্যাশানালাইজড্ হয়েছে সেখানেও তাই দেখি একইরকম কর্মে অনীহা এবং সেটা প্রায় সর্বব্যাপী। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম চীন এমন করে কোন্ রসায়নে সকলকে মেলাল? কর্মীদের অভিযোগ আছে, তারা তা ব্যক্ত করতেও পারে এবং ওপরওলাও তা শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন—কাজ নির্বিঘ্নে চলে। বড় আশ্চর্য ব্যাপার। আমাদের দেশেও যদি সব ক'টা মালিকের কারখানা সরকার নিয়ে নেয় তা হলেও সমস্যার সমাধান হবে কি?

১৯৫৫ সালে রাশিয়ায় একটা সিগারেট ফ্যাক্টরী দেখেছিলাম। সেখানে প্রত্যেক ঘরে সেই ঘরের শ্রেষ্ঠ কর্মীর ছবি টাঙানো হয়েছে। সেই মাসের উৎপাদনে যার দান সবচেয়ে বেশী তাকে এইভাবে তারা উৎসাহ দিচ্ছে, কর্মে প্রেরণা দিচ্ছে। তখনই তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, এটাও আদর্শ নয়। আদর্শ যখন প্রত্যেকে কাজের জন্য কাজ ও সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করে আনন্দ পাবে। সে কাজ করবে অর্থের লোভ না করে, কর্তব্যবোধে। কিন্তু দ্রব্য গুছিয়ে নেবার জন্য নয় এবং কতটা কাজ করবে তাও কোনো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে নয়, স্বতোৎসারিতভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে; কারণ, তখন তাদের সাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করার অভ্যাস ও অনুরাগ জন্মেছে।

এ-ও কি আবার হয় নাকি? রাশিয়াতে শুনছি পথ বদলে ফেলেছে। কারণ, পুরোনো বুদ্ধি মাথা তুলেছে। তারা মনে করেছে ব্যক্তিগত লাভের আশায় কাজের প্রেরণা বেশী হবে। কিন্তু মাও-সে-তুং সে পথ নেবেন না—তাঁর বিপ্লব আভ্যন্তরিক। তিনি মানুষের অন্তরকে বদলাবেন। মানুষ লোভের তাড়নায় কাজ করবে না, তার চেয়ে উচ্চতর ভাবনা থেকে প্রেরণা পাবে। এও কি বিশ্বাস করা যায়? এটা কি অসার কল্পনা নয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেনিনগ্রাদ স্টেশনে ভেরা নভিকভা আমাকে নিয়ে দৌড়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল—ট্রেন তখন ছাড়ো-ছাড়ো। আমি বললাম, "টিকিট করলে না?"

নভিকভা হেসে বললে, "কমিউনিস্ট দেশে টিকিট কিনতে হয় না—পরে দিলেও চলবে।"

"তাই নাকি? কি আশ্চর্য!" তখন নভিকভা টিকিট বের করল। আগেই করা ছিল। সে ঠাট্টা করছিল। বলল, "এখনও তো আমরা কমিউনিস্ট হইনি। যখন সত্যিকার কমিউনিজম আসবে তখন মানুষ নিজে থেকেই সৎ পথে চলবে।"

চীনে শুনলাম কোনো কোনো জায়গায় কর্মীরা নিজেরাই নিজেদের ওয়ার্ক পয়েন্ট ঠিক করে, অর্থাৎ নিজেদের পাওনার হিসাব নিজেরাই করে। আমি যে আবহাওয়াতে বাস করি সেখানে এ কথার অর্থবোধ করাই শক্ত। যেখানে টাইমে কাজ হয় না, ওভারটাইমে হয়। আবার উচ্চতম প্রতিষ্ঠায় থেকেও চৌর্যবৃত্তি চালাতে ধনী ও মানীরাও লজ্জিত হয় না। শুনেছিলাম যখন কালো টাকার সন্ধানে পুলিসের আক্রমণ হত তখন ওটা একটা 'স্টেটাস সিম্বল' হয়েছিল। একজন আর একজনকে ডেকে বলত, 'আমারও একটা রেইড হয়ে গেছে!'

কিন্তু এই কি আমাদের সমাজ? আমাদের সমাজে মারুতি কারখানাই কি একমাত্র সত্য? ফলের লোভ ত্যাগ করে কর্ম করতে কোন্ দেশে বলা হয়েছিল? ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করার অর্থ কি? ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সমস্ত কর্ম সংসারকে উৎসর্গ করা।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্—

এই যৎ শ্রীকৃষ্ণ। সব তাঁকেই অর্পণ কর। কিন্তু তাঁকে তো আমরা এখন চোখে দেখি না। আমরা দেখি মানুষকে, মানুষের সমাজকে। তা আরো কাছে, আরো বাস্তব। তার জন্য কি সব কর্ম অর্পণ করা যায় না?

ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে আমরা শ্রমিকদের সংসার দেখতে গেলাম। তিন-চারতলা বাড়ি অনেকগুলি। এখানে যেরকম সরকারী কোয়ার্টার্স হয় সেইরকমই। যে ফ্ল্যাটে আমরা গেলাম—অর্থাৎ আমরা দু-তিনজন করে এক একটা ফ্ল্যাটে গেলাম—আড়াইখানা ঘর ও ছোট একটি রান্নাঘর নিয়ে তিনজনের সংসার। মা, বাবা ও মেয়ে। ছেলে অন্যত্র কাজ করে। আমরা যে ঘরে বসলাম, ঘরের আধখানা জুড়ে ঢালা বিছানার জন্য তক্তপোশ পাতা, তার উপর রঙীন সুন্দর লেপের থাক সাজানো। লেপগুলি ওয়াড় ছাড়া এত পরিচ্ছন্ন কি করে থাকে তার সদুত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমি সব কথা শুনতে পেলাম না। মেয়ে, মা, বাবা—তিনজনেই এই তুলো কলে কাজ করেন। মেয়েটি চা নিয়ে এল। একেবারে কচি চেহারা। শুনলাম ওর সামনের সপ্তাহে বিয়ে হবে। জামাইও এই কলেই কাজ করে। বিয়ে নিজেরা ঠিক করেছে। আমি শুনেছিলাম বয়স পঁচিশ না হলে মেয়েদের বিয়ে হতে পারে না। একে দেখে কিন্তু ষোলোর বেশী মনে হচ্ছিল না। একেবারে নরম সলজ্জ মুখ—দুদিকে দুটি বিনুনি ঝোলানো। এই শ্রমিক পরিবারটির কর্তা-গিন্নী মধ্যবয়স্ক। তাদের পোশাকপরিচ্ছদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ছোট একটি রান্নাঘর ও দুখানি ঘরে তাঁদের বাড়ি আমাদের সকলেরই বাসযোগ্য। এরা দেখলুম তরিতরকারি বারান্দায় স্তূপ করে রাখে। ঠাণ্ডা বাতাস ও বরফে তাজা থাকবে বলে। যখন বেরিয়ে চলে আসছি, সমস্ত অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে লোকজন বেরিয়ে এসেছে—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সবাই মিলে চীন-ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ বলছে। অবশ্য আমাদের ভাষায় নয়—ওদের ভাষায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোটেলে ফিরে শুনি মহাকবি একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি সকলের খুব ভালো লেগেছে। তারাচাঁদ গুপ্ত মহাকবির কবিতার খুব ভক্ত। খেতে বসে বিজয় বসু বললেন, 'মহাকবি, শোনাও তোমার কবিতা।' মহাকবি ক্রমাগত গ্যাং অফ ফোরের নিন্দা শুনে শুনে খুব উৎসাহ পেয়েছিলেন। তাদের নাম দিয়েছিলেন 'দুষ্ট চতুষ্টয়' মহাভারতের অনুসরণে। তাঁর মতে, মহাভারতেও কুকর্মকারী দুষ্ট চতুষ্টয় ছিল—দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ। অবশ্য কর্ণকে আমি কুকর্মকারী বা দুষ্ট বলতে চাই না। আমার মতে, কর্ণ যথার্থ বীর ও ভদ্রলোক। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরও তাই মত। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' লিখেছিলেন। যা হোক, মহাকবির কবিতাটি এইরকম :

'জন চায়না
কষ্টজীবীজনরঞ্জন চায়না
দুষ্ট চতুষ্টয় ভঞ্জন চায়না।'

কষ্ট, দুষ্ট, রঞ্জন, ভঞ্জন প্রভৃতি শব্দের উপর খুব জোর দিয়ে দিয়ে পড়লেন মহাকবি। সকলের খুব ভালো লাগল। বিশেষ করে তারাচাঁদ গুপ্ত খুব গর্বিত—যেন কৃতিত্বটা তাঁরই। আমারও ভালো লাগল। আমি বললাম, 'আপনার ছন্দ খুব ভালো।'

মহাকবি বললেন, 'অনুপ্রাস।' তখন আমার মনে হল সারা ভারতবর্ষকে যদি একসূত্রে কেউ বেঁধে থাকে তা এই সংস্কৃত ভাষা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহাকবি, আপনি রেভোলিউশনারি কবি হয়ে এ ভাষায় লিখলেন কেন?' বুদ্ধিমান মহাকবি বললেন, 'সমস্ত ভারতবর্ষ বুঝবে বলে।' প্রাদেশিক ভাষা আমাদের জীয়নকাঠি ঠিকই, তবে সংস্কৃতকে আমরা বড় অবহেলা করছি—আসমুদ্র হিমাচল এই ভাষার বন্ধনে এক হয়ে আছে।

AMARBOI.COM

১২ ডিসেম্বর বিকেলবেলা আমরা একটি বৌদ্ধ মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরটি সিজিয়াচুয়াং-এর উপকণ্ঠে একটি কাউন্টিতে স্থিত। বেশ কয়েক মাইল গ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়িগুলি চলল। দুধারে ছবির মত সবজির ক্ষেত—সমান রেখায় সাজানো মাইলের পর মাইল। মাঝে মাঝে একটু আলের উপরে পপলার তরুশ্রেণী। ওরা উইণ্ডব্রেকার ; অর্থাৎ, উত্তরের হিম-বাতাস আটকায়। চীনে যেখানেই শহর থেকে বেরিয়েছি, বিস্তীর্ণ সজ্জিত সুফলা শস্যক্ষেত্র চোখ জুড়িয়ে দিয়েছে। চাষের অবস্থা, ফলনের অবস্থা বোঝবার জন্য বক্তৃতা শুনতে হয় না। যদিও বক্তৃতাতেই জানতে পারি যে, প্রতি বৎসরই ওরা টার্গেটটা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

আমরা যখন বৌদ্ধ মন্দিরে পৌঁছলাম তখন দিনের আলো পড়ে এসেছে। এই মন্দির এখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে রয়েছে—ধর্মস্থান নয়। এর একটি সংরক্ষণ কমিটি আছে—তারও নাম রেভোলিউশনারি কমিটি।

যথারীতি চায়ের সঙ্গে গ্যাং অফ ফোর-এর নিন্দা শুনলাম। এদের এখন থেকে আমরা 'দুষ্ট চতুষ্টয়' বলব। একবার সংস্কৃতে কবিতা লেখা হলে পরে আর বিশ্রী ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন কি? যা হোক, গ্যাং অব ফোর কথাটা শুনেছি কবি দু সুনের কোনো লেখা থেকে নেওয়া। সেইজন্যই বোধ হয় মহাকবি মহাভারতের 'দুষ্ট চতুষ্টয়'-এর কথা ভেবেছেন—অনুবাদটা তাই ঠিকই হয়েছে। তবে কর্ণ দুষ্ট নয়; বরং ভীষ্মকে দুষ্ট বলা যেতে পারে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হচ্ছে, অথচ বুড়ো চোখ বুজে বসে রইল। দুষ্ট নয়তো কি! যা হোক, আমি শুনলাম এই 'গ্যাং অব ফোর' কথাটা নাকি মাও-সে-তুং-এর মুখের কথা। তিনি যখন বৃদ্ধ ও অসুস্থ তখন তাঁর পত্নী চিয়াং চিং তাঁর কাছে ক্রমাগত চৌ এন লাই-এর নামে নিন্দা করতেন। শুধু তিনি নন, তাঁর অন্য তিনজন বন্ধুও সেই সঙ্গে যোগ দিতেন। এই চারজন মিলে যে দল, আজকাল যে 'ককাস' বলে কথাটা শুনেছি, তারই সঙ্গে উপমেয় একটি দল তৈরী হয়েছিল। তখন মাও-সে-তুং তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন, 'বি ওপেন, ডু নট কনস্পায়ার। ডু নট বিহেভ লাইক এ গ্যাং অব ফোর'—এরই থেকে এরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গ্যাং অব ফোর' কথাটা তুলে নিয়েছে।

কোনো প্রতিষ্ঠানে ঢুকলেই একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্যাং অব ফোর-এর নিন্দা করে এবং হুয়াকুয়া ফ্যাং-এর আগমনকে স্বাগত জানায়। ওরা বলে, 'তোমরা এসেছ অত্যন্ত সুসময়ে যখন গ্যাং অব ফোর-এর অত্যাচার শেষ হয়েছে, হুয়াকুয়া ফ্যাং দৃঢ়ভাবে হাল ধরেছেন, দেশে পর্যাপ্ত শস্য উৎপাদন হয়েছে, চীনে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে।' হুয়াকুয়া ফ্যাং যে মাও-সে-তুং-এর নির্বাচিত অনুমোদিত নেতা সে কথা ওরা মনে করিয়ে দিতে ভোলে না।

অভ্যর্থনা ও চা পর্বের শেষে আমরা মন্দির দেখতে বেরুলাম। বৃহৎ চত্বরে অনেকগুলি মন্দির। সবচেয়ে বড়টি পাঁচ-ছয়তলা তো বটেই, আরো উঁচু হতে পারে। সমস্তই কাঠের তৈরী—গালার রঙীন কাজ। গালার আবরণের ফলে কাঠটা রক্ষা হয়। এক একটা কাঠের গুঁড়ি অতি বৃহৎ। হাজারখানেক বছর আগের তৈরী এসব মূর্তি বেশ ভালোই আছে। বড় মন্দিরটিতে ঢোকা গেল না, মেরামত হচ্ছে। শুনলাম এই মন্দিরের নাম 'হাইডিং ড্রাগন'। কেন ঐ নাম তা বুঝলাম না। চীনের স্থাপত্যে ড্রাগন থাকবেই। একটি প্রায় পাঁচ-ছয় মানুষ লম্বা দেবীমূর্তি, 'করুণা' দেবীর—গডেস্ অব মার্সি'। আর একটি চতুরাস্য মূর্তিকে ওরা বললে চতুর্মুখ বুদ্ধ। বুদ্ধের আবার চতুর্মুখ হবে কি করে? ও নিশ্চয় ব্রহ্মা বা ভারতীয় কোনো দেবতা।

যা হোক, চীনা স্থাপত্য যদিও ভারতের থেকে পৃথক, সাজসজ্জা নকশা সবই ভিন্ন, তবু মূর্তিগুলি দেখলেই বোঝা যায় ভারতের ধর্মই সেখানে গিয়েছে। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব থেকে পর পর্যন্ত এই যাতায়াত বহু দিন ছিল। আবার তিব্বতে যেমন চাকা ঘুরিয়ে মন্ত্র পড়া হয় তাও দেখলাম। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম, যতদূর জানি, চীন ও নেপাল থেকে গিয়েছিল। তিব্বতী রাজা স্রংসেনগাম্পোর চীনা ও নেপালী পত্নী তাঁকে এই ধর্মে উৎসাহিত করেন। সেটা বোধ হয় সপ্তম শতাব্দীতে। তবে বৌদ্ধধর্মের চক্র ভারত থেকে চীন, সেখান থেকে তিব্বত, তারপর ক্রমাগতই ভারত-তিব্বত-চীন ও চীন-তিব্বতে ঘূর্ণিত হয়ে বৌদ্ধধর্মপিপাসুদের তৃপ্তি দিয়েছে।

বোধ হয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পড়েছিলুম, চীন দেশে ভারতীয় পণ্ডিতদের মূর্তি তিনি দেখেছিলেন। এই প্রশ্ন করে আমি কোনো সদুত্তর পেলাম না। অবশ্য দোভাষীরা তো সবজান্তা নয়, তবে তাঁরা আমাকে বললেন, হিউয়েন সাং-এর সমাধিমন্দির আছে। সেটা উত্তরে। এখন বরফে ঢাকা সে দেশ। যা হোক, হিউয়েন সাং-এর সমাধিক্ষেত্র দেখার আগ্রহ তত নেই। কারুর সমাধিক্ষেত্র দেখতেই আমার উৎসাহ নেই। তিনি ভারতবর্ষ ও চীনকে যে এক অখণ্ড সূত্রে আবদ্ধ করেছেন সেজন্যই তাঁর নাম স্মরণীয়। ভারতে আসার জন্য তাঁর যে শ্রম, যে আগ্রহ এবং তাঁর চরিত্রের যে অসীম দার্ঢ্য তাঁর ডায়রীর ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত, সেই ডায়রীই তিনি। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গও তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করেছেন। বস্তুত, এ-দেশ থেকে তাঁর ফিরে যাওয়াই কঠিন হয়েছিল।

ভারতবর্ষ থেকে চীন দেশে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমরা জানি না। দীনেশ সেন মহাশয় তাঁর বৃহৎ বঙ্গে' লিখেছেন, '৩৫৭ হইতে ৩৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যাদি বিষয় লইয়া অন্তত দশবার চীনা রাজদূতরা ভারতবর্ষে গমনাগমন করিয়াছিলেন। ফা হায়েন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু চীন পরিব্রাজক তীর্থদর্শন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার জন্য এ-দেশে আসিয়াছিলেন এবং আর্যাবর্তবাসী বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত চীনে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮৩ খৃী অব্দে কুমারজীবের চীন গমন এ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানের বৌদ্ধগণের প্রথম প্রচেষ্টা।' অশোকের এক মন্ত্রী—তাঁর নাম বক্ষ—নির্বাসিত হয়ে চীন দেশে যান। সাত শ' অনুচর নিয়ে তিনি চীন দেশে গিয়েছিলেন ও এক প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তিব্বতেও অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত যান। তার মধ্যে শান্ত রক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্করের কথা সবাই জানে। তিব্বতের রাজা চ্যাংচুবের অক্লান্ত চেষ্টায় দীপঙ্কর তিব্বত যান। সেখানে তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভার প্রভাবে প্রায় তিব্বতের কর্তা হয়েছিলেন। তাঁর বিদ্যার খ্যাতি সমস্ত বৌদ্ধ রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। দীনেশচন্দ্র লিখছেন, 'কথিত আছে, চীন দেশের অমিতবিক্রম সম্রাটগণ দীপঙ্করের নাম শুনিলেই সিংহাসন হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থাপন করিতেন।'

হাইডিং ড্রাগন মন্দিরের চত্বরে অনেকগুলি মন্দির। মন্দিরগুলির উচ্চতা খুব বেশী। ঘাড় একেবারে সম্পূর্ণ সমান্তরাল করলে দেখা যায়—বহু দূরে ঊর্ধ্বে তার ভিতরের সীমা। সমস্তটা কাঠের তৈরী। এক-একটা থাম এত লম্বা—বোঝা যায় যে, আদিম অরণ্যের প্রাচীনতম গাছ কেটে আনা হয়েছে। সমস্ত কারুকার্য করা থাম রঙীন ল্যাকারাঙ্কিত। আমি ভাবছিলাম, মাঝে মধ্যেই তিব্বত, চীন ও ভারতের মধ্যে কতটা যাতায়াত হয়েছে তার পরিষ্কার চিহ্ন এই মন্দির ও মূর্তিগুলির মধ্যে পরিদৃশ্যমান। যদিও মন্দিরের স্থাপত্য ও স্থাপত্যের উপকরণ একেবারে ভিন্ন। বুদ্ধদেব তাঁর মূর্তি তৈরি করতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর প্রথম মূর্তি তৈরি হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর বহু বৎসর পর। সে নিশ্চয়ই তাঁর অবিকল প্রতিকৃতি হয়নি। আর আজ সমস্ত পূর্ব জগৎ জুড়ে তাঁর মূর্তি ছড়িয়ে রয়েছে। একটি সহস্র বুদ্ধের শতদল দেখলাম। ছোট ছোট মূর্তি দিয়ে একটি পদ্মের মত।

আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি চীনারা কখনই ধার্মিক নয়। অর্থাৎ, যে অর্থে ভারতীয়রা ধার্মিক সে অর্থে নয়। ভারতীয়রা ধার্মিক হলেও মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে ধর্মের রূপ-পরিবর্তন হয়েছে। ধার্মিক তিব্বতেও ধর্মের নামে যখন ব্যাভিচারই প্রচণ্ড হয়েছিল তখন অতীশ দীপঙ্কর গিয়েছিলেন সদ্ধর্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য। তার পরেও অনেকে গিয়েছেন। তার মধ্যে একজনের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি। এঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা, এঁর মুক্ত বুদ্ধি আজকের দিনেও দুর্লভ। এই প্রসঙ্গে এখানে তাই সেটি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

এই ভারতীয় পণ্ডিতের নাম বোধিধর্ম। ইনি চিনেও গিয়েছিলেন। এঁর ঘরে কোনো দেবতার মূর্তি রাখতেন না, রাখতেন একটি মাত্র বুদ্ধমূর্তি। যেমন আমরা প্রিয়জনের ছবি রেখে থাকি। তাঁর শিষ্য নাম লো-সু, এটা তিব্বতী নাম নয়, সম্ভবত চীনা। তিনি যে মত প্রচার করতেন, তা এই : 'ধর্ম মানুষের স্বভাব। তাহা শূন্যতার অপর নাম। ধর্মগ্রন্থ কোনো শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। সেই অলিখিত গ্রন্থ মানুষের পরিবর্তনশীল স্বভাবের অনুবর্তী হইয়া নিরন্তর ক্রমবিবর্তনের পথে চলিতেছে। প্রকৃত ধর্ম মানুষের ভিতরের জিনিস, উহা বাহিরের কিছু নহে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তত্ত্ব না বুঝিয়া যে-সে পুস্তক হাতে লইয়া শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। জলের প্রবাহ, বাতাসের সুর সেই মহাশাস্ত্রের বাণী, তাহা শুনিলেই ধর্মের স্বরূপ বুঝিবে। মিছামিছি কতগুলি বই হইতে শ্লোক ও প্রার্থনা কর কেন? ঐ যে আকাশচুম্বী পর্বত, ঐ দূরগামিনী নদী, এই অদ্ভুত জগৎ—এ সমস্ত কি তাঁর বিগ্রহ নয়? কেন তুলি ছাঁচ ও রং লইয়া বৃথা প্রয়াস পাইতেছ?' মন্দিরে ধূপ-ধুনা জ্বালাবার প্রশ্নে তিনি বলেন, 'অজ্ঞ লোকেরা জানে না ধূপ-ধুনা নিজের অন্তরেই আছে। প্রকৃত ধূপ-ধুনা আত্মসংযম, জ্ঞান, ধৈর্য, দয়া, দ্বিধাশূন্যতা, ভক্তি এবং অভিজ্ঞতা।...... যদি মানুষের প্রকৃতি উজ্জ্বল হয় তবে তাহার কাছে স্বর্গ আঁধার থাকিবে না। নিজের মধ্যে আলো থাকিলে স্বর্গ ও পৃথিবী আপনা-আপনি সাধকের কাছে আলোকিত হইবে। এই আলো লাভ করিলে মানুষ দেখিবে বিধাতার বিধান অনন্ত, তাহার প্রত্যেকটি স্পষ্টভাবে তখন চক্ষে পড়িবে।' (শরৎচন্দ্র দাসের 'ইনডিয়ান পণ্ডিত' ইন দ্য ল্যান্ড অব স্নোস্)

এমন স্বচ্ছ সত্য বিজ্ঞানমুখী ধর্মব্যাখ্যা আজকের যুগেও দুর্লভ। তবু বার বার এরকম মানুষ এসেছেন যাঁরা ধর্মের জঞ্জাল বা আবর্জনা সরিয়ে প্রকৃত ধর্ম কি বুঝিয়েছেন ; কিন্তু আবার জঞ্জাল এসে ভরে গেছে। সে জন্যই মাও-সে-তুং-এর ভাষায় কনটিনুয়াস রিভলিউশন দরকার। রাশ আলগা করলে চলবে না, থামলে চলবে না। ধর্মের জঞ্জাল স্তূপ হলে কি হয়? আজকের ভারতবর্ষের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। বাঙলা দেশের মত বেকারের দেশে উৎসাহী যুবকদের সমস্ত অর্থ ঢাকের বাদ্যে শেষ হচ্ছে। বৎসরব্যাপী নানা পূজার খরচায় বড় বড় প্রোজেক্ট তৈরি হতে পারে। তিব্বতে লো-সু-র মত কতটা কার্যকরী হয়েছিল তা বোঝাতে উপরিউক্ত শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বত-ভ্রমণের পরবর্তী একটি ঘটনা উল্লেখ করে আমার হাইডিং ড্রাগন মন্দিরে দাঁড়িয়ে মানসভ্রমণ শেষ করব।

জাপানী শ্রমণ একাই কারাগুচি ১৮৯৭ সালে ভারতের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ চীনার ছদ্মবেশে তিব্বতে প্রবেশ করেন। ইংরেজ আমলে কোনো ভারতীয়ের তিব্বত-প্রবেশ একেবারেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশের চীনারা তিব্বতে যাতায়াত করত। বহু তিব্বতী চীন দেশে বসবাস করত। কিন্তু শ্রমণ একাই কাওয়াগুচির তিব্বতযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে পূর্বোক্ত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত গিয়েছিলেন। তিনিও ছদ্মবেশে যান। এ যুগে তিনিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় যিনি তিব্বতের নিষিদ্ধ এলাকায় গিয়েছেন। পরে রাহুল সংকৃত্যায়ন গিয়েছেন। তিনি তিব্বতে একজন বিদ্বান পুণ্যাত্মা লামার কাছে থাকেন ও পড়াশুনো করেন। এই লামার নাম সেনগেচেন দোরজেচেন (মহাসিংহ হীরাখনি)। ইনি সরল বিশ্বাসে শরৎচন্দ্রকে শিক্ষা দেন। শরৎচন্দ্র তিব্বত থেকে বৌদ্ধধর্ম 'চুরি' করে নিয়ে যেতে এসেছেন, কিংবা তিনি ইংরেজের গুপ্তচর—এসব নিয়ে তিনি চিন্তাও করেননি। তিনি সক্রিয়ভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্রত নিয়েছিলেন। তাই যে-কেউ বিদ্যার্থী হয়ে তাঁর কাছে আসবে তাকে তিনি সাহায্য করবেন—এই ছিল তাঁর ব্রত, তাতে প্রাণ যায় তাও স্বীকার। বিশেষ করে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। একাই কাওয়াগুচি লিখছেন 'ঐ লামার দেশ তিব্বতে এ রকম মানুষ অতি দুর্লভ। তিনি সবরকম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির, জাতিসংস্কারের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি এইরকম মহদাশয় ছিলেন বলেই সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর অনেক শত্রু ছিল। শরৎচন্দ্র বিষয়ক গুজবটি তাদের সহায়ক হল। শরৎচন্দ্রের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন সকলের উপরই অমানুষিক অত্যাচার হল। আর সেনগেচেন দোরজেচেনের মৃত্যুদণ্ড হল। ১৮৮৭ সালের জুন মাসে এই মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা পালন করা হয়। মৃত্যুদণ্ডের পদ্ধতি হচ্ছে—কনবো নদীর জলে চুবিয়ে চুবিয়ে তোলা, যতক্ষণ না প্রাণ বেরোয়। কনবো, মহানদ ব্রহ্মপুত্রের স্থানীয় নাম। সেই মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনা শ্রমণ কাওয়াগুচি তাঁর বন্ধুদের কাছে যেমন শুনেছেন তা লিখেছেন। সেই বর্ণনাটি এখানে উদ্ধৃত করছি তাতে তিব্বতের অবস্থাটা বোঝা যাবে।

'যখন মৃত্যুর সময় এগিয়ে আসছে, মহৎহৃদয় লামা নদীর ধারে একখানি প্রশস্ত প্রস্তরের উপরে বসে এক মনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। তাঁর চার পাশ ঘিরে বহু আর্ত মানুষ রোদন করছেন। তিনি সাদা কাপড় পরে একেবারে শান্ত সমাহিত বসে আছেন। সেই ভাবেই তিনি জহ্লাদদের বললেন, যখন একটু পরেই আমি আমার এই আঙুলটি তিনবার নাড়ব, সেই সঙ্কেত দেখে তোমরা বুঝবে এখন আমাকে নদীতে ডোবাবার সময় হয়েছে। ততক্ষণে চারিদিকের অস্থিরতা বেড়ে উঠেছে, জনতা যেন আর সব ভুলে গেছে। শুধু তাদের নিজেদের ক্রন্দনরব, জহ্লাদের উপস্থিতি, আর মহানদ ব্রহ্মপুত্রের নিষ্ঠুর জলকল্লোল প্রকট হয়ে রয়েছে।...এই যে সাধারণ মানুষের জনতা—এরা জানে, যা ঘটতে যাচ্ছে তা মহাপাপ, তা অন্যায়। কিন্তু তারা জানে না কি করে এর প্রতিকার করা যায়। তাই তাদের সম্বল শুধু চোখের জল।

'...যখন লামা তাঁর হাতটি তুললেন তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে...হাত তোলার অর্থ খুবই স্পষ্ট—তাই দেখে জনতা উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠল। একবার, দুবার, তিনবার সেই মহাপ্রাণ বন্দী আঙুল নাড়লেন। কিন্তু জহ্লাদরা কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করেনি। তাদেরও চোখ জলে ভাসছে। তখন মহালামা বললেন, তোমরা করছ কি, আমায় জলে ডোবাও। ভারাক্রান্ত মনে জল্লাদরা তাঁর কোমরে একটি ভারী পাথর বেঁধে তাঁকে ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোতের মধ্যে নামিয়ে দিল। কিছুক্ষণ বাদে তারা যখন তাঁকে টেনে তুলল, দেখল যে, তখনও দেহে প্রাণ আছে। তাই আবার দ্বিতীয়বার চুবিয়ে দিল। দ্বিতীয়বার তোলার পর দেখা গেল তখনও দেহে প্রাণ রয়েছে। যে বিশাল জনতা দাঁড়িয়েছিল তারা এখন চিৎকার করে দাবি জানাল যে, এবারে এঁকে মুক্তি দিতে হবে। জহ্লাদরাও দিশাহারা হয়ে পড়েছিল... তাদের এই দ্বিধার মুহূর্তে এক মহা-আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সময় বয়ে যাচ্ছিল। সাধু লামা খানিকটা শক্তি পেয়ে বললেন—আমার জন্য শোক ক'রো না। আমার এই অবস্থার যা কর্ম ছিল, শেষ হয়েছে। এখন আমি তৃপ্তির সঙ্গে বিদায় নিচ্ছি।...আমার একটি মাত্রই কামনা আছে—সে হচ্ছে আমার মৃত্যুর পরে তিব্বতে যেন বৌদ্ধধর্মের উত্তরোত্তর প্রসার হয়। বেদনার্ত জহ্লাদরা তাঁর আদেশ পালন করল...তারপর তিব্বতের রীতি অনুযায়ী তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে জলে ফেলে দিল। এইভাবে সেই নিষ্ঠুর বধপর্ব শেষ হল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধ মন্দির থেকে ফিরে সন্ধ্যায় সিজিয়াচুয়াং-এর রেভলিউশনারি কমিটির অর্থাৎ ঐ প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে বিরাট ভোজের আয়োজন হল। সেই ভোজনপর্ব বর্ণনার আমার সাধ্য নেই। এইদিন সুখকর বাক্যের সঙ্গে আমাদের এক-একখানি বস্ত্র উপহার দেওয়া হল। সিজিয়াচুয়াং-এর সুতী কলের তৈরি কি না জানি না, তবে কাপড়টি সুতো ও সিন্থেটিক তন্তুর মিশ্রণ।

সেদিন সৈন্যদের দলবল সব চলে গিয়েছিল। শুধু কো চিন লান আমাদের সঙ্গে পিকিং যাবেন। সৈন্য ছেলেমেয়েরা এমনই ঘরের ছেলেমেয়ের মতন—এত নম্র, সাজসজ্জাবিহীন যে, ওদের সৈন্য বলতে ইচ্ছা হয় না। অর্থাৎ, আমাদের মনে সৈন্য কথাটার সঙ্গে যে ভাব ও ভাবনা জড়িত তার সঙ্গে যেন এদের কোনো মিল নেই। চীনারা অনেক শব্দের অর্থই বদলে দিয়েছে। সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই দেখলাম আর্টিস্ট। সাধারণ সাদা প্যাডের উপর কলম দিয়ে ফস্‌ফস্‌ করে স্কেচ করছে। একজন মঙ্গোল কোর্টনিসের পোর্ট্রেট করে ফেলল দশ-পনের মিনিটের মধ্যে।

১৩ ডিসেম্বর সকালে আমরা পিকিং-এর দিকে রওনা হলাম। ৮ তারিখ রাত্রে পৌঁছেছিলাম। এই চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অনেকে পরিচিত হয়েছে, অনেককে বেশ ভালো লাগছে। কাউকে একটু বেশী ভালো লাগছে, কাউকে কম। কি আশ্চর্য এই মানুষের মন! স্টেশনে পৌঁছে দেখি, এক-একজন এক-এক ঝুড়ি আপেল করে নিয়ে চলেছে। ঝুড়িগুলি হাতলওলা সূক্ষ্ম বাঁশের কাজ করা। ট্রেনে তুলে দিয়ে আমাদের সকলকে এক-এক ঝুড়ি ফল দিলে পথে খাওয়ার জন্য। চল্লিশ-পঞ্চাশটা করে আপেল আমরা কেউই খেতে পারব বলে মনে হল না। তবু তখনই স্থির করে ফেললাম যে, ঝুড়িটা যে করে হোক দেশে নিয়ে যাব।

সিজিয়াচুয়াং-এর কর্মযজ্ঞ শেষ হল। এবার ভ্রমণের পালা।

ট্রেনে যে যার কামরায় গুছিয়ে বসলাম। এই সময়টাকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে হবে। কত প্রশ্ন আছে। সব সময়ে এমন একটা ব্যস্ততা ও দৌড়োদৌড়ির মধ্যে কাটছে যে, আলোচনার মত সময় কই?

করিডর দিয়ে মংকে যেতে দেখে আমি ডাকলাম, 'কমরেড মং, কাম ইন।' 'কাম ইন'-টা না বুঝলেও আমার ইচ্ছাটা বুঝল।

চৌ-কে নিয়ে ঘরে ঢুকে মং বললেন, 'তারপর, তুমি আমাদের "সো-কলড ফ্রেন্ডস্‌"দের বিষয় জানতে চাও?'

আমি মাঝে একবার মংকে বলেছিলাম, 'তোমরা রাশিয়ানদের উপর এত চটা কেন? ওরা তো তোমাদের বন্ধুই।'

সে বলত, 'চটা কেন? বন্ধু? তা বন্ধু বটে—আওয়ার সো-কলড ফ্রেন্ডস্‌। সব একদিন বুঝিয়ে বলব।'

সেদিন মং ভাবল, আমি বুঝি ওদের ঝগড়ার কাহিনীটা শুনতে চাই। সে প্রস্তুত হয়ে বললে, 'তোমাদের জানা ভালো—রাশিয়ানদের চরিত্র কি—আমাদের সো-কলড ফ্রেন্ডস্‌।'

সেদিন আমি বললাম, 'না, আজকে ও প্রসঙ্গ নয়। আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্বন্ধে আরো কিছু শুনতে চাই।'

আমার মনে দুটো প্রশ্ন ছিল। এক ফ্যামিলি প্ল্যানিং গ্রামে পর্যন্ত যেরকম সফল হয়েছে শুনতে পাই, তাতে কতটা জোর প্রয়োগ করতে হয়েছে? দ্বিতীয় হচ্ছে, বিবাহের বয়স যতখানি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ মেয়েদের পঁচিশ, ছেলেদের ত্রিশ—তাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ছে না কেন? বাড়ছে না যে, সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যে ক'টি যুবক-যুবতী দেখেছি তাতে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি। ধীর নম্র স্বভাব—পরিচ্ছন্ন পোশাক—স্ত্রী-পুরুষ সর্বদা একত্র, অথচ আশ্চর্য নির্বিকার। অন্তত এতবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়োরোপ ঘুরে ঘুরে যেসব দৃশ্য দেখেছি তাতে অনেক সময় মনে হয়েছে যে, পাশ্চাত্য জগৎ এক বিষয়ে মানুষ ও সারমেয়র প্রভেদ হারিয়ে ফেলেছে।

আমার এক আত্মীয় লণ্ডনে গিয়ে হাইড পার্কের দৃশ্য দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর সব কিছুই যেমন মানুষের অভ্যাস হয়ে যায় তারও হয়ে গেল। এমন সময় তার ছোট ভাইও লণ্ডনে পৌঁছনোতে সে দিশাহারা হয়ে তার স্ত্রীকে লিখেছিল, এ-দেশে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে রাস্তায় বেরনো যায় না। নিশীথ রাত্রে মানুষের নিভৃততম অভিজ্ঞতা প্রকাশ্য দিবালোকে অপরিচিত কৌতূহলী সহস্রের চোখের সামনে এভাবে উদ্‌ঘাটিত করার মধ্যে যে আদিম অরণ্যবাসী মনের পরিচয় দেয় তা অরণ্যেই শোভা পায়, সভ্য মানুষের লোকালয়ে নয়।

এ বিষয়ে, চীন, জাপান ও ভারতের মনোভাব কতকটা একই। তবে জাপানীরাই বোধ হয় অত্যন্ত এবং স্বাভাবিক সংযমী। কোনো মনোভাবই তারা উগ্রভাবে প্রকাশ করে না। কোনো জাপানী লেখিকার একখানি বই 'ডটার অব এ সামুরাই'তে পড়েছিলাম লেখিকার আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। প্রথম যেদিন সিনেমা কিংবা থিয়েটার দেখতে যান, স্টেজের উপর আলিঙ্গন ও চুম্বনের দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন সামুরাই-কন্যা। তাঁর আমেরিকান বান্ধবীকে শঙ্কিত প্রশ্ন করেছিলেন—'এ কি! এসব কি প্রকাশ্য ভাব?'

আমেরিকান বান্ধবী বলেন, 'তা তোমাদের দেশে যখন প্রণয়ী-যুগল জ্যোৎস্না আলোতে বেড়াতে বেড়াতে প্রেমব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন তারা কি করে, এরকম করে না?'

সামুরাই-কন্যা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বললেন, 'এরকম করবে? তখন তারা আত্মসংযম করবার জন্য পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে বসে।'

চীনে এতটা না হলেও সিনেমায়, ব্যালেতে চলনে-বলনে কোথাও বিন্দুমাত্র যৌন ভঙ্গিমা আমরা দেখিনি। তবে বৎসলা একদিন আমায় বলেছিলেন যে, পিকিং হোটেলে সে এক জোড়া তরুণ-তরুণীর চোখের ইশারা দেখেছে।

যা হোক, আমি মং-কে বললুম, 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং'-এর ব্যাপারটা আমাদের দেশে এমন "জ্বলন্ত" প্রশ্ন যে, তোমরা যে এর সম্পূর্ণ সমাধান করেছ—এ তো আশ্চর্য ব্যাপার! তাই আরো বিস্তারিত জানতে চাই। আমরা তো ভাবছি, জবরদস্তি না করলে কোনো উপায় নেই।'

, মং বললে, 'জবরদস্তির কোনো প্রয়োজন থাকে না—যদি মানুষকে ঠিকমত বোঝানো যায় এবং সাহায্য করা যায়। আমরা অন্য সমস্ত পন্থার থেকে ঔষধকেই শ্রেয় মনে করি। এই ঔষধ মেয়েদের হাতে হাতে পৌঁছে যায় গ্রামের অভ্যন্তরে এবং ঔষধের চাহিদা উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'রুই আলি আমাকে বলেছেন যে, তিনি একটি "অ্যাবরশন"-এর কেস দেখেছেন—পনের মিনিটের জন্য চেয়ারে বসে মেয়েটি উঠে হেঁটে চলে গেল। এটা কি করে হয়?'

উত্তরে জানলাম আকুপাংচার অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অত্যন্ত অনায়াসে ঐ ব্যাপারটি একটি বিশেষ চৈনিক রীতিতে সম্পন্ন হয়। একেবারে রক্তমোক্ষণ হয় না; একটুও কষ্ট হয় না। রোগিণী ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে পুরোদমে কাজ করতে পারেন। সেই রীতির বিশেষত্ব কি, তাও আমি শুনেছিলাম। কিন্তু ডাক্তার নই বলে সবটা ঠিকমত বোঝাতে পারব না। তবে আশা করছি, শীঘ্রই এসব বিদ্যার আদান-প্রদান হয়ে এক দেশের মানুষের আবিষ্কৃত বিদ্যা সমস্ত মানুষের কাজে লাগবে। আকুপাংচার অ্যানেসথেসিয়ার জন্যই গ্রামের অভ্যন্তরে প্রায় বিনা খরচায় এসব কাজ নিষ্পন্ন হতে পারবে। তবে এখনও চীনের কৃষকরা মেয়ের চেয়ে ছেলে হলেই সুখী হয় এবং মেয়ে হলে একটি ছেলে প্রার্থনা করে।

আমি মংকে যত প্রশ্ন করি সে যথাসাধ্য উত্তর দেয়। তবে সব উত্তর যথাযথ হয় কি না বুঝতে পারি না। এতক্ষণে ট্রেনের ছোট্ট কামরাটি চৌ সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরিয়ে ফেলেছে। মং ও লি একেবারে সিগারেট খায় না। যাক, ঐ ধোঁয়ার জন্যই এখন প্রশ্নোত্তরের ইতি করব ভাবছি এমন সময় আর একটা কথা মনে পড়ল। আমাকে একজন পাদ্রী বলেছিলেন, চীনেরা জবরদস্তি করে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের স্ত্রী-সংসর্গ করতে দেয় না। তাই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা সত্য কিনা। মং বললে, 'তা কখনো হয়? কালচারাল রেভলিউশনের সময় একসঙ্গে লং মার্চ করবার সময় কত অসঙ্গত মিলন হয়েছে। তবে জানো, খুব কাজের দিকে মন থাকলে এসব দিকে মন কম যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রাচুর্য ও বিলাসের মধ্যে আর কিছু করবার না থাকার দরুন এবং উচ্চ আদর্শ সামনে না থাকার জন্য অল্প বয়সীরা সহজে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।' আমার মনে হল, কথাটা ঠিকই। আমাদের দেশেও অগ্নিযুগের ছেলেরা ব্রহ্মচর্যের দিকে জোর দিত। বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যরা কামিনী না হলেও কাম ত্যাগের কথা বারবার বলেছেন।

মং চলে যাবার পর বৎসলা ও আমি বসে এ বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। আমেরিকা-ফেরত বৎসলা বললেন, 'লী-কে যদি নিয়ে ম্যানহাটানের কোনো নাইট ক্লাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে কিরকম হয়?'

আমি বললুম, 'আর ফলি বর্জারে?' আমি মনে মনে ভাবছি, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মত অবস্থা হয় হয়তো—

"কোন দেব আজি আনিলে দিবা,
তোমার পরশ অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা!"

আমি বললুম, 'বৎসলা, ও হয়তো তখন মাও-সে-তুং-এর পাঠ স্মরণ করে। রোজ রাত্রে যে পড়া মুখস্থ করে—কোনো কষ্টকেই ভয় করো না, বিপদ এলে ঘাবড়ে যেও না, দণ্ড বা মৃত্যু যাই আসুক ভয় ত্যাগ কর।'

বৎসলা বললেন, 'তাই আর না! মুখে যাই বলুক, এই শতাব্দীরই ছেলে—তা ভুলো না—যথেষ্ট "চালু" আছে।'

যাবার আগে মং উঠে দাঁড়ালেন। দরজাটা ঠেলে দিতেই ঘরের ধোঁয়া বেরিয়ে গেল। 'আর কোনো প্রশ্ন আছে?'

'আপাতত নয়।'

মং বললেন, 'যদি উপযুক্ত আদর্শ সামনে থাকে, যদি যথেষ্ট কাজ থাকে, কাজে লিপ্সা থাকে, তবে কোনো বিভ্রান্তি আসে না।'

মং চলে গেলে আমি ভাবতে লাগলুম। নানা দেশের নানা কথা মনে পড়ছিল। বিশেষ করে ববের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। হঠাৎ নয় ঠিক, আমি ওর কথা প্রায়ই ভাবি। আমাদের শহরের পথে চলতে চলতে অবিন্যস্ত বেশবাস, নোংরা মলিন বেশ শ্বেতবর্ণ যুবক-যুবতী দেখলেই ওর কথা মনে পড়ে। এমনকি, পরিচ্ছন্ন বেশবাস নরদের নিমাইয়ের সজ্জায় সজ্জিত উজ্জ্বলকান্তি যুবকদের দেখলেও তার কথা মনে পড়ে। ববের মা বলেছিলেন, ববের কোনো মোটিভেশন নেই। কিন্তু অতি সম্পন্ন গৃহে পরম আদরে মানুষ হয়েও ওর কেন মোটিভেশন নেই সেটা ভাববার কথা।

আমাদের দেশেও রাস্তার মোড়ে মোড়ে, রোয়াকে, এখানে-সেখানে অল্প বয়সী ছেলেদের জটলা দেখা যায়। দিনের কর্মব্যস্ততার সময় তাদের এই আলস্যজড়িত আড্ডার ভাব দেখলে কোনো বিদেশীর মনে হতে পারে, এদের মোটিভেশন নেই। কিন্তু তা তো নয়! এদের মোটিভেশন আছে—যা নেই তা কাজ, আর অন্ন। পেটে ক্ষুধা নিয়ে এরা দ্বারে দ্বারে চাকরির সন্ধানে ঘুরছে। এদের কর্মস্পৃহা যথেষ্ট আছে বলেই তথাকথিত নেতারা তাঁদের নিজেদের সুযোগ ও সুবিধামত ব্যবহার করে নিচ্ছেন। ইলেকশনের সময় ভূতের মত খাটছে, চাঁদা তুলছে, স্লোগান দিচ্ছে, দেওয়ালে লিখছে, এবং কিছুদিন বাদেই দেখতে পাচ্ছে—যাদের জন্য এত পরিশ্রম করল, পরিবর্তে অন্য জিনিস দূরে থাক, তারা ভালোবাসাও দিল না। আমাদের এই সর্বরকমে লাঞ্ছিত ছেলেদের দুঃখের ইতিহাস লিখতে গেলে আর এক মহাভারত হয়ে যাবে। তবু তারা শ্রদ্ধা হারায়নি, এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাসও হারায়নি। ঔৎসুক্য, উৎসাহ ও কৌতূহল—এই সব জীবনকে বিস্তৃত ও পূর্ণ করবার প্রাথমিক গুণগুলি এখনও এদের নষ্ট হয়ে যায় নি।

কিন্তু কর্মময় বৈজ্ঞানিক জগতে নব নব আবিষ্কার-কর্মে সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যশালী দেশের ছেলেদের দেখে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। কিসের দুঃখে এরা এরকম ছন্নছাড়া হয়ে দেশ-বিদেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরে বেড়াচ্ছে, জঘন্য বেশভূষায়, জঘন্য পোশাকে নির্গ্রন্থের মত। কিংবা ভারতের পরিত্যক্ত কতগুলি পুরানো অভ্যাস তুলে নিয়ে হরিসংকীর্তন করে দু হাত তুলে নেচে স্বর্গ লাভ করছে? সারা জগতের উপর পাশ্চাত্য জগতের যুবসমাজের এই উদ্‌ভ্রান্ততার কি প্রভাব পড়বে, কে জানে।

আমেরিকায় একটি পরিবারে পাঁচ-ছয় দিন ছিলাম অতিথি হিসাবে। বেশ সমৃদ্ধ পরিবার। কর্তা ও গৃহিণী দু'জনেই উপার্জন করেন। বিকেলে রোজ একটি পাচিকা এসে রান্না করে যায়—এতটাই সম্পন্ন তাঁরা। ভদ্রমহিলা খুব সরল। কথায় কথায় বললেন, তাঁর অত্যন্ত ভারতবর্ষ দেখবার ইচ্ছা। কলকাতা বা দিল্লীর রাজপথে হাতি চড়ে কেউ যায় কি না তাও জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু দুঃখ করে বললেন, তাঁর কখনো ভারতে আসা হবে না। তাঁর স্বামী বলেন, ভারত বড় দরিদ্র, তিনি দারিদ্র্যকে ঘৃণা করেন। এঁদের দুটি ছেলে। একটি প্যাট্রিক—বয়স আঠার; একটি বব—বয়স কুড়ি। প্রথম দিন বব এসে খাবার টেবিলে বসল সকলের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে। অবিন্যস্ত লম্বা চুল ও দাড়ি। বেশ নোংরা জামা। বললে, 'ক্ষিদে পেয়েছে।' মা তাড়াতাড়ি খাবার গরম করে দিলেন। কাঁটায় গেঁথে একটু মুখে তুলে মুখভঙ্গী করে বললে, 'ক্ষিধে নেই।' মা খোশামোদ করতে লাগলেন, 'কি খাবি বাবা? দুটো ডিম দিয়ে রুটি ভেজে দিই?' 'দাও।' রুটি ভাজল মা। এক টুকরো খেয়ে প্লেট সরিয়ে উঠে গেল—'আই অ্যাম নট হাংগ্রি।' বিমর্ষ মুখে মা খাবারগুলি ফেললেন, বাসন ধুলেন, চোখে জল আসতে লাগল। বললেন, 'কোনো বিষয়ে ওর কোনো মোটিভেশন নেই। কলেজে পাঠাই—যেতে হয় যায়। এখন তিন মাস ছুটি। কিছু একটা করবে বলে বিশ্বাস নেই।' ছেলে ততক্ষণে একটা শার্ট চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। মধ্যরাত্রে ফিরবে। ছেলেমেয়ে কোথায় যাচ্ছে, সেটা জিজ্ঞাসা করার সাহস কোনো বাবা-মার নেই। কখন ফিরবে, তাও না। সেদিন বব রাত বারটা নাগাদ ফিরল। ফিরে অনেকক্ষণ টেলিভিশন দেখল। রাত দুটো অবধি গ্রামোফোন বাজাল ও পরের দিন বেলা একটা অবধি ঘুমোল। ওর মাকে বললাম, 'ছেলেকে জাগিয়ে দাও না এত বেলা অবধি ঘুমোচ্ছে!' ওর মা তো আতঙ্কিত—'না, না! তুমি তোমার ছেলেকে জাগাও?'

'আমার ছেলেকে সাড়ে ছ'টা না বাজতে ঘুম থেকে ঠেঙিয়ে তোলাই তো আমার অভ্যাস। যতদিন বেঁচে আছি করব।'

'তাতে কিছু হবে না?'

'কখনো-সখনো খানিকটা গজগজ করতে পারে, আর হবে কি?' যে ক'দিন ছিলাম, দেখলাম এই ছেলেদের নিয়ে ওর মা এমিলির চিন্তার অন্ত নেই। দুটিই সমান। তবে বব বেশী উৎপাতকারী। কোনো দিন সময় মত ফিরবে না, ঠিকমত খাবে না। তদুপরি গার্লফ্রেন্ড কলহান্তরিতা হয়েছে প্রায় তিন মাস, এখনও আর একটা জোটেনি। এটাও ওর মাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। 'মেয়েটা খুব ভালো ছিল, আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। কি যে হল।'

'কি হল ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর না!'

'জিজ্ঞাসা তো করি। ও বলে, "মেয়েটা খুব হার্টলেস।" পারহেপস্ সি ডিড নট ওয়ান্ট টু স্লীপ উইথ হিম।'

এই ববকে নিয়ে আমি একটা পুরো দিন ভয়ঙ্করী নিউইয়র্ক নগরীতে ভ্রমণে বেরুবো ঠিক করলাম। 'বব, আমি একলা ম্যানহাটানে যেতে পারি না, পথ হারিয়ে ফেলব। তুমি আমার সঙ্গে চল।" বহু কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে রওনা হলাম। রিভারসাইড রোড থেকে ম্যানহাটান বাসে বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। সুন্দর বাস, ভিড় নেই, তবু নেমেই বলে, "মৈত্রেয়ী, আমি ক্লান্ত—আ অ্যাম টায়ারড, আর য়্যু টায়ারড?" আমি তো অবাক! "এই তো বেরুলাম বব, ক্লান্ত হব কেন?" কোনো মতে তাকে নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো গেল। নিউইয়র্ক টাইমস-এর অফিসে কোনো একজন সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে বব বলে, সে ভিতরে যাবে না, বাইরে বসে ক্রসওয়ার্ড করবে। কারণ সে ক্লান্ত, অতিশয় ক্লান্ত। আমাদের দেশে একটি কুড়ি বছরের কলেজে পড়া ছেলে আনন্দবাজার পত্রিকার একজন সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গেলে খুশীই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত ; হয়তো পকেট থেকে দু'-একটা কবিতাও বের করে ফেলত। কিন্তু বব ক্লান্ত। জোর করে তাকে নিয়ে ঢুকলাম। সম্পাদক মশাই তো একজন লম্বা-চুল বিদ্রোহী বালক দেখে মহাসমাদর শুরু করলেন। দেখলাম যৌবনের খুব দাপট! সবাই সন্ত্রস্ত। পিতামাতা থেকে শুরু করে সম্পাদক পর্যন্ত। বেরিয়ে এসে বব বলছে, "তোমরা এত কথা বল কি করে? তোমরা তো খুব ভাবতে পার। ভারি ইনটারেস্টিং।"

সেদিন তিনটি জায়গায় দেখা করবার ছিল। প্রত্যেকবারই প্রবেশের মুহূর্তে বব ক্লান্ত ও অনিচ্ছুক হয়ে পড়ল। শেষবারে আর ঢোকানোই গেল না। দরজার বাইরে মাটিতে বসে ক্রমাগত ক্রসওয়ার্ড করতে লাগল। বাড়ি ফিরে অবশ্য ছেঁড়া শার্টের উপর আর একটা শার্ট ঝুলিয়ে (ছেঁড়া শার্ট অর্থের অভাবে নয়, হয়তো বা ভালো শার্টই ছিঁড়ে নিয়েছে) বেরিয়ে গেল। রাত একটায় ফিরবে হয়তো।

ওর মা সারা দিনের বৃত্তান্ত শুনে বলতে লাগলেন, এতই যদি ক্লান্ত তবে বেরুল কেন? অথচ ভদ্রমহিলা বা তাঁর স্বামী কারুর সাহস নেই ছেলেকে কিছু বলবার। এমিলি বলতে লাগলেন, "বব কিন্তু আগে এরকম ছিল না। বছর দুই থেকে একেবারে গোল্লায় গেছে। এরমকটা ঘটল প্যাট্রিসকে ববের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ফলে। ওদের দুই ভাইতে খুব ভাব ছিল। প্যাট্রিসের তো দাদা-অন্ত প্রাণ। দাদা যা বলবে তাই চমৎকার! দাদা ওর আদর্শ, দাদা ওর দেবতা, দাদার বন্ধুবান্ধবই ওর বন্ধুবান্ধব। আমরা ভাবলাম, প্যাট্রিস তো বড় হচ্ছে—এভবে ববের ছায়ায় থাকলে তো ওর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে না। তখন ডাক্তারের কাছে....."

আমি চমকে উঠেছি—'সাইকিয়াট্রিস্ট নাকি!'

"হ্যাঁ, খুব ভালো ডাক্তার। তিনি পরামর্শ দিলেন সামনের ছুটিতে ববকে কোনো দূর দেশে পাঠিয়ে দিতে এবং সেই সময় প্যাট্রিসকে ওর ঘর থেকে সরিয়ে দিতে এবং যাতে ওর নিজের বন্ধুবান্ধব হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। ফল খুব ভালো হয়েছে। ওর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে, নতুন বন্ধুবান্ধব হয়েছে। এখন আর দাদাকে পরোয়াই করে না। এদিকে বব টেকসাস থেকে ফিরে আগুন। সে গজরাতে লাগল 'কেন আমার ভাইকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছ? আমরা দুজনে বন্ধু ছিলাম, তোমাদের কি ক্ষতি হয়েছিল?' সেই যে আমাদের ওপর বিগড়াল মৈত্রেয়ী, আর ওকে ঠিকই করতে পারলুম না।" আমি তো স্তম্ভিত! সেই সাইকিয়াট্রিস্ট! 'খাল কেটে কুমির আনা' কথাটার ইংরাজী মনে পড়ল না। নইলে বলতুম, তুমিই তো খাল কেটে সাইকিয়াট্রিস্ট এনেছ।

আমি ওকে লক্ষ্মণ ও ভরতের গল্প বললাম। রামায়ণ শুনিয়ে পুণ্য করলাম। আমাদের দেশে প্রেম ও ভক্তির আদর্শটা বলবার চেষ্টা করলাম। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদি সব সম্পর্কের মধ্যে একটা চূড়ান্ত ভালোবাসার আদর্শ আছে যার জন্য সমস্ত ত্যাগ করে মানুষ। তাতে তার ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব—কিছুই নষ্ট হয় না। ভরতের কি ব্যক্তিত্ব ছিল না? সে যদি মায়ের পরামর্শমত এই সুযোগে রামকে সরিয়ে রাজ্য অধিকার করত তা হলেই কি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ বেশি হত? বলতে পার—এসব পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টান্তও আছে। যেমন, ভ্যান গগ ও তার ছোট ভাই। প্যাট্রিস যদি তার নিজের চেয়ে দাদাকে একটু বেশী ভালোবাসত তা হলে তার কোনই ক্ষতি হত না। বরং তাতে তার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির বিকাশ হত, তার চরিত্র সুন্দরতর হত।

ভদ্রমহিলা আমার কথা শুনে অথই জলে পড়লেন—'আমি তো খুব ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছিলাম!'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর কি কখনো মনে হয়েছে যে, তাঁদের জীবনে কোনো আদর্শ নেই বলেই এ প্রজন্মের ছেলেরা এমন উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা হয়ে পড়েছে? এই মন্তব্যে এমিলি আরো অবাক—'কি আদর্শ নেই?'

'তুমিই আমাকে বলেছ—তোমরা আগের বাড়ি থেকে ছেড়ে এসেছ, কারণ কাছেই একজন নিগ্রো পরিবার বাড়ি কিনেছে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তো তাদের কিছু বলিনি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা ঠিকই। কিন্তু এও ঠিক, কোনো পাড়ায় নিগ্রো পরিবার এলে তোমরা একে একে চলে যেতে শুরু কর ; আর তারাও একে একে এসে জমা হয়। নয় কি? কেন, ওরা কি মানুষ নয়?'

'কিন্তু এর সঙ্গে ববের এরকম গোঁয়ার্তুমির কি যোগ আছে?'

'আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু যোগ আছে। এ-দেশটাকে যাঁরা আদর্শ মানুষের দেশ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা তোমাদের এরকম কাজ করতে বারণ করেছিলেন!'

'কারা?'

'একজনের নাম বলি। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের নাম শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই, বাঃ! তিনি আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন! তাঁর সময় সিভিল ওয়ার হল!'...

১৩ই ডিসেম্বর বেলা ১টা নাগাত পিকিং পৌঁছানো গেল।

সিঙ্গিয়াচুয়াং-এ ডাঃ বসু আমায় বলেছিলেন, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডে পিকিং আসছেন। আমি খুব আশ্চর্য হলাম। ইনি ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র এবং একজন নমিনেটেড এম-পি। আমাদের রওনা হবার কয়েক দিন আগে ইনি এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং বলেছিলেন যে, বিজয়বাবু তাঁকে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন ; তা সত্ত্বেও তিনি যাচ্ছেন না এবং জানতে চাইলেন, আমি যাচ্ছি কি না। আমি বললুম, "অনাদর নিমন্ত্রণ পেলেও আমি যাব। বিনা নিমন্ত্রণেও যেতে রাজী আছি। সুযোগ পেলে চীন যাব না?"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "এখন প্রচণ্ড শীত। আমি আবার বুড়ো হয়েছি।"

আমি বললাম, "আমার অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু শীতের ভয়ে আমি চীনে যাব না —তা হয় না।"

তখন শ্রীযুত পাণ্ডে বললেন, "তা ছাড়া ইন্দিরা গান্ধী আমাকে বলেছেন, অত ব্যস্ততা কি—ধীরে ধীরে এগোনো ভালো।"

আমি বললুম, "আমার মতে, বন্ধুত্বের পদক্ষেপ দ্রুত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

বিশ্বম্ভরবাবু একমত হলেন না। বিশেষত 'কর্ত্রী'পক্ষের অমত সম্ভাবনায় তিনি চিন্তিত ছিলেন। এখন হঠাৎ উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, অর্থাৎ নিমন্ত্রণের আসল কারণ শেষ হবার পরে, ইনি কেন এসেছেন তা বুঝলাম না।

বিজয়বাবু বললেন, "আমিও বুঝিনি। তবে সম্ভবত কর্ত্রী এখন অনুমতি দিয়েছেন।"

চীনেরা কিন্তু খুব খুশী। তারা বিজয়বাবুকে বলেছে, যেই আসুক, যখনই আসুক, যার লোকই হোক—আমরা আনন্দিত। আমরা ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই।

হোটেলে ফিরে আসার পর সেদিনের একমাত্র চমকপ্রদ ঘটনা বিশ্বম্ভর পাণ্ডের সাথে সাক্ষাৎকার। নিরামিষাশী শ্রীযুক্ত পাণ্ডে খাওয়া-দাওয়া সেরে উপরে উঠছেন, করিডরে দেখা হল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কি, ঠাণ্ডা কমল?" তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

সেদিন রাতে শ্রীনারায়ণন্ আমাদের ব্যাঙ্কোয়েট দিলেন। আমাদের আশা ছিল—তিনি ভারতীয় এম্ব্যাসীর মধ্যে নিমন্ত্রণ করবেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় সেই পিকিং হোটেলেই খাবার ব্যবস্থা হল। রান্নাও চীনা। তা হলে আর অ্যাম্বাসাডারের নিমন্ত্রণে লাভ কি হল! যতই 'পিকিং ডাক' খাই, বা রসাল হ্যাম খাই, কিংবা রঙীন সী-ফুড দেখি (ওটা খাই না), বা মাণ্ডেরিন মাছ প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকে—ডাল-চচ্চড়ির জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। ইন্দিরা বাসুর ও দীনেশের যেমনই হোক একটু সবজি হলেই চলে। বস্তুত, বাঁধাকপি বা বাঁশের কোড় দেখলে আমরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ি!

ব্যাঙ্কোয়েটে কয়েকটি অল্পবয়সী ভারতীয় বধূর সঙ্গে আলাপ হল। এরা ভারত-চীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৈত্রীর সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে, অর্থাৎ রীতিমত অমিত্রতার মধ্যে, এখানে বাস করেছে।

১৩ তারিখ শেষ হল। ১৪ই সকালে আমরা চীনের দেওয়াল, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি, দেখতে যাব। চীনেরা বরাবরই দেখাচ্ছি আশ্চর্য কাণ্ড করে।

চীনের দেওয়ালের কথা শুনলেই আমার পার্ল বাকের গল্প মনে পড়ে। তাঁর লেখার ভিতর দিয়েই আমরা চীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছি! তাঁর লেখাতেই পড়েছি, চীনের দেওয়ালের পাশে প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় শত শত লোক এসে আশ্রয় নিত। ছেলেমেয়ে ফেলে রেখে যেত। তাদের সংখ্যা শত, না সহস্র—ঠিক মনে পড়ছে না। তাতে কিছু এসে যায় না। বুভুক্ষার ভয়াবহতার ছবি আমাদের মনে স্থায়ী হয়েছে তাঁর লেখার দৌলতে। আমরা জানি, প্রতি বৎসর মারী ও বন্যা প্রভৃতির সাহায্যে জনসংখ্যা লঘু করে রাখার কাজ প্রকৃতিই করত।

কিন্তু এখানে পার্ল বাকের নাম করার সাধ্য নেই। এরা খুব রেগে যাবে। সেদিন লেখিকা হান সুয়ানকে বলেছিলাম, "আপনার পার্ল বাকের লেখা কেমন লাগে?" তিনি বললেন, "ডিসগাস্টিং"। আমি জানি, চীনাদের ভালো লাগে না। কারণ, তিনি পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা ও পুরানো জগতের সেইসব মানুষদের কথা কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে লিখেছেন, যারা এদের শাস্ত্রে শোষক বলে অভিহিত। কিন্তু একথা মানতেই হয়, একজন লেখক পাপিষ্ঠকেও এমনভাবে উপস্থাপিত করতে পারে, যা মানুষের সাহিত্যরসবোধের উদ্রেক করে। সেই পাপিষ্ঠ যে আদর্শচরিত্র নয়, সেজন্য সাহিত্যরসাস্বাদে কোনো ক্ষতি হয় না। আমি হান সুয়ানকে বলেছিলাম, "কিন্তু তখন তো তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখের কথা অনেক লিখেছেন। রেভোলিউশন তো হচ্ছিল না, কি করে লিখবেন?" হান সুয়ান অসহিষ্ণু মাথা নাড়লেন, "হচ্ছিল। সেটাই তো কথা। যারা বিদ্রোহ করছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের কথা তিনি লিখলেন না।" আমি ভাবলুম তাঁকে বলি, একজন লেখকের নিশ্চয় স্বাধীনতা আছে তিনি কাদের কথা লিখবেন সেটা স্থির করবার। হয়তো তিনি সেই মূক ও সহিষ্ণু জনতাকেই চিনতেন বেশী। কিন্তু তার উপর তো সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ভর করে না। কিন্তু বলিনি।

পরে আমাকে এ-দেশে একটি বাঙালী যুবক এর সুন্দর উত্তর দিয়েছে। সে বলেছে, পার্ল বাকের উপন্যাসের মেজাজ অনেকটা 'গন উইথ দ্য উইন্ড'-এর মত। ঐ বই সুপাঠ্য সুসাহিত্য, সকলেরই পড়তে ভালো লাগবে—কিন্তু ওর বক্তব্য কি? ওর বক্তব্য—দাসরা খুব সুখে ছিল, প্রভুদের সঙ্গে তাদের সৌহার্দ্য ছিল, তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতাও ছিল। সেই তুলো-ক্ষেতের মালিকদের সজ্জিত সুন্দর জীবনের প্রতি একটা নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয় ঐ বই। সেটা কি স্বাস্থ্যকর? যারা সেই পুরানো এবং অপমানজনক জগৎকে বহু কষ্টে নূতন জগতে পরিবর্তিত করেছে তাদের কি সেটা ভালো লাগবে? আঙ্কেল টম'স্ কেবিন পড়লেও লোকে অভিভূত হয়। গন উইথ দ্য উইন্ড পড়লেও হয়। সাহিত্য হয়েছে দুটোই—কিন্তু মানবজীবন ও জগতের উপর দুটো বইয়ের বক্তব্যের প্রভাব হবে অনেক পৃথক।

যা হোক, গ্রেট ওয়াল দেখতে গেলাম আমরা সকালের ভোজনপর্ব সেরেই। ডাঃ বসু ও ইন্দিরা বসু গেলেন না; অনেকবার দেখেছেন তাঁরা। পিকিং-এর দেওয়াল পার হয়ে বেশ খানিকটা যেতে হয়। পিকিং-এর সিটি ওয়াল খুব উঁচু। মাঝে মাঝে সিংদরজা। সুন্দর পৌরাণিক স্থাপত্য। পিকিং বোধ হয় ন' শ' বছরের পুরানো শহর। পার্বত্য পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা দেওয়ালের দরজায় পৌঁছলাম। যতক্ষণ গাড়িতে থাকি, আরামে চলি। কিন্তু দর্শনীয় বস্তুর কাছাকাছি এলেই ছুটোছুটি-হাঁটাহাঁটির ভাবনায় বিব্রত হই। যা হোক, গাড়ি থেকে নেমেই, যে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য লেখা আছে তা পড়া গেল। পড়েই ভুলে গিয়েছি। ইতিহাসের সে পাঠ সর্বত্র পাওয়া যাবে বলে মন দিইনি। আমি বললাম, "আমি বসি নিচে। তোমরা দেখে এস।"

মং বললে, "তাই কখনো হয়! নিকজন দেওয়ালে চড়ে ছবি তুলল, আর তুমি উঠবে না! তা হলে তোমায় ঘাড়ে করে তোলা হবে।" অতএব ভীত মনে খানিকটা ওঠা গেল। দেওয়াল ক্রমে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। হু-হু করে কনকনে বাতাস মাথায় জড়ানো শাল ভেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুয়ে ছুঁচের মত ফুটছে। বাতাসের ঠেলায় এগুতে কষ্ট হচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম না, এত শ্রম করে দেওয়াল বাইবার দরকার কি। এবার আমারও মনে হল, অত বাহাদুরিতে কাজ নেই। আমি বললুম, "কমরেড মং, নিকসনের সঙ্গে আমার এতটুকু মিল নেই। শুধু এই দেওয়াল চড়ার কম্পিটিশন করিয়ে কি হবে! আমি এই দাঁড়ালুম, তোমরা যাও।" একটা কোল দেখে ঠেস দিয়ে আরাম করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একজন সাহস করে দুর্বলতা প্রকাশ করায় বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডেও সাহস পেলেন। তিনিও বললেন, "আর কাজ কি গিয়ে।" আমরা দুজন দাঁড়িয়ে বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলাম। অন্যরা এগিয়ে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে বৎসলা ও জ্ঞানসিং সবার আগে ; তারাচাঁদ গুপ্ত, মহাকবি ও দীনেশ পাণ্ডে তারপরে।

কি জানি ওরা কতক্ষণে ফিরবে বিক্ষ মনে তাই ভাবছি, হঠাৎ বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "আপনার উপন্যাস তো একাডেমি এওয়ার্ড পেয়েছে।"

"এ্যাঁ" আমার শাল জড়ানো কানের ভিতর দিয়ে কথাটা ঢুকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করল। "কেন, আপনি জানেন না?" "আমি কি করে জানব? ঠিক আমার বই তো? কি নাম বলুন তো?" ভদ্রলোক জেরায় পড়ে শুদ্ধ সংস্কৃতে সম্পূর্ণ শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন—তারপর বললেন, "এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? কেউ না কেউ তো পুরস্কার পাবেই।" "তাই বলে আমি?" মনে মনে ভাবছি রামানন্দবাবু চলে যাবার পর বাংলা দেশের পত্র পত্রিকা আমাকে লেখক বলে গ্রাহ্য করে নি। আমি যে লিখতে পারি এ স্বীকৃতি কোনো দিন পাইনি। পত্রিকা অফিসে কত লেখা গুম খুন হয়েছে। অবশেষে কিছু কিছু লিটল জার্নালের পাতায় আশ্রয় নিয়ে ঝরা পাতার মত উড়ে গেছে—কত কিছু লেখবার ছিল লেখা হল না। আজ তবে বৈতরণীর দরজায় পৌঁছে এ স্বীকৃতি কেন? হর্ষর চেয়ে বিষাদই আমার মনকে আচ্ছন্ন করল—সাইবেরিয়ার হিমস্পর্শ উত্তাল বাতাসও সে বিষাদের মেঘ উড়িয়ে দিতে পারল না।

বাতাস থাকলেও সেদিন রোদ উঠেছিল। বেশ দূর থেকে একদল সাহেব আসছে। ইংরেজ, না আমেরিকান—বুঝলাম না। এরা টুরিস্ট। লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত আমাদের দিকে এগিয়ে এল। "হ্যাল্লো!"

"হাই!"

"আমেরিকা থেকে আসছ?"

'না, ক্যানাডা। আর তোমরা?' 'আন্দাজ কর।' 'আন্দাজ তো করেছি, বলতে ভরসা পাচ্ছি না।' 'বলে ফেল'। 'ইণ্ডিয়া!' তারপর হাসতে হাসতে 'আশ্চর্য দৃশ্য, চীনের গ্রেট ওয়ালের উপরে দুজন ভারতীয়র সঙ্গে দেখা। এ দৃশ্য অমর করে রাখতে হবে' বলে ওদের চীনা গাইডকে আমাদের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলতে লাগল। বললে, 'চীনা একজন থাকা চাই। নইলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই ভাববে, দিল্লীর লাল কেল্লায় ছবি তুলেছি।'

ইতিমধ্যে তারাচাঁদ গুপ্ত, মহাকবি ও দীনেশ—সব ফিরে এল। বৎসলা ও জ্ঞান সিং-এর বীরত্ব অসীম। তারা আরো দূরে গেছে। সমস্তটা পথ চড়াই।

ক্যানেডিয়ানরা আমাদের কতগুলি ছোট ছোট এনামেল-করা লাল ব্রোচ এঁটে দিল। তারপর বলল, 'ব্যাপার কি, তোমাদের ভাব হচ্ছে?' আমরা বললুম, 'হচ্ছে কি, হয়ে গেছে! ভাবছ কি?' মনে মনে ভাবছি কোল্ডলটা বেশ জগৎব্যাপী রাষ্ট্র হয়েছে তো! দেখি ওরা মাও-সে-তুং-এর ব্যাজ লাগিয়েছে। আমি বললাম, 'তোমাদেরও তো বেশ ভাব হয়েছে দেখছি!' হো-হো করে হেসে সব চেয়ে দীর্ঘকায় ক্যানেডিয়ানটি বলল, 'হয়েছে বইকি! আমি তো ওদের বলছি কমনওয়েলথে যোগ দিতে।' এই বলে সাদরে করমর্দন করে হাসতে হাসতে লম্বা লম্বা পা ফেলে ওরা চলে গেল। এইজন্য আমেরিকানদের আমার ভালো লাগে। ওরা দিলখোলা, সোজাসুজি, একটু সরল আমুদে, আর খুব তাড়াতাড়ি ভাব জমাতে পারে। আমরা এশীয়রা অমন খোলাখুলি দরাজ নয়। আর চীনেরা তো খুবই 'সোফেস্টিকেটেড!' চাষী-মজুরদের সঙ্গে মেশামেশি করলে কি হবে, এ আর একরকমের সোফেস্টিকেশন! এগ্রিকালচার-হর্টিকালচারের সঙ্গে মিশে গেছে বুদ্ধির কালচার, ব্যবহারের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালচার! বড় বেশী সভ্য এরা।

১৪ই ডিসেম্বর পিকিং-এ আমাদের খালি স্থাপত্যদর্শনের দিন। গ্রেট ওয়াল থেকে যাওয়া হল 'মিঙ্গ টুম্ব' দেখতে। মিঙ্গ রাজবংশের কোনো রাজা-রানীর কবর। বড় বড় কতগুলি ঢিবির মত ছিল—ঠিক মহেঞ্জোদারোর মত। সেগুলি খুঁড়ে এই কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

মিঙ্গ টুম্বে পৌঁছে আমরা প্রথম লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। এক-একটা বড় বড় বাক্সে করে প্রত্যেকের জন্য খাদ্য এনেছে। ডিম এরা যখন খায় তিনটে করে। খাবার যা পেয়েছিলাম তার অর্ধেকও খাওয়া গেল না। তারপর কবর দেখতে গেলাম। হিন্দুরা যে মানুষ মরলে পুড়িয়ে ফেলে, সে মন্দ নয়—এত কবর দেখতে হয় না। নইলে পৃথিবীর যে জায়গায়ই যাই, কবর দেখে দেখে হয়রান।

মিঙ্গ টুম্বে ঢুকবার পথে দু দিকে সারি সারি পাহারা। হাতি, উট, সিংহ প্রভৃতির বিরাট বিরাট পাথরের মূর্তি। বলতে ভুলে গেছি, চীনে অনেক ক'টি কুঁজওলা উট দেখেছি—হাতি দেখিনি। উটে-টানা কাঠের গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে লোকজন যাতায়াত করে।

যা হোক, বেসব হাতি-উট মিঙ্গ টুম্বে দ্বারীর মত দাঁড়িয়ে আছে তাদের পার হয়ে আমরা একটা চত্বরে পৌঁছলাম। প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে মিউজিয়ামে সেই রাজাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র মুদ্রা সাজানো আছে ও বিবরণ লেখা আছে—যেমন সর্বত্র থাকে। তবে সবচেয়ে যা মজা লাগল তা হচ্ছে—দেওয়াল জুড়ে কাঁচের কেসে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের মত পুতুলের ছবির দৃশ্য। একটা কাহিনী সাজানো আছে। কাহিনীটা হলো: কিরকম নিষ্ঠুরভাবে জমিদারের গোমস্তারা ছেলে, বুড়ো—সব বেঁধে মারছে খাজনা আদায়ের জন্য; আর জমিদার দূরে গদিয়ান হয়ে আছেন। গ্রামের দৃশ্য রিলিফে চিত্রিত—মানুষগুলি জীবন্ত, সেই নুয়ে ও গোঁফ ঝোলানো চীনে। ওসাজ আর একজনেরও দেখা যায় না। শেষ দৃশ্য—প্রজাদের বিদ্রোহ। তারাও লাঠি নিয়ে অত্যাচারী গোমস্তাদের মারতে উদ্যত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ ছবির এখানে তাৎপর্য কি?' তারা বললে, যখন এই কবর তৈরী হয় তখন দেশের অবস্থা এইরকম ছিল। সাধারণ মানুষ এমনি অত্যাচারিত ছিল। সমস্ত সামাজিক পরিবেশটা বুঝতে সুবিধা হয়।

এর পর আমরা কবরের দিকে অগ্রসর হলাম। খানিকটা যেতেই দেখি, সেই ক্যানেডিয়ানের দল এগিয়ে আসছে। এখানে বলে রাখি, চীনের দরজা এখন খোলা। টুরিস্ট আসছে, সেমিনার, কনফারেন্স চলছে। হোটেল পিকিং-এই নানা দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। জাপানী অনেক দেখলাম—দলনেত্রী একটি খুব বেঁটে মহিলা। আমি লী-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, 'এত যে জাপানীদের দেখছি—তোমরা তো কথায় কথায় জাপানীদের আক্রমণের কথা, চীনের উপর তাদের হামলা নৃশংসতা সব বল—ওরা তাতে কিছু মনে করে না?' লী বললে, 'ওদের বলার সময় আমরা সব সময় বলি যে, জাপানের মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। এর জন্য দায়ী তাদের তখনকার সরকার। এবং সত্যই সাধারণ মানুষ কখনো যুদ্ধ চায় না।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'জাপানী কবি নগুচীর নাম শুনেছ? তিনি তো শুধু একজন সাধারণ মানুষ নন, মস্ত কবি। তাঁকেও যথেষ্ট যুদ্ধবাজ মনে হয়েছিল আমাদের।' যা হোক, এটা ওদের শিক্ষার অন্তর্গত যে, দেশের মানুষ ও তার সরকারকে পৃথক করে দেখবে। অর্থাৎ সেই অমোঘ সত্যতে সন্দেহ করবে না, যা আমাদের কবি বলে গেছেন—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' জাপানীরাও নিশ্চয়ই হিরোসিমার নৃশংস কীর্তির জন্য সমগ্র আমেরিকার মানুষকে ঘৃণা করে না। এরকম চলতে থাকলে তো এ জগৎ ঈর্ষাবিদ্বেষের বিষবাষ্পে দগ্ধ হয়ে যেত। আমি বললাম, 'লী, তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। আমার প্রশ্নটাই ভুল ছিল।'

মিঙ্গ টুম্বে খানিকটা উঠে গিয়ে একটি গেট। মোগল স্থাপত্যেও গেট আছে। আমাদেরও গোপুরম্ আছে, এদেরও তেমনি আছে। অথচ এই গেটগুলো তো সত্যি আটকাবার জন্য নয়—শোভার জন্য! স্থাপত্যের আকাশপাতাল পার্থক্য থাকলেও পরিকল্পনার কতগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐক্য নানা বিষয়ে সর্বত্র লক্ষ করেছি। গেটের সামনে দিয়ে রাস্তা নেমে গেছে নিচের দিকে—ভূগর্ভে। দুপাশের দেওয়াল দেখে বোঝা গেল কতটা খুঁড়তে হয়েছে। বিশ ত্রিশ ফুট তো হবেই! তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামা—একেবারে পাঁচতলা গভীর তো নিশ্চয়। সিঁড়ি দেখে প্রাণ উড়ে গেছে আমার। মং বলছে, 'কি ভাবছ, নামতে তো হবেই!' 'নামব তো, উঠব কি করে?' 'সে দেখা যাবে।' 'দেখো, আমায় আবার রাজা-রানীর সাহচর্যে রেখে যেয়ো না।'

নেমে একটা প্রশস্ত গলি দিয়ে সেই উচ্চমঞ্চের সামনে পৌঁছনো গেল যেখানে দুখানি পাথরের বাক্স। ঐ বাক্সে বন্দী দুটি শব আছে। একদিন যারা দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করত তাদের কঙ্কালও ওর মধ্যে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আছে। ওরা যখনই যেখানে কোনো আশ্চর্য বস্তু দেখায়, বারবার বলে, এ-সমস্ত এ-দেশের মেহনতী মানুষের কাজ। তাদের শ্রমের উপর নির্ভর করে মুষ্টিমেয় লোকের এত সুখ এত ঐশ্বর্য। দেশের এই সম্পদ, এই সৌন্দর্য সৃষ্টি—সবই সেই অগণিত মানুষের দান, যাদের নাম লেখা নেই। "ইতিহাস যাহাদের ভোলে অনায়াসে, সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।"

পাশে একটা বিরাট ঘরে এয়ারপোর্টে মাল রাখবার যেমন লম্বা টেবিল থাকে তেমনি খাঁজ-কাটা পাথরের বিরাট লম্বা টেবিল সুড়ঙ্গ পর্যন্ত টানা। ওরা বলল, 'ঐটা শবের বাক্স আনার গোপন পথ। প্রকাশ্য পথে আনতে গেলে অত্যাচারিত প্রজারা তা নষ্ট করে প্রতিশোধ নিত।' এ কথা অবশ্য অনুমান, না সত্য—বলতে পারব না। যখনই কোনো রিসার্চ হয় বা ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ঘাটন হয়, দেখি সেই যুগের ভাব দিয়ে তাকে রঞ্জিত করা হয়, বা ব্যক্তিবিশেষের চশমা দিয়ে দেখা যায়। ঐজন্য এসব রিসার্চ সম্বন্ধে আমি বড় সন্দিহান।

শবাধার দুটি দেখা হয়ে গেলে আমরা একে একে রওনা হলাম। ওখানে অনেক ট্যুরিস্ট ছিল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠাবার জন্য 'সিডান চেয়ার' লাগবে কি না মং জিজ্ঞাসা করছিলেন: 'রাজা-রানীর কফিনের সংস্পর্শে এসে যদি তোমার সিডান চেয়ারে চড়বার শখ হয়ে থাকে!' মনে মনে বলছি, তা হলেই হয়েছে! চিয়াং চিং নাকি সিডান চেয়ারে চড়ত। তা মাও-সে-তুং-এর পত্নী নিজেও বিখ্যাত ফিল্ম অ্যাকট্রেস—একটু সিডান চেয়ারে চড়লাই বা! কিন্তু সেজন্য এরা তার খুব নিন্দা করে। এরা বেশ নিন্দা করতে পারে। অনেকটা আমাদের মত। চিয়াং চিং নাকি সিডান চেয়ারে চেপে সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে যেতেন, তারপর সেখানে স্নান করতেন। দুধারে অনেকটা বড় বৃত্ত করে সৈন্যরা পাহারা দিত, যাতে হাঙর না আসে।

যাক, সিঁড়ি আরোহণপর্ব সিডান চেয়ার ছাড়াই সম্পন্ন হল। মং, লী, চাও দু দিক থেকে ঠেলে তুলল। আমার বৎসলাকে হিংসা হত। ও কি অবলীলায় চড়াই-উৎড়াই করতে পারে!

উপরে উঠে গেটের কাছে অপেক্ষা করছি—সামনে দূরে বিস্তৃত জলাশয় দেখা গেল। শুনলাম এই 'কাউন্টি'তে জলের বড় অভাব ছিল। তাই স্বাধীনতার পরে (তারিখটা মনে আসছে না) সবাই মিলে ঐ জলাশয় খনন করেছে। দলে দলে রেড গার্ডস, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ছেলেমেয়ে—সবাই কাজে লেগেছে। চৌ এন লাই নিজে মাটি খুঁড়ছেন। বোধ হয় মাও-সে-তুংও কয়েক কোদাল তুলে থাকবেন। চারিদিক পতাকায় সুশোভিত, গানে স্লোগানে ঝঙ্কৃত। জলাশয় খোঁড়া একটা বিরক্তিকর ঘর্মাক্ত পরিশ্রম মাত্র নয়, সে ছিল একটা উৎসব। উৎসবে যেমন আমরা সবাই মিলে খাটি, তখন পরিশ্রম আর পরিশ্রম মনে হয় না, এ ত তেমনি। তবে অধিকাংশ উৎসবের আনন্দ আমাদের পরদিন উৎ-সৃষ্টে পরিণত হয়—

'যে ললিত সুখে হৃদয় অধীর
মনে হল তাহা গত যামিনীর
স্খলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর মালিকা'—

এ কিন্তু সেরকম উৎসব নয়। এ হচ্ছে সকলে মিলে শ্রম করে আনন্দ করা, আনন্দ করে শ্রম করা ও সে আনন্দধারা ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত করে দেওয়া।

কবর দেখার পরিশ্রম আমার জলাশয় খোঁড়ার বর্ণনা শুনে মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। আমি এ-দেশের দূরদর্শী, কুশলী ও কবি নেতাকে মনে মনে নমস্কার জানালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিং্গ টম্ব থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে দুটি মুখে গুঁজে বিছানার দিকে ছোটবার ইচ্ছা। বৎসলা আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কি অনেক রাত জেগে লিখবে?' বৎসলা বেশ ভালো সঙ্গী। অনেক রাত অবধি আলো জেলে লিখলে কিছু বলে না। কিন্তু সেদিন আমার লেখার কিছু নেই—আমি চিন্তিত। কেবল ভাবছি—সেই যে মহিলা লেখিকা সি পিন্ সিন্, যিনি চীনা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কি না। আমি বহুবার অনুরোধ জানিয়েছি—আজ পর্যন্ত কিছু শুনিনি। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া আমার বড় দরকার। তাঁর সঙ্গে কথা বললে আমি হয়তো বুঝতে পারব এখানে রবীন্দ্রনাথ কতখানি বিস্মৃত ও কেন?

পাশ্চাত্ত্য দেশে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি বিস্মৃত। তার কারণ আছে। রুশ দেশে রবীন্দ্রনাথ উজ্জীবিত—তারও কারণ আছে। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় দেশগুলি রুশ দেশের নূতন ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ শুধু নয়, আক্রোশে ফুঁসছে। রাশিয়া তার কমিউনিজম নিয়ে রসাতলে গেলেই সুখী হয়। নিন্দাবাণী ও ধিক্কারে যখন পৃথিবী মুখরিত তখন বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ প্রায় সত্তর বছর বয়সে দুর্বল শরীরে দারুণ শীতের মধ্যে সে দেশের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ও সেখানে গেলেন। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, সে সময়ে আমার পিতা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও রুশ দেশে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সরকারী কাজ করতেন ; বহু চেষ্টা করেও সরকারী অনুমোদন পেলেন না। যা হোক, ইয়োরোপের বন্ধুবান্ধব সকলেই রবীন্দ্রনাথকে দু হাত তুলে বারণ করেছিল। তার মধ্যে এনড্রুজও ছিলেন।

কবি লিখতেন, রোমাঁ রোলাঁ স্ত্রীর প্রভাবে পড়ে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। কথাটা ঠাট্টা করে বলা, না সত্য—তা আমি জানি না। আমার তো বিশ্বাস হয় না। কারণ, যিনি রামকৃষ্ণ-ভক্ত তিনি কি করে কমিউনিস্ট হবেন? এসব প্রশ্ন কবিকে জিজ্ঞাসা করার মত বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। কিন্তু সেই রোমাঁ রোলাঁও যতদূর জানি রাশিয়া যাননি। তিনি ভারতকে ভালোবাসতেন কিন্তু তবু ভারতে আসেননি গরমের ভয়ে।

শারীরিক কষ্টকে সাধারণত লোকে ভয় করে। আমি তো খুবই করি। না হলে ১৯৭৪ সালে রুমানিয়া থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিমন্ত্রণ ছেড়ে দিতুম না। বড় ভুল করেছি। ডিসেম্বর মাস—রুমানিয়াই বরফে ঢাকা। তখন মস্কো যেতে ভরসা পেলুম না। যে সময়ে নেপোলিয়ান পর্যন্ত পিঠটান দিয়েছে সেখানে আমার এত স্পর্ধা কি করে হবে। কিন্তু পিকিংও তো এখন ঐরকমই। নেপোলিয়ান এখানে আসেনি—তাই তার দুর্দশা আমায় ভয় দেখায়নি। কিন্তু এসে দেখছি সওয়া যায়। মনে জোর করলে, ইচ্ছে থাকলে সবরকম ভীতিপ্রদ ঘটনারই সম্মুখীন হওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই শারীরিক কষ্টকে গ্রাহ্য করতেন না। এর যে কত দিকে কত পরীক্ষা দিয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তখন ওদের দুর্দশার দিন, খাওয়া-পরা-থাকা সবই মোটা রকমের। আমায় অনেকে ভয় দেখাল—খাওয়ার ব্যবস্থা খুব খারাপ, ঠান্ডা নিবারণের ব্যবস্থা নেই ইত্যাদি—যেন আমি সুখে থাকবার জন্য ওদের দেখতে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি ওরা যে আশ্চর্য কাণ্ডটা করছে তাই দেখতে।—রবীন্দ্রনাথ চেহারায় 'মহারাজের' মত, রাজবৎ উন্নত তাঁর ধরন, কিন্তু তিনি খুব সহজ সরল জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, এ-কথা অনেকেই বিশ্বাস করে না। যাক। রাশিয়া থেকে তিনি "রাশিয়ার চিঠি"তে সে দেশ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ ও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছেন তার মধ্যে এমন গভীর সত্য নিহিত যে, বার বার "রেজিম বদল" হলেও সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁর আসন অটুট তো আছেই, ক্রমে গৌরবান্বিত হয়েছে।

এক সময়ে এই সসাগরা পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের নগণ্যতম গ্রামেও তাঁর নাম জানা ছিল। আজ যে যাই বলুক তা নয়। এমন কি, আমেরিকার বেশ শিক্ষিত অর্থাৎ কলেজের প্রফেসাররাও দেখেছি তাঁর নাম শোনেনি। অবশ্য তারা সাহিত্যের লোক নয়। চীনেও রবীন্দ্রনাথের নাম এমনি প্রচার হয়েছিল যে রামনাথ বিশ্বাস যখন ১৯৩১ সালে সাইকেলে চীন পর্যটন করেন তখন গ্রামের মধ্যেও তিনি "গ্যান্ডি" আর "তাগুরে" নাম শুনেছেন। মনোজ বসুও তাঁর বইতে চীনাদের রবীন্দ্রপ্রীতির কথা লিখেছেন। ১৯৬১ সালেও রবীন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতবার্ষিকী উৎসব হয়েছে। তবে এখন কেন কেউ তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছে না? আমাদের দলে কেউ সাহিত্যিক নেই এবং অন্য কারু এ বিষয়ে উৎসাহ নেই—কিন্তু আমার তো আছে। সেটা প্রাধান্য পাচ্ছে না। যাই হোক, আমি কমরেড মং-কে বলে রেখেছি আমার পিকিং-এর নিচে পিকিং দেখার জন্য তত ব্যস্ততা নেই, যত ব্যস্ততা শ্রীমতী সি পিন্ সিন্-কে দেখার।

শেষ পর্যন্ত আমার আশঙ্কাই সত্য হল। তাঁর সঙ্গে দেখার ব্যবস্থা হল না। কারণ, তিনি খুব অসুস্থ। আমার কমরেড মং বললেন, 'আমরা খবর পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু বৃদ্ধা প্রবল ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছেন, একশ চার জ্বর উঠছে। এখন তো দেখা হতে পারে না।' আমার মনটা কতটা খারাপ হয়েছিল তা কেউ জানল না। কো চিন লান তখন আমার ঘরে বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'এই লেখিকার লেখা আমরা অল্প বয়সে খুব পড়তাম। বড় চমৎকার লেখেন ইনি। কিন্তু আজকাল তো আর এ'র লেখা চোখে পড়ে না!' আমি বুঝলাম, এ-দেশেও সেই একই রোগ আছে—পুরানো লেখকরা পুরানো হলেই আর কদর নেই।

কো চিন লান কতটা রসবেত্তা তা জানি না। আমার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে মতে মিলল না। পিকিং-এ পৌঁছে ডাক্তার জর্জ হাতেম আমাকে তাঁর লেখা একটি ছোট-গল্পের সংকলন দিলেন। আমাকে শুধু নয়, সকলকেই। কো চিন লান-কে অবশ্য দেননি। তিনি তো ও-দেশেরই কন্যা। জর্জ হাতেম তো এ লেখা পড়বে না, সেই ভরসায় লিখছি—গল্পগুলো বড় প্রচারধর্মী এবং সাহিত্য রসে দীন। জর্জ হাতেম খুব বড় ডাক্তার। এডগার স্নো তাঁর কথা অনেক লিখেছেন। তিনি উপদংশ রোগ একটা মহাদেশ থেকে নির্মূল করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর গল্প আমাদের ভালো লাগবে—এ তো বলা যায় না। আমাদের বলছি, কারণ, বংশীধারীরও সেই মত। কিন্তু তাঁর বউঠান আমাদের ঘরে এসেই গল্পের বইটি নিয়ে বসতেন। তিনি ইংরেজী জানেন মোটামুটি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ গল্প তাঁর ভালো লাগছে? তিনি বললেন, 'খুবই। তোমার?' আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা ছোটবেলায় যে-সব গল্প পড়তে তার সঙ্গে এর মিল আছে? সেগুলো ভালো, না এগুলো?' তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'মিল থাকবে কি করে? জীবনেরই তো মিল নেই। তখন দুষ্ট জমিদাররা গরীব লোকদের কষ্ট দিত। তখন কি এরকম বীর তৈরী হত? ফসল ফলাবার জন্য এত স্বার্থত্যাগ কেউ করত? সবাই তো স্বার্থের ধান্দায় ঘুরছে। এখানে যা লেখা হয়েছে এরকম ঘটনা ঘটে। আমি তো জানি, তাই আমার ভালো লাগে।' কো চিন লান-এর কথাগুলো আমি হুবহু বলতে পারলাম কি না জানি না, তবে মোটামুটি এই রকমই তিনি বলেছিলেন।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমার ঘুম এল না। কি গুণে সাহিত্য সাহিত্য হয়? মৌমাছি যে মিষ্টদ্রব্য ফুল থেকে শুষে আনে তা তো মধু নয়; তার নিজের রসের রসায়নে মধু তৈরী হয়। জীবনের অভিজ্ঞতাকে অনুভূতির কোন্ সোহাগার গলিয়ে মিলে তা কাব্যে দ্যুতি বিকীর্ণ করে, কে আমায় বলে দেবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সি পিন্ সীন্-এর সঙ্গে দেখা না হওয়ার হতাশাটা আমি তার পরদিন মন থেকে দূর করে দিলাম। যা দেখতে এসেছি তাই দেখে নিই। আমাদের কবি আমাদের চোখে যে দৃষ্টি দিয়েছেন তাই দিয়ে চোখে যা পড়ে, হাতের কাছে যা আছে তাই ভালো করে দেখে নেব।

শহরের একটা জনাকীর্ণ স্থানে আমরা গেলাম। এখানটা বাজার—যাকে বলা হয় 'শপিং সেন্টার'। সাইকেলের ভিড়ে গাড়ি চলা দায়। জায়গাটার নাম 'তাসি লান'। ১৯৬৯ সালে এখানে এই 'এয়ার রেইড শেলটার' তৈরি হয়। অ্যাটম বোমার আক্রমণ থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার এই একটি সর্বাত্মক চেষ্টা। এইখানে সবই দোকান। সর্বসমেত এক হাজার আট শ' কর্মচারী কাজ করে। তারাই এই সুড়ঙ্গনগর খুঁড়েছে। এই জনাকীর্ণ রাস্তায় তারা অবসর-সময়ে এই খননকার্য করেছে। অর্থাৎ, 'স্পেয়ার টাইম'এ করেছে, 'ওভারটাইম'এ নয়। প্রত্যেক দিন 'তা সি লান' পথ দিয়ে আশী হাজার লোক হাঁটে। যে-কোনো সময়ে চলাচল বন্ধ করে লোক গণনা করলে আট হাজার লোকের ভিড় পাওয়া যাবে।

গাড়ি থামলে আমরা একটা কাটা কাপড়ের দোকানের মধ্যে ঢুকলাম। প্রচুর লোক কাপড় কিনছে। আমি ভাবলুম এখানে কেনাকাটা হবে। দূরে আমার নাতির উপযুক্ত একটা জামা দেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছি, কমরেড মং আমার কনুইয়ের কাছটা ধরে আমার গতিপথ বদলে দিলেন। আমি তখনও ঠিক হৃদ ঠাহর করতে পারিনি ব্যাপারটা কি হবে। ঘরের এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম আমরা। ভিড় খানিকটা জায়গা থেকে সরে গেল আর সোঁ করে একটা শব্দ হয়ে খানিকটা দেয়ালও সরে গেল। আসলে সেটা নিম্নমুখ লোহার কপাট। সিঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। সেই ভূতলগামী দীর্ঘ সোপানশ্রেণী দেখে আমার 'আত্মারাম' ত্রাহি ত্রাহি করে উঠল। অতগুলি নেমে আবার উঠতে হবে! তা ছাড়া মৃত্যুর পরে ছাড়া মাটির নীচে ঢোকবার পরিকল্পনা ইতিপূর্বে তো ছিল না।

যাই হোক, সবাই মিলে নামতে লাগলাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সরু লম্বা গলি সোজা চলেছে। তার থেকে ছোট ছোট গলি দু পাশে চলে গেছে। প্রথমেই বায়ু পরিষ্কার করার যন্ত্র বসানো আছে। সেখানে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা কাজ করছিল। উপরে অ্যাটম বোমা ফাটলে বায়ু দূষিত হয়ে যাবে ; সেই দূষিত বায়ু শোধিত হয়ে এখানে ঢুকবে। ঐ যন্ত্রের মাধ্যমে শোধন করা হবে। কি করে শোধন হয় তাও ওরা বলেছিল। কিন্তু সেসব ভালো করে বুঝিনি, তাই বোঝাতেও পারব না। জল শোধন করার ব্যবস্থাও আছে। পরিচ্ছন্ন জল পাইপে করে বিভিন্ন দিকে চলে যাবে।

গলির পর গলি আমরা পার হচ্ছিই ; দু পাশে ছোট ছোট খালি ঘর। ওগুলো দোকান হবে। প্রয়োজন হলে উপরের দোকানগুলো নিচে নেমে আসবে। গলিগুলো দেখে আমার ভেনিসের কথা মনে হচ্ছিল। ভেনিসেও এরকম সরু সরু গলি। কোন্ পথে কোথায় গিয়ে উঠব তা বোঝা যায় না। তবে দু পাশে জলের ছলছল শব্দ মনকে খুশী করে রাখে। এখানে মন খুশী হচ্ছে না। অ্যাটম বোমার কালো মেঘ আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে প্রসন্নতা।

অনেক গলি ঘুরে আমরা একটা বড় হল-ঘরে ঢুকলাম। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য টেবিলে চা ইত্যাদি সাজানো ছিল। সেটা হবে রেস্তোরাঁ, যখন শহরের দোকানগুলি নিচে নেমে আসবে। আমরা বসবার পর ওখানকার কর্তৃপক্ষ আমাদের যথারীতি এই সুড়ঙ্গনগর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করবার জন্য বক্তৃতা দিলেন: মাও-সে-তুং আমাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। স্বয়ম্ভর হতে বলেছিলেন। অন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অভিভাবকত্ব আকাঙ্ক্ষা করতে বারণ করেছিলেন (ডু নট সীক হেজিমনি) এবং সর্বত্র সুড়ঙ্গ খুঁড়তে বলেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ও উপদেশ শুনে এই 'তা সি-লান' এলাকার দোকান-কর্মচারীবৃন্দ উপরস্থ এলাকার নিচে এই গুহায়িত এলাকাটি তৈরি করেছে। অর্থাৎ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খনন করেছে। এবং বাতাস পরিষ্কারক, বিদ্যুৎ উৎপাদক, অ্যাটম বোমা প্রতিষেধক ব্যবস্থা করেছে। এই স্থানটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। প্রত্যেক দোকানের নিচে ঢুকবার ব্যবস্থা আছে এবং নিম্নস্থ যে দোকানে ঢুকবে তার থেকে বেরুবার দরজা আছে। কাজেই, পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে দশ হাজার লোক ঝুপ করে মাটির নিচে নেমে আসতে পারবে। এইখানেই তিন হাজার মিটার লম্বা সুড়ঙ্গ আছে। এই সুড়ঙ্গের সঙ্গে বাসগৃহগুলিরও সংযোগ আছে। এই রকম প্রত্যেক এলাকায়, অর্থাৎ হাসপাতালের নিচে হাসপাতাল, স্কুলের নিচে স্কুল আছে। বসতি এলাকার নিচে বসতি এলাকা। ইনডাস্ট্রিয়াল এলাকার নিচে ইনডাস্ট্রিয়াল এলাকা। পরস্পরের যোগাযোগ তো আছেই, আবার পিকিং-এর নিচ থেকে গ্রামে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ, প্রথমে শহরটি নিচে নামবে, তারপর লোকজন গ্রামে চলে যাবে। সৈন্যরা এখান থেকে যুদ্ধ চালাবে। প্রত্যেক বড় শহরেই এরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বললেন, 'আমরা ভূগর্ভে নব্বই মিটার নিচে নেমেছি।' আমার ভারি আশ্চর্য লাগল—এখানে কুয়ো হয়ে গেল না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম, খোঁড়বার সময় জল বেরোয়নি, কারণ এই এলাকায় জল বহু নিচে। জলের পাম্প বসানো হয়েছে। জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কিভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে নিচে নামতে হবে। তারা তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাটির নিচে নেমে পড়বে। কোনো কোনো জায়গায় গাড়ি চালিয়ে ঢোকার ব্যবস্থাও আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ভূমিকম্পে এখানে কোনো ক্ষতি হয়নি। এই বিরাট কর্মযজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমদানের দ্বারা। সমস্ত ব্যাপারটা মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। মূল্য পেল কি না সেটা বড় কথা নয়; কারণ, টাকার মূল্য ছাড়া বড় মূল্য আছে—সেই অমূল্য ধনের দিকে যদি মানুষের মন যায় তবে মানুষ অবশ্যই ত্যাগ করতে পারে। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ তা করেছে। কিন্তু এত শ্রম? এত শ্রম, এত কর্মশক্তি আসে কোথা থেকে? ১৯৬৯ সালে কাজ আরম্ভ হয়। এই কয়েক বছরের মধ্যে এত বড় ব্যাপার হল কি করে? আর আমাদের পাতালরেলের সূচনা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও শম্বুকগতিতে এগুচ্ছে কেন? এসব কথা মনে আসে—অনেকে বিমুখ হন নিজের দেশের সমালোচনায়। কিন্তু কোনো কিছু বুঝতে গেলে উপমা ছাড়া বোঝার পথ নেই। সাত-আট বছরে একটা শহরের নিচে শহর গড়াটা কি ব্যাপার তা হৃদয়ঙ্গম করার একমাত্র উপায়—অন্যরা কিভাবে কাজ হচ্ছে তা লক্ষ করা। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করে এত দ্রুত এই অসাধ্যসাধন হল?' তারা বললে, জনগণের কর্মশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করায় তারা স্বেচ্ছায় তাদের দুই কর্মঠ হাতে এই কর্মোদ্যোগ সফল করেছে। তারা মাও-সে-তুং-এর বাণী শুনেছে—'গ্র্যাম্প রিভলিউশন, প্রমোট প্রোডাকশান, প্রিপেয়ার এগ্যেনস্ট দ্য ওয়ার।'

আমি আর বৎসলা চোখাচোখি করলাম। ক্রমাগত এই কথা শুনছি। মনে হচ্ছে যেন মন্ত্র পাঠ হচ্ছে। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছি, তা তো 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'র মত চাকা ঘোরানো মন্ত্র নয়। তা যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অসাধ্যসাধন মন্ত্র। আবার আমার মনে হল আমাদের দেখবার চোখ আর বোঝবার মনকে এখানে নূতন অর্থে সক্রিয় করতে হবে। আমি কি শুনে এসেছিলাম, কি দেখলাম। আমি শুনেছিলাম চীনারা কিছুটির ছবি তুলতে দেয় না। কিন্তু সর্বত্র ছবি তোলা হচ্ছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে না; কারণ, মাও-সে-তুং-এর মতে মানুষ তো কেবল খায় না, সে দেয়ও। সে শুধু কনসিউমার নয়, সে প্রডিউসার। যতই খাক, সে আরো উৎপন্ন করবে। কিন্তু কার্যকালে যখন দেখা গেল এ মত বদলাতে হবে তখন বদলেছে। ম্যান্ডারিনভাষীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে চলেছে। কোনো মতই চিরস্থায়ী হয় না। বিশেষ করে চীনে। সে যেন একটা গতির মধ্যে রয়েছে—চরৈবেতি চরৈবেতি। সে ক্রমাগত নানা পরিবর্তনের মধ্যে এগিয়ে চলেছে। আর অবাক হয়ে ভাবছি—তাদের গুপ্ত বাসস্থানও তো আমাদের দেখিয়ে দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা এই জায়গাটা আমাদের দেখালে কেন?' ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন. 'তাতে কিছু ক্ষতি নেই। তোমরা তো বন্ধু। তবে সবাইকে আমরা দেখাই না।' নানারকম চিন্তা মনে ভিড় করে আসছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত বড় একটা কাণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা করেছ বোমার হাত থেকে রক্ষা পেতে—কে তোমাদের উপর বোমা ফেলবে?' উত্তরে জানলাম দুটি সুপার পাওয়ার—রাশিয়া ও আমেরিকা সম্বন্ধে ওদের আশংকা। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আমেরিকা অবশ্য হিরোসিমায় বোমা ফেলে জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে—কিন্তু রাশিয়া? তোমরা মনে কর যে, রাশিয়াও এ কাজ করতে পারে?'

'কেন পারে না? তা হলে এত মিসাইল বানাচ্ছে কেন?'

১৫ ডিসেম্বরটা পিকিং-এ আমাদের নানা দ্রষ্টব্য দেখা হল। সুড়ঙ্গনগরের পর আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস দেখলাম। ১৯৬০ সালে ঐ কটেজ ইনডাস্ট্রির সংস্থাটি খোলা হয়েছে—তের শত কর্মী কাজ করছে। চীনের বিচিত্র শিল্পদ্রব্য এখানে তৈরী হচ্ছে। তেরশ' কর্মীর মধ্যে সাতশ'ই স্ত্রীলোক। জেড পাথরের নানারকম কাজ, মূর্তি, গহনা, ইত্যাদি চীনের বিখ্যাত শিল্প। এরা হাতের কাজের সঙ্গে যন্ত্রের যোগ করেছে। সূক্ষ্ম খোদাই হাতে হচ্ছে। বড় বড় পাথরগুলি যন্ত্রে মাপসই করে কেটে যন্ত্রেই পালিশ হচ্ছে। ছোট ছোট যন্ত্র নিয়ে এক-একজন বসে গেছে। যন্ত্রগুলো ইলেকট্রিকে চলছে, তবে বড় কিছু নয়। হ্যান্ডিক্রাফ্‌টের সঙ্গে সঙ্গত। 'ক্লয়সন' বলে এক রকম কাজ দেখলাম। তামার পাত্রের উপর সোনার তার দিয়ে কাজ। এ ছাড়া চীনের পুরানো পদ্ধতিতে আঁকা ছবি, মিনার কাজ, লাক্ষার কাজ। প্রত্যেকটি শিল্পদ্রব্য চেয়ে দেখবার মত। প্রত্যেক ঘরে ত্রিশ-চল্লিশজন মানুষ মন দিয়ে কাজ করছে। সূক্ষ্ম তুলি বোলাচ্ছে, কিংবা ঘষা-মাজা করছে। এতগুলো অদৃষ্টপূর্ব বেশ-পরিহিত লোক ঢুকে ঘোরাঘুরি করছে, অথচ কেউ কাজ থেকে চোখ তুলছে না। এই একাগ্র কর্ম আরো অনেক জায়গায় দেখেছি। আমাদের একটি হাতির দাঁতের 'রেলওয়ের' খোদাই দেখাল। বিরাট জিনিস। ওটি তৈরি করতে পাঁচ হাজার দিন লেগেছে। অর্থাৎ একটি লোক পাঁচ হাজার দিনে ওটি করবে। এই জিনিসটি ইউনাইটেড নেশনসকে উপহার দেওয়া হয়েছে। এখানে তার নকলটি আছে। এরাও সেই মন্ত্র বললে—চেয়ারম্যান মাও-এর নির্দেশঃ পুরাতন নূতনের সেবা করুক, শত পুষ্প বিকশিত হোক। সেই অনুসারে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে আমরা কুড়ি দিন আগেই আমাদের বৎসরের নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেছি। প্রতি বছর এখানে ছয় মিলিয়ন ডলার দামের দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং এর বেশির ভাগই ইয়োরোপ-আমেরিকায় বিক্রি হয়। এই সমস্ত শিল্পদ্রব্য বিক্রি করে অনেক টাকা রোজগার করে চীন। জিনিসগুলি সবই পুরাতন শিল্পের অনুকরণ বা নবীকরণ। আশ্চর্য সুন্দর। চোখ ফেরানো যায় না। একটা সোনার রিলিফে ছবি দেখলাম—একটি চাষাকে জমিদারের কর্মচারী সাজা দিচ্ছে! আমি বললাম, 'কমরেড মং এ কি ব্যাপার! জমিদারের কর্মচারী না-হয় সোনার তৈরী, কিন্তু চাষাও সোনার, তার চাবুকও সোনার—এ কিরকম হল? বিষয়বস্তুর সঙ্গে তো মানানসই হচ্ছে না!' মং হাসতে হাসতে যা বললে সাদা বাংলায় তা হচ্ছে—'বাদ দাও, আর্টের খাতিরে অমন কত কি হচ্ছে!' আমি বললুম, 'তোমাদের কথা শুনে সারা পৃথিবী জুড়ে যদি ডিকটেটরশিপ অফ দি প্রলিতেরিয়েৎ হয়ে যেত, তোমরা এসব বস্তু বিক্রি করতে কোথায়? কিনত কে? ভাগ্যিস ক্যাপিটালিস্টরা আছে, তাই তো এই শিল্প এখনও তৈরী হচ্ছে!'

১৫ তারিখ সকালে এই দুটি দ্রষ্টব্য স্থান থেকে কোনো মতে লাঞ্চ সেরে আমরা সামার প্যালেস্ দেখতে গেলাম। সেদিনই রাত্রে খুব সম্মানের নিমন্ত্রণ আছে। শুনেছি চীনের কর্তৃত্বে যিনি দুই নম্বর, ইয়ে সিয়েন ইং, তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। আমাদের যেতে হবে 'গ্রেট হল অফ দি পিপল'-এ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এরই মধ্যে সামার প্যালেস দেখে আসতে হবে। এরকম হু হু করে ছুটে কিছু দেখায় আমি আনন্দ পাই না। তবু সেই বিশ্ববিশ্রুত সামার প্যালেস একটু বুড়ী ছুঁয়ে আসতে হবে। হলও তাই। অত বড় প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখা সহজ কথা নয়। মনেও থাকে না। বর্ণনা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত শুধু বিশেষ কতগুলি বিচিত্র ঝাউ গাছ দেখেছিলাম। তারা এত পুরানো যে, মনে হয় সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাজ্ঞীর ভ্রমণপথের উপর এরা ছায়া ফেলে থাকবে। এই প্রাসাদ বারবার লুট হয়েছে। এর বহুসম্পদ, শিল্পদ্রব্য, অতুলনীয় রত্নসম্ভার বিদেশীরা চুরি করে নিয়ে গেছে। প্রাসাদ সংলগ্ন পাহাড়ের উপর বুদ্ধমন্দির আছে। অত উঁচুতে উঠতে কেউই সাহস করল না। তবু দীর্ঘ লম্বা লাক্কার কাজে সজ্জিত বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা আশ্চর্য ছবিতে ঢাকা পথ চলেছে। তার দু পাশের কৃত্রিম জলাশয় এখন বরফ হয়ে রয়েছে। আমাদের দলের সকলেই ক্ষিপ্রগতি। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন। আমি ছবি দেখবার চেষ্টায় আরো পিছিয়ে পড়ছি। লী আমার কাছে এল—'মিসেস দেবী, তুমি আস্তে আস্তে চল—আমি তোমার সঙ্গে আছি।' আমি ওর হাতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছবি দেখতে দেখতে এগুতে লাগলাম। কি আশ্চর্য সুন্দর এদের পুরাতন চিত্রকলা! আধুনিক ছবিতে ইয়োরোপীয় প্রভাব পড়েছে। ঐ দীর্ঘ অলিন্দের উপরে কাঠের উপরের ছবিগুলো কোন 'পিরিয়ডের' বিশেষ শিল্প তা লী আমাকে বলল। কিন্তু সে সব মনে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমাদের যেমন অজন্তার শিল্পআঙ্গিক এ-দেশে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে তার পুনরুজ্জীবন হয়, তা না হলে রবি বর্মার আঙ্গিকই প্রাধান্য বিস্তার করছিল, মনে হয় চীন দেশে সে বিচ্ছেদ হয়নি। ক্লান্ত শরীরে ভালো করে দেখতে পারলুম না যে বিশেষ মতামত দিই। লী আমায় বলতে লাগল কিভাবে বারে বারে এই প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়েছে। তারপর হঠাৎ বললে, 'তোমার যে বই পুরস্কার পেয়েছে তার নাম কি?'

'যাহা মরে না।'

'কাহিনীটা বল।'

'তোমাকে মহাকবি বলেছে।'

'মহাকবির কথা আমি বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া তুমি তো বইটা পড়োনি, খালি রিভিউ পড়েছে।'

'কোনো বইয়ের চুম্বক শুনে তার সম্বন্ধে কোনো পূর্ণ ধারণা করা যায় না, তাই আমি গল্পটা বলব না।'

'তা হলে বল কি মরে না। এমন কি কিছু আছে, যা মরে না?'

'আছে। কিন্তু একজন তার সম্বন্ধে আর একজনকে দিতে পারে না।'

'তা হলে কি সে বস্তু বল! ফিলিংস—অনুভূতি?'

'খানিকটা তাই। তবে অত সরলীকরণ চলে না। করুণা হলে তবে মানুষ বুঝতে পারে।'

'কার করুণা? তুমি ঈশ্বর মানো?'

'জানি না। আমি কি মানি তা কি আমি জানি? মানুষ নিজেকে কতটুকু জানে? তবে তোমাদের তো বোঝা উচিত। তোমাদের প্রিয় নেতা বা গুরুর ডাকে কতজন অবলীলায় প্রাণ দিয়েছে—তারা অমরত্বের আস্বাদ পেয়েছে।'

'নিশ্চয়ই, শহীদরা তো অমরই।'

'কেন, মার্টারস হলে তাদের ছবি টানিয়ে রেখেছে বলে? ও ছবি পোকায় কাটবে—দু-তিন প্রজন্ম পরে অর্থহীন হয়ে যাবে। অমরত্ব ছিল সেই মানুষটির বোধে। অমরত্ব সময়ের ব্যাপ্তিতে নেই, আছে কালের বিশেষ বোধে। ওটা কোয়ানটিটেটিভ নয়, কোয়ালিটেটিভ।'

আমরা দীর্ঘ অলিন্দপথ দিয়ে চলেছি, দু পাশে কৃত্রিম নদীর ধারা বরফ হয়ে রয়েছে। তার মাঝে মাঝে শুকনো অসংখ্য পাটকাঠির মত ডাল উঁচু উঁচু হয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওগুলো কি?' লী বললে, 'পদ্মের ডাঁটা। দেখছ না কত শুকনো পদ্ম পাতা।' বুঝতে পারলাম 'অঘ্রাণে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।' আমি ভাবছি এত পদ্ম ফোটে? শুনলাম বসন্তকালে হাজার হাজার পদ্ম ফুটে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'লী, তুমি সেই সহস্র কমল দেখেছ?'

'নিশ্চয়ই। কতবার আমি অতিথিদের নিয়ে এসেছি।'

'এখন বল এই শুকনো ডাঁটাগুলো সত্য, না সেই বসন্তের শোভা?' ইতিমধ্যে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চত্বরে নেমে এসেছি। অদ্ভুত অদ্ভুত বিচিত্র তরুশ্রেণী পার হয়ে। দূরে গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। বাঁচা গেল! এবার পা টান করে বসতে পারব।

সন্ধ্যেবেলা সেই বিশেষ সম্মানার্হ ভোজ। ইয়ে সিয়েন ইং (Yeh Chien Ying) হচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান। ইনি আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা। ক্লান্ত শরীরে আমরা নিমন্ত্রণের জন্য তৈরী হলাম। আমি শুনেছি সেইদিন আমাদের অ্যাম্বাসাডার শ্রীনারায়ণন-এর ক্যানটন যাবার কথা ছিল। তাঁর পত্নী ও পুত্রদের আনবার জন্য। তিনি তাদের অসুবিধায় ফেলেও এই নিমন্ত্রণে এলেন। কারণ, এত উচ্চপদস্থ কারু নিমন্ত্রণ তিনি আগে পাননি এবং ভাইস চেয়ারম্যান ইয়ে-র সঙ্গে দেখা হওয়া তিনি প্রয়োজন ও সম্মানজনক মনে করলেন।

এই বিশেষ নিমন্ত্রণের জন্য যথোপযুক্ত সাজগোজ করার মত তখন শারীরিক শক্তি কারুরই বোধহয় ছিল না। সারা দিন এত ঘোরাঘুরি গেছে, তবু আমি বৎসলাকে বললাম, "বৎসলা, এই তোমার সুযোগ, জীবনে পরম লগনে কোরো না হেলা। ভালো করে সাজগোজ করে নাও—যাতে চীনের দ্বিতীয় নারী হতে পার সে চেষ্টা করা যাক। মার্শাল ইয়ে-কে আজ 'বিদ্ধিও কটাক্ষ শরে।'

বৎসলা বললে, "আমার মঙ্গল যদি তোমার মনের ধারেকাছেও থাকে তা হলেও এ প্রস্তাব করবে না।"

"কেন?"

"দেখলেই বুঝতে পারবে।"

গ্রেট হল অফ দি পিপল—মহালোকসন্নিগৃহ থিয়েনানমেন স্কোয়ারের পাশে স্বর্গীয় শান্তির তোরণের উল্টো দিকে নিষিদ্ধ নগরীর মুখোমুখি অবস্থিত। অনেক সিঁড়ি ভেঙে সেই বৃহৎ অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করলাম। একটা ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। ঘর গরম, তাই আমাদের কোট চাদর টুপি প্রভৃতি বাইরে ঝুলিয়ে রেখে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। নিমন্ত্রণকর্তা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখে বৎসলার মন্তব্যের মানে বুঝতে পারলাম—ইনি বৃদ্ধ, অতিশয় বৃদ্ধ। স্থবির বলা চলে। পরে বিজয়বাবুর কাছে শুনেছি, এঁরই চেয়ারম্যান হওয়ার কথা ছিল। অর্থাৎ, মাও-সে-তুং-এর পরেই ছিল এঁর স্থান। কিন্তু ইনি নিজেই বলেন যে, তাঁর এত বয়স হয়েছে যে, এই পদে হুয়া কুয়া ফেং প্রতিষ্ঠিত হোন কারণ বার বার চেয়ারম্যান বদল ভালো নয়। এ কথা শুনে আমার এই বৃদ্ধের প্রতি ভক্তি হয়েছিল। চিরদিন রাজনীতি করেও বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়েও, তিনি যে নির্মোহ মনের পরিচয় দিয়েছেন, চৌদ্দবার জপতপ করে গীতা আউড়িয়েও তো দেখি অশীতিপর বৃদ্ধরা গদি খালি দেখলেই উদ্বাহু হয়ে ছোটেন। ভদ্রলোক ধীর স্থির শান্ত, তাঁর ভিতর থেকে একটা শান্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আগে সকলের পরিচয় দেওয়া ছিল। তিনি হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন, "তুমিই লেখক? কি লিখবে চীনের বিষয়ে? একটা কবিতা লিখবে তো?" এঁর সঙ্গে সেদিন আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হচ্ছেন মিলিটারী কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান। ভাইস চেয়ারম্যান বিজয়-বাবুকে খুবই চেনেন। যখন তাঁরা মেডিক্যাল মিশনে এসেছিলেন তখন থেকেই জানা-শোনা। মণ্ডেশ কোটনিসকেও চেনেন। ১৯৫৮ সালে ইয়েসিয়েন ইং যখন ভারতে আসেন তখন বম্বেতে কোটনিস পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁদের বাড়িতে যান। কাজেই তিনি পরিবারের সকলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর একে একে সকলের সঙ্গে একটু একটু কথা বললেন। আমাকে শান্তিনিকতনে চীনা ভবনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন ও প্রফেসর তানের কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপরে তাঁর ভারতভ্রমণ স্মৃতি চারণ করতে লাগলেন। ঝাঁসির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানী ছবি দেখেছিলেন—বড় ভালো লেগেছিল। ভারতের বানরের নির্ভীক বেপরোয়া ভাবভঙ্গি ও দক্ষিণ ভারতের মেয়েদের অভ্যর্থনা—এসব গল্প করলেন ; ও তারপর ভারত ও চীনের দীর্ঘদিনের মিত্রতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে ধীরে ধীরে অনেক কথা বললেন। বললেন, থিয়েনান মেন স্কোয়ারে ভারতীয় অ্যাটাচির দিকে হাত বাড়িয়ে মাও-সে-তুং নাকি বলেছিলেন—ভারতের প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের হাত প্রসারিতই আছে। এই কথাটি বলা মাত্রই আমাদের রাষ্ট্রদূত আমাদের সকলের হয়েই যেন বলে উঠলেন, "দ্যাট হ্যাণ্ড অব ফ্রেণ্ডশিপ হ্যাজ বিন গ্র্যাস্‌পেড ইউর এক্সসেলেন্স!" এত আন্তরিকতার সঙ্গে, এত সপ্রতিভভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তরটি দেওয়া হল যে, খুবই ভালো লাগল।

গল্পগুজবের পর ছবি তোলা হল সকলে মিলে একটা পরদার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার মনে হল ঐখানটা ছবি তোলবার জন্যই সাজানো আছে। এই ঘরেই দেশবিদেশের নানা ব্যক্তি অভ্যর্থিত হন। ২৪শে ডিসেম্বরের পিকিং রিভিউতে এই ছবি প্রকাশিত হয়।

তারপর এ ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা আর একটা বড় ঘরে গেলাম। সেখানে তিনটি টেবিল নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যে সাজানো ছিল। এতদিন যত ভোজ খেয়েছি তার চেয়ে এটি প্রচুর, প্রভূত ও উৎকৃষ্ট। কারণ এটি উচ্চ সরকারী সংবর্ধনা। টেবিলের উপরে বনস্থলীর দৃশ্যে ছোট ছোট আলো জ্বলছে ও প্রায় ১৫/২০ রকমের 'কোল্ড ডিশ' সাজানো। পরে গরম ডিশ আসছে তো আসছেই। আমি ভাবছি লী আমার পাশে বসবে ও আমাকে প্রত্যেকটি খাদ্যের পরিচয় দেবে ; তা আমাদের মাঝখানে বসলেন মহাকবি। মহাকবির সম্বন্ধে কয়েকটা কথা লিখেছি, কিন্তু আজকে সার কথা লিখব। এ থেকে এদেশের মদ্যপরা যেন একটু শিক্ষা নেন। তিনি মানুষ হিসাবে অত্যন্ত ভালো, নিরভিমান, ক্রোধ-দ্বেষশূন্য সহিষ্ণু। তাঁর দুটিটা বাহিরগুণ, কিন্তু সেটা নিয়েই আমি খিটমিট করি, কারণগুলি সামান্য, মুরগীর ঠ্যাংটা ছিটকে আমার কাপড়ে পড়ল, ঝোলের বাটিটা টেবিলের উপর উল্টে গেল ইত্যাদি। কিন্তু সেদিন পাশের ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে ফিরে দেখি মহাকবি নেই—গেল কোথায় লোকটা, সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা মাথায় আসতে লাগল—আমি সভয়ে লীকে জিজ্ঞাসা করলাম—মহাকবি কোথায়? সে নির্বেদ সহকারে বলল, 'আছেই কোথাও।' মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো মহাকবির প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করব না। বেশ অনেকক্ষণ পরে মহাকবি ফিরলেন, আমি পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বললাম, "গিয়েছিলেন কোথায়?" তিনি সহাস্যে বললেন "টয়লেট!"

ভোজনশেষে চমৎকার দক্ষিণা মিলল একটি করে চীনা সিল্কের শাড়ি আর ড্রাগন আঁকা টেপেস্ট্রী কাপড়ের দুটি ক'রে কুশন। আমার ভারি ইচ্ছা করছিল—আমাদের তরফ থেকে এই বৃদ্ধকে কিছু দিই ; কিন্তু সঙ্গে তো কিছু ছিল না। আর কিইবা দেওয়া যায়! একটা বয়সের পর মানুষের আর কিছু দরকার থাকে না।

পরদিন ১৬ই আমরা পিকিং ছাড়ব। আমার কোট নিয়ে সমস্যা দাঁড়িয়েছে। একটির বেশী কোট বওয়া চলবে না। দক্ষিণে শুনছি গরম, তাই ওদের বড় কোটটি এখানে ফিরিয়ে দেব। সঙ্গে নেব চীনা কোট। আর বিলিতী কোটটা কি করি! সু-কে বললাম, "সু, তুমি এই কোটটা নাও—তোমাকে সুন্দর মানাবে।" সু আকাশ থেকে পড়ল, "এ দিয়ে আমি কি করব? এ আমি পরতে পারব না।"

"কেন?"

"কেউ পরে না।"

"তোমরা চীন দেশে এমন অনেক কাজ করেছ যা কেউ করে না, আর এইটুকু পারবে না?"

বাঙ্গালীর পোশাকের উন্নতি করবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাজামায় কোঁচা লাগিয়ে একটা পোশাক তৈরি করেছিলেন। কবি বলতেন, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া অনেক সহজ, কিন্তু উদ্ভট পোশাক পরা সহজ নয়—এক জৈদাই পারতেন। আমি সু-কে বললাম, "তুমি যদি না নাও, আমি ডিসকারডেড বলে ওয়েস্ট বাস্কেট-এর পাশে রেখে দেব।" সু হইচই করে উঠল। চীনেরা নষ্ট করা ভালোবাসে না। ওরা সাশ্রয়ী, মিতব্যয়ী। এদিকে আমেরিকা একেবারে উল্টো। আমেরিকার আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকে ভালো ভালো জিনিস। অবশ্য আঁস্তাকুড় বলতে আমাদের চোখে যেমন উনুনের ছাই, কাঁঠালের ভূতি ও ঘেয়ো কুকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেসে ওঠে তেমন নয়। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বড় বড় পলিথিনের ব্যাগে আবর্জনা ভরে মুখ বন্ধ করে রেখে যায়। প্রত্যেক বাড়িতে ভেজা ময়লা ও শুকনো ময়লা আলাদা ব্যাগে ভরতে হয়। এ'টোকাঁটা হচ্ছে ভিজে ময়লা, কাগজপত্র শুকনো ময়লা। এ সব বিষয়ে খুব সতর্ক ওরা। আমেরিকায় ঐ পলিথিনের ব্যাগগুলোর পাশে পড়ে থাকে ঝকঝকে পাইরেক্সের বাসন, স্প্রিং-এর খাট ইত্যাদি। গাড়ির আস্তাকুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পড়ে থাকে গাড়ির পর গাড়ি। মেরামত করা ব্যয়সাধ্য ও হাঙ্গামা—চীনে এটা ভাবা যায় না। যাই হোক, ফেলে দেবার ভয় দেখিয়ে কোটটা অনেক কষ্টে সুকে গছানো গেল।

১৬ তারিখে বিকেলবেলা পিকিং রেডিও থেকে দেখা করতে এল কিছু উপহার নিয়ে। ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল আমি জানতাম না, তাই যাইনি ; যাঁরা জানতেন, গিয়েছিলেন। ওরা আমার কিছু রেকর্ডিং করবে ভেবেছিল, যন্ত্রের গোলযোগের জন্য হয়নি। এরা সুন্দর বাংলা অক্ষরে নিজের নাম লিখে গেল। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঁচজন বেশ ভালো বাংলা বলেন ও লেখেন। সেইদিনই বিকেল চারটেয় রুই আলির বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ। সবাই চলে গেছে, তাই পিকিং রেডিওর লোকের সঙ্গে ভালো করে কথা না শেষ করেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে যেতে হল।

রুই আলির বাড়িটি একটি ছোট অ্যান্টিক হাউস বলা চলে। পুরনো বাড়ি পুরানো ফার্নিচার সাজানো। আমার তাঁর সঙ্গে বিশেষ কতগুলি কথা বলবার ছিল। আমার জানবার ইচ্ছা ছিল কবি মাও-সে-তুং-এর রোমান্টিক জীবনের খবর। আমাদের সঙ্গে যে শুম্ফং কাঙ্তং লোকগুলি ঘুরছে তারা জানেও না, জানবেও না। কিন্তু তার সুযোগ পাওয়া গেল না। ট্রেনে আমি রুই আলিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মাও-সে-তুং চিয়াং চিংকে বিবাহ করলেন কেন—ও যদি এমনই ভয়ঙ্করী ?" রুই আলি বলেছিলেন, "সে কি আর তখন ভয়ঙ্করী ছিল! সে ছিল এক পরমাসুন্দরী সাংহাই-কন্যা—যেমন জর্জ হাতেমের স্ত্রীকে দেখেছ।"

AMARBOI.COM

যাক্, সেদিন কিছু পরেই আমরা পিকিং ছাড়লাম। সকালে নানকিং পৌঁছব। গুহায়িত 'পিকিং' দেখে অবধি ভাবছি কখন মংকে একলা পাব। রুশদের সঙ্গে ওদের কলহের ব্যাপারটা ভালো করে জানব। রুশরা অ্যাটম বোমা চীনের উপর ফেলতে পারে—এরকম একটা কথা আমাকে উদ্বিগ্ন ও অসুখী করেছিল। কারণ, আমি যে দেখেছি তাদের শান্তি-প্রচেষ্টা। লুসানে রাশিয়ার উৎসাহে ১৯৫৫ সালে চার হাজার মহিলাকে নানা দেশ থেকে একত্র করা হয়েছিল। তাঁরা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বলেছিলেন। তার মধ্যে চীনের মেয়েরাও ছিলেন। রাশিয়ার যে ভয়াবহ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার কত কাহিনীই শুনেছি। কত ছবিই দেখেছি। আজকে কি তারাই আবার অন্যের উপর সেই মারণ-অস্ত্র হানতে পারে ?

ট্রেনে লী, মং আর আমি বসলাম—অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়ে। বৎসলাও এসে যোগ দিল। মং বললেন, "আমি যেমন মনে আছে বলছি—সন-তারিখ ওলটপালট হতেও পারে। নেবুলা থেকে পৃথিবী এক দিনে হয়নি। এর একটা 'প্রসেস' আছে—এটা হঠাৎ ঘটে না।" এইভাবে মুখবন্ধ করে মং কাহিনী শুরু করলেন—"মাও-সে-তুং দু'বার সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। প্রথমবার স্টালিনের সময়—১৯৫০ সালে। সেই সময় ত্রিশ বছরের জন্য একটি শান্তি চুক্তি হয়। তাই আইনমাফিক আমরা ওদের সঙ্গে "অ্যালাইনড", কিন্তু কার্যত নয়। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত আমরা ওদের কাছে অনেক শিখেছি, তা অস্বীকার করব না। স্টালিন আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন—এজন্য আমরা সোভিয়েট দেশের মানুষদের কৃত উপকার কখনো অস্বীকার করি না। রাশিয়ার জনগণের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অবশ্য স্টালিনও আমাদের সম্বন্ধে ভুল করেছিলেন। আমাদের যখন যুদ্ধ চলছিল, স্টালিন ভাবতেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না ভিতরে পা[illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি উপদেশ দিলেন, চিয়াং-কাই-শেকের বিরুদ্ধে যেও না। মাও সে পরামর্শ গ্রাহ্য করলেন না। পরে স্টালিন মাও-সে-তুং-এর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করেন। সেইজন্যই তাঁকে আমরা মহান বিপ্লবী বলি। মহত্ত্ব থাকলে ভুল স্বীকার করা যায়।"

এইবারে আমি বাধা দিলাম—"কমরেড মং, তুমি এখন স্টালিনের প্রশংসা ক'রো না, ওটা সহ্য করা শক্ত। ও মরেছে, পৃথিবী জুড়িয়েছে—হিটলারের যমজ ভাই।"

"এটা ঠিকই—সোভিয়েট ইউনিয়নে সে অনেক মানুষের উপর অত্যাচার করেছে। তাঁর নীতি মাও-সে-তুং-এর নীতি নয়। কিন্তু সে যতটা করেছে আর তোমরা যতটা শুনেছ—তার মধ্যে তফাৎ আছে। ক্যাপিটালিস্ট প্রেস সেখানে অনেক বাড়িয়েছে। মনে রেখ—চৌদ্দটা বিদেশী শক্তি রাশিয়াকে আক্রমণ করেছিল। রাশিয়া বড় একলা ছিল। যা হোক, আমাদের মতে, স্টালিনের মৃত্যুর পর মালেনকভই ছিলেন তার ন্যায্য উত্তরাধিকারী। স্টালিনই তো সোভিয়েট রাশিয়া গঠন করেছিলেন। কিন্তু ক্রুশ্চেভ চক্রান্ত করে গদি দখল করলেন।" বলতে বলতে মং-এর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। তীব্র ঘৃণার সঙ্গে তিনি বললেন, "ক্রুশ্চেভ কনস্পিরেটর, ক্রুশ্চেভ ইউজারপার।"

আমি ক্রুশ্চেভকে একটু প্রশংসা করব ভেবেছিলাম, আমার তো গোলগাল আমুদে লোকটিকে ভালই লাগত। কিন্তু মং-এর রাগ দেখে সামলে নিলাম।

"১৯৬০ সালের কিছু আগে থেকে আমাদের আদর্শের বিরোধ ঘটল। ক্রুশ্চেভ বললেন, তিনিই সমস্ত দেশের প্রতিনিধি। তাঁর মত হচ্ছে—১। শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা। ২। শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন ও ৩। ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এই হচ্ছে রিভিশনিজমের মূল নীতি। ১৯৫৪ সালে মস্কোতে ইন্টারন্যাশনাল মিটিং হল। মাও-সে-তুং গেলেন। তিনি ক্রুশ্চেভের মতের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু সেটা 'পাস' হয়ে গেল। ক্রুশ্চেভ নিজের মতে বলতে লাগলেন, মাও-সে-তুং-এর কোনো কথার কর্ণপাত করলেন না। এর পর ক্রুশ্চেভের মাথায় এক পরিকল্পনা এল। তিনি বললেন, চীনের এবং রাশিয়ার মিলিত নৌবহর থাক চীনের পোতাশ্রয়ে। চীনের তো তখন কোনো নৌবহরই নেই—, তাই চেয়ারম্যান বললেন, তোমরা যদি আমাদের সাহায্য করতেই চাও, তা হলে আগে আমাদের নৌবহর বানাতে সাহায্য করো। সে কথা ক্রুশ্চেভ কানে তুললেন না। তাঁর মতলব—নিজেদের নৌবহর চীনের সাগরে রেখে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করবেন। এতে রাজী হওয়া মানে স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া। আমরা রাজী হতে পারলুম না। তারপর গুপ্তচরবৃত্তি চালাবার জন্য ক্রুশ্চেভ এখানে লং ওয়েভ রেডিও স্টেশন স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আমরা রাজী হলাম না। তখন তিনি দারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। সুয়েজ ক্যানেলের ব্যাপারে আমরা ইজিপ্টকে সমর্থন করলাম। ক্রুশ্চেভ আবার ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তখন আমেরিকায়। চীন, তাইওয়ান ও অন্যান্য স্থানে নিজের স্বাধীন মতে কাজ চালাল। তাতে ক্রুশ্চেভ দেখলেন যে, তাঁর মতের ছায়ানুবর্তী আমরা নই। ১৯৫৯ সালে ফেরার পথে ক্রুশ্চেভ চীন দেশে এলেন। ভোজসভায় তিনি খোলাখুলি আমাদের আক্রমণ করলেন। তিনি ক্রমাগত আমাদের কাজের সমালোচনা চালালেন। কিন্তু আমরা মাথা নত করলাম না। এতখানি ছাড় ঘোরাবার অধিকার আমরা কাউকে দিইনি। ১৯৬০ সালে আমাদের ঝগড়াটা প্রকাশ্য হয়ে গেল। ১৯৬০ সালে রুমানিয়াতে একটা কনফারেন্সে ক্রুশ্চেভ হঠাৎ চীন ও আলবেনিয়াকে আক্রমণ করে বসলেন। ক্রুশ্চেভের এই পিঠচাপড়ানো ভাবে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তারপর সেই বছরের শেষভাগে তিনি একটি নিষ্ঠুর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিলেন। তিনি চীন থেকে সমস্ত সোভিয়েট এক্সপার্ট অর্থাৎ কুশলী কর্মীদের ফেরত নিয়ে গেলেন। আমাদের তো এগ্রিকালচারাল দেশ—এ-দেশকে আধুনিক করার কাজে ওরা আমাদের সাহায্য করছিল। যেখানে ব্রীজ তৈরী হচ্ছিল সেখান থেকে ইঞ্জিনীয়াররা তাদের ব্লু প্রিন্ট গুটিয়ে ফেলে, ব্লু প্রিন্ট পকেটে পুরে চলে গেল। যেখানে হাইড্রলিক প্ল্যান্ট বসছিল, যেখানে তেলের খনিতে তেল ওঠাবার চেষ্টা হচ্ছিল, সমস্ত কর্মক্ষেত্র থেকে সমস্ত রাশিয়ান 'কুশলীরা' (এক্সপার্ট) রাতারাতি উধাও। কোনো চিহ্ন রেখে গেল না যাতে আমরা কাজটা চালাতে পারি। অর্থাৎ কিনা আমাদের সঙ্গে চূড়ান্ত শত্রুতা করে আমাদের মাথা নত করাবার, আমাদের নৈতিক শক্তি নষ্ট করে দেবার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল। শুধু তাই নয়, আমাদের যে-সব অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল—যার উপর নির্ভর করে আমরা নানারকম প্রকল্প শুরু করেছিলাম, তাও বন্ধ করে দিল। যেসব ওয়ার্কশপ শুরু হয়েছিল, যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছিল, তার ব্লু প্রিন্ট নিয়ে যাওয়ায় কাজ স্থগিত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, আমাদের কাছে দত্ত ঋণ ফেরত চাইল। দুই বছর থেকে চীনে খরার প্রকোপ, দুর্ভিক্ষ লেগেছে, কিন্তু রাশিয়া বলতে লাগল—আমরা যেসব কনস্ট্রাকশন করেছি তার দাম ফেরত দাও। কোরিয়ান যুদ্ধের সময় যেসব অস্ত্রশস্ত্র ধার দিয়েছিলাম তার দাম এখনই ফেরত দাও। তারা আমাদের কাছে এক হাজার মিলিয়ন ডলার ফেরত চাইল। একবার চেয়েই নিরস্ত হল না, অবিলম্বে ধার শোধ করার জন্য হুমকি দিতে লাগল। এবং আমাদের বন্দরে ওদের জাহাজ পাঠাল টাকা না দিলে আমাদের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যাবার জন্য। তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বললেন, শক্ত করে কোমর বাঁধো—কম খাও—আমরা ধার শোধ করে দেব। আমরা তখন পেট্রোলিয়ামের জন্যও রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিলাম। আমাদের তৈলখনি বিদেশীরা এসে একটু খুঁড়ে বলত, তেল নেই। এমন অবস্থায় রাশিয়া পেট্রল রপ্তানি বন্ধ করে দিল। তখন কি অবস্থা আমাদের! ওদিকে দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ—এদিকে এই রকম বঞ্চনা। ক্রুশ্চেভ চীনের মানুষের দুঃখ বুঝলেন না। যাক, আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ঋণ শোধ করে দেব, ওদের কোনো সাহায্য নেব না। প্রাণ যায় তাও ভালো। গ্যাসোলিন নেই, তাই আমরা গ্যাসে গাড়ি চালাতাম; প্রত্যেক ট্রাক বা বাসের মাথায় প্রকাণ্ড বেলুনে গ্যাস ভরা হত। তারপর, তোমরা তাচিং-এর কথা শুনেছ—সেই তাচিং-এর তেলের খনি খোঁড়া হল। মন্ত্রী ইউচেন লী কর্মীদের আর পি-এল-এ-দের নিয়ে পূর্ব-পশ্চিম দিকে একটি বিস্তীর্ণ অনাবাদী ঊষর জমিতে তেলের সন্ধানে কাজ করতে লাগলেন। রাশিয়ানরা পূর্বে এই স্থান পরীক্ষা করে বলেছিল যে, এখানে কোনো তেল নেই—চীনেই তেল নেই। কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিকরা বরাবর বলছে—চীনে প্রচুর তেল আছে। তোমরা প্রায়ই শুনেছ, মাও-সেতুং বলেছেন, "ইন এগ্রিকালচার লার্ন ফ্রম তাচাই এ্যান্ড ইন ইন্ডাস্ট্রি লার্ন ফ্রম তাচিং।" খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেই বিরাট তৈলখনির কাজ শেষ করায় একটা আশাতীত কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটেছে। আমাদের এখন বহু মিলিয়ন টন তেল উঠছে। তাচিং ছাড়া আরও তৈলখনি আছে। আমি এসব শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, আমাদেরও তেলের খনির জন্য বিদেশীরা পরীক্ষা চালায় ও পরে শুনি তেল পাওয়া গেল না। শ্রীনিকেতন থেকে কিছু দূরে কোপাই নদীর ধারে বছর পনের আগে কারা যেন তেলের সন্ধান করছিল, পরে শুনলাম তেল পাওয়া গেল না—সেও এইরকম নয়ত? যা হোক, মং বলতে লাগল, রাশিয়ানরা অতর্কিতে এই বিশ্বাসঘাতকতা করায় আমাদের ক্ষতি হয়নি। আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। আমরা শিখেছি কঠিন শ্রম করতে, আত্মনির্ভর হতে। ১৯৬৪ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে দ্বাবিংশতম পার্টি কংগ্রেস হল। তখন ব্রেজনেভ ক্ষমতায় ছিলেন। অনেক আশা করে প্রিমিয়ার চৌ এন লাই গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের ডেলিগেশন নিরাশ হয়ে ফিরে এলো।

আমি এবার মুখ খুললাম—'কিন্তু কমরেড মং, তোমরা দু-জনরাই সোস্যালিস্ট দেশ—তোমাদের মধ্যে এতটা মতানৈক্য ঘটা সত্যিই আশ্চর্য। সমস্ত দোষ নিশ্চয়ই ক্রুশ্চেভের নয়?'

'হ্যাঁ, তারই। সে বললে, সে-ই সমগ্র রাশিয়ার প্রতিনিধি। ওরা তো আর সোস্যালিস্ট নেই—যা আছে, তা হচ্ছে সাইনবোর্ড—বুঝেছ! বাইরে বড় অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে, ভিতরে অন্য মাল। দেখছ না চেকোস্লোভাকিয়ায় ট্যাঙ্ক নামলো—'

'কিন্তু কমরেড মং, গুলি তো ছোড়েনি।'

'ছুঁড়েছিল। আর গুলি ছোড়া না-ছোড়া ভিন্ন কথা, ভয় দেখিয়েছিল। ওরা "অ্যাগ্রেসর"।' মং খুব উত্তেজিত—'ওরা ইম্পিরিয়ালিস্ট, তাই আমাদের সীমান্তে সৈন্য জড়ো করে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। চেন পাও (?) দ্বীপে উরসু নদীর তীরে ওরা এসেছিল আমাদের আক্রমণ করতে। ওদের উদ্দেশ্য যদি সফল হত, আমাদের চীনাভূমির অনেকটাই দখল করে নিত। এর যুদ্ধসাজ হচ্ছে কেন? ইউ এস এ বছরে ষোল শ' মিসাইল বানায়, ওরা বানায় দু হাজার। রাশিয়ান নৌবহর খুব শক্তিশালী—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে পড়ল—বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় যখন আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল আমাদের ভয় দেখাবার জন্য তখন রুশ নৌবহর তার পিছু পিছু এসেছিল। আমি বললুম, 'কমরেড মং, এক সময়ে ক্রুশ্চেভকে আমি খুব শ্রদ্ধা করেছিলুম।'

'কেন ?'

'প্রথম কারণ—আমার মনে হয়েছিল, তিনি স্টালিনের লৌহ কারাগারের কপাট খুলে দেশের মানুষের উপর খোলা বাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন। খোলা বাতাস না হলে মানুষের দম বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কিউবার ব্যাপারের সময় আমি তাঁকে সম্রাট অশোকের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম—যিনি বলেছিলেন ধর্মবিজয়ই বিজয়, অস্ত্রবিজয় বিজয়ই নয়।'

'ক্রুশ্চেভ কবে একথা বলল ?'

'ক্রুশ্চেভ বলেননি ; তবে তিনি যে একটা বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য নিজে খানিকটা অপমান সহ্য করেও কিউবা থেকে রণতরী ফিরিয়ে আনলেন, এটা কি কম কথা ?'

'মিসেস দেবী, প্রথম প্রেমিসটা ছেড়ে যাচ্ছ। কিউবায় রণতরী পাঠাতে ক্রুশ্চেভকে কে বলেছিল ? আর একটা দেশের অধিকারের মধ্যে যুদ্ধের হুমকি পাঠানোই তো ওর কাজ। রণতরী পাঠানোটা তাই আমেরিকার উপর অ্যাগ্রেশন। তারপর কেনেডি তো আর কচি খোকা নয়। সে যখন হুঙ্কার দিয়ে ফিরে দাঁড়াল তখনই লেজ গুটিয়ে চম্পট—এটা হল ক্যাপিচুলেশন। এর মধ্যে কোনটা তোমার কাছে শ্রদ্ধার যোগ্য মনে হচ্ছে ? মাও-সে-তুং বলেছেন, 'আমাদের আক্রমণ না করলে আমরা আক্রমণ করি না—আমরা কখনো প্রথম গুলিটি ছুঁড়ব না।'

মং বলে চলেছে। আর আমি ভাবছি—আমাদের দেশে অনেকে মনে করে, গ্যাং অফ ফোররা হচ্ছে র‍্যাডিকেল। এরা চলে গেলেই রুশদের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যাবে। তা একেবারেই নয়। শুধু মং-এর কাছে নয়, আরো অনেকের কাছেই ক্রমাগত শুনছি। সমস্ত দেশ তাদের প্রতি বিমুখ হয়ে আছে। সহজে হবে না তবে রাজনীতির গতি সূক্ষ্ম।

এইসব ভাবছি, তখন মং বললে, 'মিসেস দেবী, ওরা তোমাদের বন্ধু জানি। ভেটো দিয়ে দিয়ে অনেক সাহায্য করেছে ঠিকই। কিন্তু এই বন্ধুত্বের আসল স্বাদ আচিরেই টের পাবে। রুবলের দাম বাড়িয়ে বাড়িয়ে এখনই কি তার আভাস দিচ্ছে না ?'

মং উঠে পড়ল। ঘড়িতে চেয়ে দেখি রাত দেড়টা। কমরেড মং-এর সঙ্গে ট্রেনে যে কথা হচ্ছিল, তারই নিদর্শন চোখে দেখলুম ও কানে শুনলুম পরের দিন নানকিং-এ।

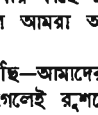

১৭ই সকালে নানকিং পৌঁছলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর ইয়াংসি নদীর উপর নৌবিহার হল। এতদিন আমরা আপেল খাচ্ছিলাম, এখানে কমলালেবু পাওয়া গেল। নানকিং-এ ঢোকবার সময়ই একটি প্রকাণ্ড ব্রীজের উপর দিয়ে ঢুকতে হয়। এই ব্রীজ ওদের গর্ব। ওদের সম্পদ। ইয়াং-সিকিয়াং শুনে মনটা ইতিহাসের রাজত্বে চলে গেল। 'ম্যাপে যে সব পাহাড় জানি, জানি যে সব গাঙ্, কুয়েন্ লুন্ আর মিসিসিপি, ইয়াং সিকিয়াং—' চওড়ায় আমাদের হুগলীর গঙ্গার তিন গুণ। এই জলকল্লোলিত দুরগামিনী নদীর বুকে বসে চীনকে বড় আপনার মনে হল। লণ্ড আমাদের সেই বিরাট ব্রীজের নিচে ঘুরিয়ে নিল। ব্রীজটি দু-তলা। আমরা নীচের তলায় ট্রেনে ঢুকেছিলাম। তার উপরতলায় মানুষ ও গাড়ি চলবে। নৌবিহার শেষ করে আমরা ব্রীজের উপর এলাম। যদিও নানকিং অনেকটা দক্ষিণে, তবু যথেষ্ট ঠাণ্ডা। জোলো ঠাণ্ডা বাতাস সত্ত্বেও ব্রীজে বেড়াতে খুবই ভাল লাগছিল। ব্রীজটি দৈর্ঘ্যে চার হাজার পাঁচ শত উনসত্তর মিটার ও প্রস্থে উনিশ পয়েন্ট পাঁচ মিটার। নীচের জল থেকে সত্তর মিটার উঁচু ও নীচে জলের গভীরতা ত্রিশ মিটার। ব্রীজে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আমরা ব্রীজ টাওয়ারে উঠলাম। লিফটে সাততলা ওঠা হল। সেখান থেকে সমস্তটা দেখা গেল। মিটারের কথা যা নোট করেছিলুম লিখেছি। কিন্তু সেখানে আমার কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে, ওটা ছয় মাইল দীর্ঘ। কারণ, নদী পার হয়েও অনেকটা চলে গেছে।

টাওয়ার-ঘরে ব্রীজের একটা প্রতিমূর্তি আছে। ওখানকার প্রধানা কর্মী একটি মহিলা তথ্য দিতে দিতে আবার সোভিয়েট রাশিয়ার কথায় চলে গেলেন। তিনি বললেন, 'এই ব্রীজ তৈরি করার কাজ শুরু হয় ১৯৬০ সালে। শুরু হবার পরই রুশরা তাদের কাগজপত্র গুটিয়ে চলে গেল। এই ব্রীজ তৈরী হতে যে স্টীল লাগে তা চীনে তৈরী হত না। তাই রাশিয়া থেকে সে স্টীল আসবার কথা ছিল। তাদের সঙ্গে কনট্রাকট ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক মতবিরোধের ফলে তারা একতরফা সে কনট্রাকট বাতিল করে দিল। ব্রীজ অমনি পড়ে রইল। কিন্তু মাও-সে-তুং উৎসাহ দিলেন। তিনি আনসান স্টীল কম্পানিকে বললেন, তোমরা ঐরকম ভালো স্টীল বানাও। চেষ্টা করলে পারবে। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগল, এবং বহু পরিশ্রমে ও চেষ্টায় তারা অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাত বানাতে সমর্থ হল। এখন চীন দেশে বিদেশের তুল্য ইস্পাত তৈরী হচ্ছে।' ভদ্রমহিলা উত্তেজিতভাবে রাশিয়ানদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলছিলেন ; এবার তাঁর মুখটি কোমল হল। তিনি বললেন, 'একটা খারাপ কাজ একটা ভালো কাজের কারণ হল।'

১৯৬০ সালে ব্রীজ তৈরী হওয়া শুরু হয়েছিল, ১৯৬৮ সালে শেষ হয়েছে। এর মধ্যে চট্ করে এরা ভালো স্টীল বানানোও শিখে নিয়েছে। তাজ্জব ব্যাপার! গাড়িতে দীনেশ ও আমি আলোচনা করছিলাম—এত কর্মশক্তি সেই আফিংখেকো জাত পেল কোথা থেকে? এত উদ্যম, এত আশা, প্রেরণা? যে প্রেরণা জীবন থেকে জীবনে প্রবাহিত হয় তা কি সত্যিই মুককে দিয়ে বলায় কথা—পঙ্গুকে সে পাহাড় করায় পার?

নানকিং-এ আমরা একটা সুন্দর গেস্ট হাউসে উঠেছি। উঠেই বিপত্তি। আমার স্যুটকেসের তালাটা আটকে গেছে, কিছুতেই খোলা গেল না। আমি লী-কে বললাম, 'ভেঙ্গে দাও—তারপর দড়ি বেঁধে চালাব।' লী রাজী হল না। ওরা কিছু নষ্ট করতে চায় না। স্যুটকেসটা কোন দোকানে কাপড়সুদ্ধ পাঠিয়ে দিয়েছে। সব সমস্যা খুঁত খুঁত করছিল মনটা। দোকানে খুলবে অত জিনিসপত্রসুদ্ধ—কি জানি কি হয়। ফিরে দেখি, অক্ষত দেহে স্যুটকেস ফিরে এসেছে। খোলা এবং অটুট।

সেদিন রাত্রে সরকারী ব্যাংকোয়েট। কংগ্রেস্ প্রভিন্সের রেভলিউশনারি কমিটি নিমন্ত্রণ করেছেন। ইয়াং-সিকিয়াং নদীর বক্ষোলগ্না দু-হাজার চারশ' বছরের তরুণী নানকিং কাংগসু প্রদেশের রাজধানী।

কাংগসু বা চাংসু প্রদেশের রান্না উত্তর দিকের চেয়ে অনেক ভালো। আমাদের ঝাল দেওয়া মুরগির ঝোল খাইয়ে দিল। খাদ্যের প্রাচুর্যে বিস্মিত হতে হয়। ন'জনের জন্য ন'টা মুরগি রেঁধে ফেলল। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক তো আছেই।

১৮ই সকালে আমরা নানকিং-এর একটি বড় মেডিকেল কলেজ দেখতে গেলাম। যদিও পূর্বে আর একটি হাসপাতালের বর্ণনা লিখেছি, তবুও চাংসু কলেজ অব নিউ মেডিসিন-এ যা যা শুনেছি তার উল্লেখ করা ভালো। কারণ, চাষ ও চিকিৎসা—এ দুটি বিষয়ে এবং এরই সঙ্গে শিক্ষা বিষয়েও অনেক নূতন পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছে চীন। কালচারাল রেভলিউশনের সময় মাও-সে-তুং-এর নির্দেশে পুরাতন চীনা চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও দন্ত-চিকিৎসালয়—এই তিনটি মিলে এই শিক্ষায়তন। মাও-সে-তুং চীনা ফার্মাকোলজির এক অভিনব সংস্করণ করলেন। এই হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে শিক্ষা লাভ করতে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রছাত্রী আসে। সম্প্রতি আশিজন তিব্বতী ছাত্র আছে। টানজানিয়া ও অন্যান্য আফ্রিকান দেশ থেকে তো আসেই, তা ছাড়া আমেরিকা থেকে তিন মাসের জন্য এসে আকুপাংচার শিক্ষা করে গেছে একদল ছাত্রছাত্রী। কমিউন থেকে বেয়ারফুট ডাক্তাররা এসেও শর্ট টার্ম শিখে যাচ্ছে। এই হাসপাতালে তিন হাজার নয় শত বেড—এক হাজার ছয় শত ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে আছে চাষী, শ্রমিক ও সৈন্য। এবং এর উনপঞ্চাশ ভাগই মেয়ে। হাসপাতাল-কর্মীর সংখ্যা দু হাজার তিন শত। মোটের উপর, খুব বড় হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে ১৯৭০ সালে রেভলিউশনারী কমিটি গঠিত হয়েছে। তখনই আর্মি, চাষী ও শ্রমিকরা শিক্ষা নিতে এসেছে—যাতে প্রত্যেক গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায়। এখানে যারা ডাক্তারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তে এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই অন্তত দু বছরের কর্মের অভিজ্ঞতা আছে। এভাবে যারা ভরতি হয়েছে তাদের মধ্যে পাঁচ শত ছেলে এখানে এক বছর শিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। দ্বিতীয় দল আসে '৭২ সালে। তারা মিডল স্কুল শেষ করে দু বছর কর্ম শিক্ষা সমাপ্ত করে এসেছিল। দ্বিতীয় দল ১৯৭২—১৯৭৫ তিন বছর ডাক্তারি পড়েছে। এখন এরা তিন বছরে ডাক্তারি 'পাস' করে। ছেলেরা শুধু কলেজে পড়ে না, গ্রামে ও ফ্যাকটরিতে কাজ করতে যায়। ছয় মাস কলেজে বিদ্যা শিক্ষায় ডাক্তারির কিছু মূল তত্ত্ব শিখে চীনা চিকিৎসা, আকুপাংচার ইত্যাদির সঙ্গে রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থা শেখে। তারপর ছয় মাসের শেখা ঐ বিদ্যা নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল কর্মশিক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়ে। এই সময় পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ বাইরে থাকে। তারপর ফিরে এসে ক্লিনিক্যাল কাজের কতগুলি মূল শিক্ষা পায়। এবং কয়েক মাস পরে আবার বেরিয়ে পড়ে। এমনিভাবে ছয় মাস কলেজে শেখে আর বাইরে প্র্যাকটিস করে। তৃতীয়বার গিয়ে তারা শুধু চিকিৎসাই করে না, বেয়ারফুট ডাক্তারদেরও শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ, বেয়ারফুট ডাক্তার তৈরি করে। ১৯৭১ সাল থেকে এইসব ছাত্ররা কলেজের বাইরে লক্ষ লক্ষ লোকের চিকিৎসা করেছে? দশ হাজার 'বেয়ারফুট' ডাক্তার তৈরি করেছে। প্রথম ছয় মাস ওরা অ্যানাটমির কতকগুলি মূল বক্তব্য ও প্রাথমিক কিছু ঔষধ ব্যবহার ও আকুপাংচার শেখে ও দফায় দফায় এই 'মুক্তদ্বার শিক্ষা' অর্থাৎ ক্লাসের বাইরের শিক্ষার দ্বারা জনসংযোগ ঘটে—মানুষকে সেবা করতে শেখে। ইতিপূর্বে গ্রামে কোনো ডাক্তারই যেতে চাইত না। এখন সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

চীন যাবার আগে আমাকে এখানে অনেকে বলেছিলেন, 'বেয়ারফুট' ডাক্তারের বিষয়ে জেনে আসবেন। আমরা এখানে ছয় বছর মেডিকেল কলেজে পড়বার পর শহরের ছেলেদের হঠাৎ গ্রামে যেতে বলি। তাতে সাড়া পাওয়া যায় না। কি করে যাবে? মেডিকেল কলেজে পড়তে যে প্রচুর ব্যয় হয়েছে তার খরচ উঠবে কোথা থেকে? তা ছাড়া শহরের ছেলেরা গ্রামে কোনো সুবিধাই পাবে না। অনেক সময় তাই গ্রামে যাবার জবরদস্তি অত্যাচারের মত বোধ হতে পারে। ওখানে তো তা নয়। ওখানে যারা ভরতি হয় তাদের সবাই আগে দু বছর কোথাও না কোথাও গ্রামেই কাজ করে এসেছে। তাদের সমস্ত খরচ সরকার বহন করে। মিলিটারি থেকে যারা এসেছে তারা মাইনে পায়। তাতেই খরচ চলে। কাজেই সরকারী অর্থে অর্জিত শিক্ষা তারা স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে কিছু দিন দিতে পারে। শিক্ষার সময়টাই মাঝে মাঝে গ্রামে কাটিয়ে গ্রামের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অবাধ হয়। তা ছাড়া বেয়ারফুট ডাক্তাররা শহরের ছেলে নয়, তারা গ্রামেরই ছেলে। সেই গ্রামে গিয়েই ছাত্ররা তাদের শিখিয়েছে, কখনো বা তারা শহরের কলেজে এসে শিক্ষালাভ করে গ্রামে ফিরে গেছে। এ অবস্থায় 'বেয়ারফুট' ডাক্তারদের সমস্যা থাকবে কেন?

এই মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারি ছাড়াও বিদেশী ছাত্রদের ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনার জন্য কালচারাল রেভলিউশনের পর রেভলিউশনারি কমিটি তৈরী হয়েছে। এই কমিটিতে একুশজন সভ্য। এরা আলোচনা করে নিয়োজিত হয়েছে (বাই ডেমোক্রেটিক কনসালটেশন)। মিঃ গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কমিটির চেয়ারম্যান কি পলিটিকসের জন্য এই পদে আছেন, না ডাক্তারি বিদ্যার জন্য?' উত্তরে শুনলাম—মাও-সে-তুং বলেছেন, সর্বত্র রেভলিউশনারী কমিটির চেয়ারম্যান রাজনীতিতে দক্ষ, শারীরিকভাবে সুস্থ ও নিজ নিজ বিদ্যায় পারঙ্গম হবেন এটাই ঈপ্সিত। এঁরা ঐক্যের জন্য সর্বদা জনসাধারণের মতামত নেবেন; মার্কস, স্টালিন ও মাও-সে-তুং-এর রচনা থেকে শিক্ষা লাভ করবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সমস্ত ডাক্তারি শিক্ষাটা চীনা ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। আগে ইউরোপীয় বই থেকে চীনাতে অনুবাদ করে নেওয়া হত। এখন নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছে। সমস্তরকম বিদ্যাশিক্ষা উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমেই হয়। এই সব কথা বলতে বলতে তিনি আরো রাজনীতি বললেনঃ মাও-সে-তুং বলেছেন—ডু নট কনস্পায়ার, বি ওভারবোর্ড; এইজন্যই আমাদের রাজনীতিতে সব খোলাখুলি।

এই প্রসঙ্গে তাই কমিউনিস্ট দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের যে একটি দৃঢ়মূল ধারণা আছে সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। কমিউনিস্ট দেশ অর্থ রাশিয়া ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চীন। কিন্তু রাশিয়া ও চীনকে এক ছাঁচে ফেলা যাবে না বলেই ধারণা হচ্ছিল আমার। আসল কথা, এক মতে নিবর্তিত হলেও প্রত্যেক দেশের নিজস্ব চারিত্রিক বিশেষত্ব আছে। সেগুলিকে উপেক্ষা করে কোনো নেতা সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে পারেন না। নানা প্রসঙ্গে আমি যে বিপুল কর্মোদ্যোগের বর্ণনা দিচ্ছি তাতে একটা প্রশ্ন উঠছে—এই উদ্যোগ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, না জবরদস্তি ফল? এসব বিতর্কের পুরোপুরি উত্তর আমি দিতে পারি না। কারণ, আমার অভিজ্ঞতা স্বল্প। কিন্তু আমাকে ভাবতে হচ্ছে—জবরদস্তি করে মানুষকে কতখানি কাজ করানো যায় এবং কদিন তা চলতে পারে? অত্যাচার কি কখনো প্রেরণা আনে? আর, প্রেরণা না হলে কি এত বড় বিপুল কর্মযজ্ঞগুলি সফল হয়? যার ফলে নয় শত মিলিয়ান মানুষের মধ্যে কেউ বেকার নেই, অনাহারে নেই, দ্রব্যমূল্য আজ চৌদ্দপনেরো বছর এক আছে, ইনফ্লেশন নেই, কোনো দেশের কাছে ঋণ নেই, কোনো দেশের কাছে প্রার্থী নয়। রাশিয়ার ঋণভারমুক্ত হয়ে এ-দেশের মানুষের বুকের পাটা বিস্তৃত হয়ে গেছে। জবরদস্তি অল্প সময়ের জন্যই বাহ্যিক ফল দেখায় তাতে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটায় না। আমার মনে হয়, স্টালিনের নীতিই কমিউনিস্ট দেশ সম্বন্ধে এক প্রকার ভীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

১৯৬১ সালে মস্কোতে একটা পার্কে বসে আমার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করছিলাম—স্টালিন সম্বন্ধে যা শুনছি তা সত্য কি? সে চুপ করে রইল। বারবার জিজ্ঞাসা করায় পরে সে বলল, 'তুমি কি জানো না, এখন সারা বিশ্ব জানে!'

'তোমরা আগে জানতে না কেন?'

'আমাদের কাছ থেকে গোপন করা হয়েছিল।—হিটলারের চরও যখন ইহুদীদের ধরে নিয়ে যেত তখন পাশের বাড়ি থেকেও কেউ টের পেত না, তারা শুধু দেখত ইহুদীরা নেই। তারা কোথায় গেছে, কি হয়েছে—জানত না। এরকম অবস্থা চীনে হতে পারে বলে মনে হয় না। এরা এত খোলামেলা, এত তার্কিক। মাঝে মাঝে এদের পলিটিক্যাল স্বপ্ন হচ্ছে—যারা হেরে যাচ্ছে, তারাও বেঁচেবর্তে আছে। এখনও এখানে সাত-আটটা পলিটিক্যাল পার্টি আছে। তাদের তেমন জোর নেই, তবে অস্তিত্ব আছে। এমনকি, 'প্রগ্রেসিভ কুয়োমিনটাং' পার্টি নামেও একটি দল আছে।

আমি ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'লেডিকে বলে—তোমরা লিন্ পি আও-কে মেরে ফেলেছ। কথাটা কি সত্যি?' তারা বললে, 'আমরা কি করে মারলাম? ক্যাপিটালিস্ট রটনা এমনি বটে! সে তাড়াতাড়ি প্লেনে করে তার পরম বন্ধু সোভিয়েট দেশে পালাচ্ছিল—তেল না নিয়েই। প্লেনে তেল ফুরিয়ে গেলে তো প্লেন পড়ে যাবেই!'

মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে অনেকেরই মতদ্বন্দ্ব হয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছেন। কারণ, জনসাধারণকে তিনি তাঁর অনুবর্তী করতে পেরেছেন। তবু আমাদের সমালোচনা এই যে, শত পুষ্প বিকশিত হোক বলে তিনি শতপুষ্পবিকাশ নিজেই বন্ধ করলেন। এ কথার উত্তরে কেউ কেউ আমায় বলেছেন, শত পুষ্প বিকাশের জন্য শেয়ালকাঁটার আধিপত্যও সহ্য করতে হবে এমন নয়। এতে করে যে সমাজব্যবস্থা তৈরী হয়ে ফল পাচ্ছে দেশের জনসাধারণ, তাকে আবার পিছন দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা সহ্য করা যায় না।

যা হোক, ডেমোক্রেটিক দেশে ধরা যাক আমাদের দেশে, মতের স্বাধীনতা খুবই আছে এবং আমরা তা চাই। কিন্তু সব মতের যথেচ্ছ চাষ হলে কি ফুল ফোটে তাও আমরা দেখেছি অনেক। যদি কেউ বলে, হ্যাঁ, হরিজনদের ঘৃণা করবার আমার অধিকার আছে, কমিউন্যাল হবার আমার অধিকার আছে, কুসংস্কারে বিশ্বাসের আমার অধিকার আছে, মুখ থেকে শিবলিঙ্গ বের করে ভেল্‌কি দেখিয়ে মানুষকে বুদ্ধিভ্রংশ করবার অধিকার আমার আছে—আমরা সয়ে যাই। ফলে, দেশ এক পা এগোয় তো দশ পা পেছোয়। ডেমোক্রেসির চর্চা করার জন্যও মানুষকে শিক্ষিত করা চাই। এলোমেলো চিন্তার রাশ ছেড়ে দেওয়া উদ্দামতা কোনো সফলতা আনে না। যে-কোনো একটা মত হলেই হলো, সে আকাশ জুড়ে উড়ুক আর কাঁটাবাঁজ ছড়িয়ে যাক, এ চীনের নূতন ব্যবস্থায় হতে পারে না। পারলে চীন আজ যা হয়েছে তা হতে পারত না। কাঁটার চাষে শস্যর যে বিঘ্ন হয়।

স্টালিনের মতের সঙ্গে যে মাও-সে-তুং-এর মতের এ বিষয়ে মিল নেই তা আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা তাঁর লেখা থেকে দেখিয়েছে। উনিশশ' ছাপ্পান্ন সালের ২৫শে এপ্রিল তিনি একটি প্রবন্ধে (অন টেন মেজর রিলেশনসিপ) যা বলেছিলেন তার সামান্য আলোচনা করব। এই ঘোষণাটি না পড়া থাকলে মাও-সে-তুং-এর যথার্থ স্বরূপ চেনা যায় না।

তিনি বলছেন, 'কি করে সোস্যালিস্ট দেশ তৈরি করা যাবে? প্রথমত, ভিতর ও বাহিরের সমস্ত অনুকূল শক্তিকে একত্র করতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেক ভুল হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি ক'রো না। দ্বিতীয়ত, যারা অনুকূল নয়, এমন কি বিরুদ্ধ, তাদের অনুকূল করবার চেষ্টা কর।

'আমরা যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশের থেকে এগিয়ে যেতে পরেছি তার কারণ—বৃহৎ শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষিকর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে পেরেছি।.....'

সোভিয়েট ইউনিয়ন চাষীদের একেবারে নিংড়ে নিয়েছে—তারা কম দামে অনেক বেশী শস্য নিয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে চাষীদের উৎসাহ নিবিয়ে দিয়েছে। তুমি যদি চাও যে, মুরগিটা ডিম দিক আর তাকে খেতে না দাও, বা যদি চাও ঘোড়াটা দৌড়াক কিন্তু তাকে চরতে না দাও—এ কেমন বিচার!' (এসব বলা হচ্ছে ১৯৫৬ সালে। কাজেই বোঝা যায়, ক্রুশ্চেভের ক্রুদ্ধ হবার কারণ ঘটেছিল)।

'.....আমরা সোভিয়েট নীতি অনুসরণ করে কেন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা একত্রীভূত হতে দেব না। আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মুখ বন্ধ করে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকার কেড়ে নেব না। আমাদের মত বৃহৎ দেশে কেন্দ্রের সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধটা মসৃণ হওয়া দরকার।.....

'.....একটা পার্টি থাকা ভালো, না অনেক পার্টি থাকা দরকার?' তিনি নিজেই প্রশ্ন করে উত্তর দিচ্ছেন। মনে হয় অনেক পার্টিই থাকা ভালো। তাতে দীর্ঘদিন সহবস্থানের শিক্ষা ও পরস্পরের উপর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে অনেক ডেমোক্রেটিক পার্টি আছে—যাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া ও ইনটেলেকচুয়ালরা আছেন—যাঁরা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে এবং চ্যাংকাইশেকের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তাঁদের অস্তিত্ব এখনও আছে। এই দিক থেকে চীন সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে পৃথক। আমরা এঁদের থাকতে দিয়েছি—তাঁদের মত প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছি—আমরা তাঁদের সঙ্গে মিলিতও হচ্ছি, সংগ্রামও করছি। আমরা এসব ডেমোক্রেটিক পার্টিদের আমাদের সমালোচনা করবার সুযোগ দিচ্ছি। যদি তাঁরা শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনা করেন সেটা শোনবার যোগ্য। তাঁদের সমালোচনায় উপকার হয়। যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন কুয়োমিনটাং সৈন্যর মধ্যের সেরকম লোকরা, যেমন উইলি হুয়াং ও ওয়েং ওয়েন হাও প্রভৃতি, তাঁদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করব। এমন কি, যাঁরা আমাদের প্রচণ্ড গাল দেয়, যেমন লিয়াংসুমিং, লুং ইয়ুন ইত্যাদি, তাঁদের গাল দিতে বাধা দেব না। যদিও তাঁদের বক্তব্য যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করে যাব। যেসব নিন্দা অর্থহীন তার প্রত্যুত্তর দেওয়া, যেসব নিন্দায় সত্য আছে তা মাথা নত করে সহ্য করে নেওয়া—এই হচ্ছে নীতি এবং এই নীতি পার্টির পক্ষে ও জনসাধারণের পক্ষে ভালো।

.....কমিউনিস্ট পার্টি ও ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলি সবই ইতিহাসের ফসল। ইতিহাসের ফসল ফলে, আবার মিলিয়ে যায়। তাই কমিউনিস্ট পার্টির আয়ুও একদিন শেষ হবে। তাতে কি খারাপ লাগবে? খারাপ লাগার কারণ নেই। আমার মতে, এ খুবই ভালো কথা। একদিন যে ডিক্‌টেটরশিপ অব দি প্রলিতেরিয়েৎ আর থাকবে না—আমার কাছে এ শুভ সংবাদ। আমাদের কাজ হচ্ছে সেই শুভ দিনকে ত্বরান্বিত করবার চেষ্টা করা। এ কথা অনেকবার বলেছি। কিন্তু এখন আমাদের আরো শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আমরা এখন তো সে স্তরে পৌঁছইনি। কাউণ্টার রেভলিউশনারী ও ইম্পিরিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের পার্টির কাজ একেবারেই শেষ হয়নি। ডিক্‌টেটরশিপ অব দি প্রলিতেরিয়েতের মধ্যে একটা জবরদস্তি আছে। তাই আমাদের বুরোক্রেসির অত্যাচার ও জবরজঙ্গ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধতা করা উচিত।.....

এবারে মাও-সে-তুং-এর রেভলিউশন ও কাউণ্টার রেভলিউশনের সম্পর্ক সম্বন্ধে মতামত বলছি।—অনেকের ধারণা, সমস্ত কমিউনিস্ট দেশেই জহ্লাদের অবাধ রাজত্ব। জহ্লাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে একটা দেশ গড়া যায় না—সে কথা অনেককে বোঝাতে পারি না। তাই মাও-সে-তুং-এর লিখিত বহুপ্রচারিত মতগুলি স্মরণ করছি। তিনি বলেছেন—'কাউন্টার রেভলিউশনারীরা—নেগেটিভ ও ডেস্ট্রাকটিভ—তারা সৃষ্টি করে না, ধ্বংস করে। তাদের মধ্যেও পরিবর্তন আনা সম্ভব ; যদিও একেবারে ঝুনোরা বদলাবে না। ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালানো হয়েছিল তার প্রয়োজন ছিল। যাদের যুক্তি দিয়ে সংশোধন হবে না তাদের বিরুদ্ধে কি উপায় আমরা নেব? মৃত্যুদণ্ড, জেল, চোখে চোখে রাখা, বা যথেচ্ছ থাকতে দেওয়া? জেলে দেওয়া অর্থ শুধু বন্ধ করা নয়। কর্মের মাধ্যমে তাদের মত পরিবর্তন করানো। চোখে চোখে রাখা মানে সামাজিক শাসন। আর মৃত্যুদণ্ডর অর্থ পরিষ্কার। এটা সত্যি যে, উপরুক্ত সন্ঘর্ষে (১৯৫১-৫২) কয়েকজন লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা কিরকম লোক ছিল? তারা বহুলোকের হত্যার দায়ে দায়ী। পরিষ্কার। এটা সত্যি যে, উপরিউক্ত সন্ঘর্ষে (১৯৫১-৫২) কয়েকজন লোককে প্রাণদণ্ড না দিতাম তা হলে আজ আমরা যে নরম মনোভাব দেখাতে পারছি তা পারতাম না। এখন জানা গেছে, স্টালিন বহু লোককে হত্যা করেছে। তাই লোকে ভাবছে—আমরাও তাই করেছি। কিন্তু আমরা তা করিনি। এখনও শত্রু প্রচুর আছে। তারা শস্য পোড়ায়, গুপ্ত-চরবৃত্তি করে, গরু বাছুর মেরে ফেলে, নিন্দাজনক পোস্টার লাগায়। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু এখন থেকে ক্রমে আমাদের প্রাণদণ্ড কমিয়ে ফেলা ও অ্যারেস্ট করাও একেবারে কমিয়ে ফেলতে হবে। আমাদের ইনানে (yenan) গৃহীত নীতি অনুসরণ করতে হবে—যত কম সম্ভব গ্রেপ্তার কর, কাউকে মেরো না। এমন কি, সম্রাট হুই বা কাংৎসির মত ধূর্ত ক্রুরকর্মাদেরও প্রাণদণ্ড দেওয়া চলবে না। তারা প্রাণদণ্ড পাবার মত অপরাধ করলেও না। কারণ, একজনকে মারলে হয়তো আর একজনও তেমনি অপরাধীকে মারতে হবে। ক্রমে অনেক মাথা গড়িয়ে পড়বে। আর এর মধ্যে হয়তো একজন নির্দোষও শাস্তি পেয়ে যাবে। তার চেয়ে অন্যায় আর নেই। কারণ, অভিজ্ঞতা জানি—একবার মাথা কাটা পড়লে আর তা গজায় না। লাভই বা কি? শত্রুদের মারলে দেশের উৎপাদন বাড়বে না, বিজ্ঞানের উন্নতি হবে না। দেশের প্রতিরক্ষা জোরদার হবে না। তাইওয়ান ফিরে পাওয়া বা চার শত্রু (ইঁদুর, মশা, মাছি, চড়ুই) দূর করাও সহজ হবে না। তবে শুধু দুর্নাম হবে যে, এরা বন্দীদের মেরে ফেলে। বন্দী মানুষকে মারায় কোনো গৌরব নেই। বরং আমরা তাদের ভুল শোধরাতে সাহায্য করব। প্রত্যেকের সাহায্য প্রয়োজন। যারা ঠিক পথে আছে তাদের যদি সাহায্য প্রয়োজন হয় তা হলে যারা ভুল পথে গেছে তাদের আরো সাহায্য প্রয়োজন। জগতে সবাই দোষ করে—কেউ কম, কেউ বেশী। যারা বেশী দোষ করে ফেলেছে তাদের বেশী সাহায্য করতে হবে—যাতে তারা ক্রমে এ দেশের কাজে লাগে। আর সাহায্য না করে তাদের দোষ দেখিয়ে উল্লাস করা একরকম সাম্প্রদায়িকতা।'

মাও-সে-তুং-এর লেখা এই সহজ সরল বক্তব্য পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে কোনো তত্ত্বের কচকচি নেই ; মতের আস্ফালন নেই। একেবারে সরল সত্যর স্পষ্ট উচ্চারণ। আশা করি, এই নির্দেশ পালিত হচ্ছে।

নানকিং-এ আমরা সানইয়াৎ সেনের সমাধি দেখতে গিয়েছিলাম। সে এক বৃহৎ ব্যাপার! চার শত নব্বইটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে তবে সেই সমাধিতে পৌঁছতে হয়। এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠাই এক তীর্থযাত্রা। আমার মনে হল—মিশ্র টুম্বের সম্রাটের জন্য দাসেরা পরিশ্রম করেছিল, এই স্মৃতিসৌধ ও সোপানশ্রেণী সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় গড়া ; কিন্তু দুইয়ের মর্মকথা একই—অনিত্যকে নিত্য করার চেষ্টা!

নানকিং-এ আমরা আর একটি দর্শনীয় স্থানে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের উপর 'যন্তরমন্তর'—দুই-আড়াই হাজার বছর আগের তৈরি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নির্দশন। এর মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে ভালো লাগল একটি মণ্ডল। যেটা দেখলে হঠাৎ মনে হবে গ্লোব—পাথরের ভূমণ্ডল। আসলে সেটা আকাশমণ্ডল। মণ্ডলটি ঘোরানো যায়। সমগ্র আকাশটি যেমন আমরা পৃথিবী থেকে দেখি তেমনি দেখানো হয়েছে। সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি টেলিস্কোপ বসানো আছে। ওখানে ওঠা বড় পরিশ্রমের ব্যাপার ছিল—দরকারও ছিল না। তবু উঠলাম। এবং সেদিন থেকেই শরীর খারাপ হল। সানইয়াৎ সেনের সমাধি দেখে এসে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শুনলাম যে মহাকবির সেই বহু প্রত্যাশিত টেলিগ্রাম এসেছে এবং তিনি এখান থেকেই ফিরে যেতে চান।

এসে অবধি আমি ও বৎসলা আলোচনা করছি যে, এখানে পথ-চলতি লোকের মধ্যে ছেঁড়া নোংরা কাপড় পরা একটি লোকও চোখে পড়ছে না। সেই শুনে অবধি পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডে কেবলই ছেঁড়া কাপড়ের সন্ধান করছিলেন। সানইয়াৎ সেন অ্যাভিনিউ দিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'ঐ দেখ দেখ তালি দেওয়া জামা পরা একটা লোক—' তাকিয়ে দেখি সত্যিই একটা লোক তার জামায় একটা নয়, অনেকগুলি তালি দেওয়া খুব নিপুণভাবে। বিশ্বম্ভর বললেন, 'খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। সব দেশেই দুঃখকষ্ট আছে।' আমি অবশ্য খুঁজে খুঁজে ছেঁড়া কাপড় দেখার পক্ষপাতী নই। আমি বরং দেখছিলাম পথের দুপাশের চেনার গাছ। চেনার গাছ কাশ্মীরে বিখ্যাত গাছ। প্রায় বটের মত ডালপালা ছড়িয়ে দেয়। এখানে দেখছি সরু দীর্ঘ কাণ্ড উপরে উঠে গিয়ে মাথার উপরে ছত্রাকারে ডালপালা বিস্তার করেছে—অথচ পাতাগুলি চেনার তাতে সন্দেহ নেই। তালির চেয়েও এ দৃশ্য আশ্চর্য লাগছিল। পরে শুনলাম—বর্ষাকালে যখন ডালপালা ছড়াবার সময় তখন গাছের কাণ্ডগুলি মোটা দড়ি দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে, ডালপালা ছড়াতে পারে না, আর উপরে খোলা জায়গায় পাতার ঝাড় হয়ে যায়। মাইলের পর মাইল এই তরুশ্রেণীকে এভাবে সজ্জিত করা কম শ্রমের ব্যাপার নয়। এটা সৌন্দর্যের জন্যই করা হয়েছে।

নানকিং ছাড়ার আগের দিন রাত্রে আমরা একটি সিনেমা দেখলাম। সেটা তাচিং তৈলখনির প্রায় ডকুমেন্টারী। একটা গল্প তৈরি হয়েছে বটে, তবে সেটা সত্য গল্প। ঐ বিরাট কর্মযজ্ঞের নায়ক সাধারণ মানুষ। আমাদের ওরা বললে যে, এই ছবিটি 'গ্যাং অব ফোর'রা এতদিন দেখাতে দেয়নি। এরকম আরো অনেক ছবি বন্ধ করে রেখেছিল। এখন তারা নিজেরা বন্ধ হওয়ায় এই ছবি প্রথম দেখানো হলো। চীনা বন্ধুরাও আমাদের সঙ্গে প্রথম দেখল। এই ছবিতে এত বিপুল কর্মোদ্যম দেখানো হয়েছে যে, এটা বন্ধ করবার কি উদ্দেশ্য, আমি বুঝতে পারলাম না। যদিও আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু অন্য দেশের রাজনীতির ঘোর-প্যাঁচ টেকনিক্যাল পরিভাষা জানা না থাকায় আমি ভালোমত বুঝতে পারিনি। তাই সে সম্বন্ধে লেখবার চেষ্টা করব না। এই তৈলখনির খননকার্য শুরু করে তেল নেই বলে রুশরা চলে গিয়েছিল। বিস্তীর্ণ বরফের মরুর মধ্যে সেই খননকার্যের দুরূহতা দেখতে দেখতে শুনছিলাম—মাও-সে-তুং-এর জন্যই এ কার্য সফল হয়েছে। কেন ? তাঁকে তো তৈলখনিতে দেখা যাচ্ছে না ? তিনি দিয়েছেন চিন্তা—তিনি দেখিয়েছেন ঠিক পথ। তিনি বলেছেন, দশটি কর্ম করবে না। যেমন—কঠিন শ্রমকে বা মৃত্যুকে ভয় করবে না, যশ বা অর্থ চাইবে না, কাজ করবার সুযোগসুবিধা কতটা আছে তার বিচার করবে না, কাজের ঘণ্টা মাপবে না। মাহিনা বা পদ উচ্চ কি নীচ তার বিচার করবে না। আর অন্যের নির্দেশমত কাজ করছ বা স্বেচ্ছানির্দিষ্ট কাজ করছ তাও ভাববে না। এও ভাববে না যে, সামনে কাজ বা পিছনে বিশ্রাম। তিনটি সততা প্রয়োজন—চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে। কাজের মান ঠিক রাখা, সংগঠন, মনের ভাব স্থির রাখা ও শৃঙ্খলা—এগুলো কঠিনভাবে পালন করতে হবে। প্রধান চারটি একভাব—অর্থাৎ দিনের সিফ্‌ট ও রাতের সিফ্‌টে কাজ যেন গুণগতভাবে এক থাকে ; কাজ খারাপ আবহাওয়া ও ভালো আবহাওয়ায় এক থাকে ; পরিদর্শক উপস্থিত থাক বা না থাক, কাজের হিসাব দিতে হোক বা না হোক—কাজ যেন একইভাবে চলে। তাচিং-এর ছবিটা দেখে মনে হল, অতি দ্রুত তেল তোলা সম্ভব হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাও-সে-তুং-এর এই নির্দেশগুলো পালিত হয়েছে বলেই। নির্দেশগুলি সহজ, সরল ও স্পষ্ট। অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিও দেখা গেল ঐ ছবিতে। পুরুষরা যখন দিবা-রাত্র পরিশ্রম করছে মেয়েরা তখন পরিত্যক্ত জমিতে ফসল ফলানোর কাজ করছে। অনাবাদী জমিকে সবুজ করে তুলেছে খাদ্যে। সিনেমাটা খুব সুন্দর, কিন্তু একটিও প্রণয়দৃশ্য নেই। আমার প্রায় ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে এসেছে যে, চীনারা প্রেমে পড়ে না। ভাবলুম কথাটা সু-কে জিজ্ঞাসা করি। তা না করে বললাম, 'সু তোমাদের দেশে আমি একজন তালি দেওয়া জামা পরা লোক দেখেছি।' সু অবাক হয়ে বললে, 'একজন? অনেকেই তালি দেয় জামায়—আমরা সহজে জামাকাপড় ফেলে দিই না।'

নানকিং থেকে ফেরবার আগে আমরা একটা ফিল্ম ফ্যাক্টরী দেখতে গেলাম ও সেখানে সুখী ও বিরল প্রাণী জয়েন্ট পান্ডার জীবনের ছবি দেখলাম। অতি সুন্দর কুশলী ডকুমেন্টারী।

সাংহাইতে পেঁছলাম ২০ তারিখে। আমরা ক্রমেই দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। সাংহাই ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল শহর। এই শহরের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ রেভলিউশনারী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আমাদের কাছে 'গ্যাং অব ফোর'-এর বিষয়ে একটি বিস্তৃত বক্তৃতা দিলেন। তাঁর সামান্য দু-একটি কথা এখানে লিখছি। ফিরে আসার পর আমার কাছে এ-দেশে এ বিষয়ে অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। অনেকের ধারণা, ওঁদের মেরে ফেলা হয়েছে। এটা সত্য নয়। তাঁরা বন্দী অবস্থায় যথাস্থানেই আছেন। আগেই লিখেছি, এখানে তার পুনরুল্লেখ করছি, এঁরা সচরাচর মেরে ফেলেন না। লিউ শাও চি-র বিরুদ্ধে এত ঘটনা ঘটল—তাঁকেও বধ করা হয়নি। লিউ জেন চিং(?) প্রথম যুগের মাও-সে-তুং-এর সহকর্মী। তিনি ট্রটস্কি-ভক্ত। তিনিও পিকিং-এ গৃহবন্দী অবস্থায় আছেন। এসব শুনে আমি ভাবছি—আমাদের দেশের ছেলেরা চীনের নাম করে এত খুনখারাপি করলই বা কেন, আর ওরাই বা তার তারিফ করছিল কেন? এ প্রশ্ন করেছিলাম—যথাস্থানে তা লিখব। এখন চিয়াং চিং-এর কথা যা শুনলাম তা লিখছি। ওরা যখন দুষ্ট চতুষ্টয়ের নিন্দা করে তখন মাদাম মাও-সে-তুং-এর কথাই বেশী বলে। তার থেকে মনে হয় শুধু মতবাদের পার্থক্য ছাড়াও জনসাধারণের তাঁর সম্বন্ধে কোনো আক্রোশ আছে। ভাইস চেয়ারম্যান বলে চলেছেন—তিনি বললেন, ডাইনেস্টি বদল কর। তিনি নিজে রাজ্ঞী হতে চান—নিষিদ্ধ নগরীর প্যালেসে সাজসজ্জা করে সিংহাসনে বসে দেখেছিলেন কেমন দেখায় তাঁকে। সিডান চেয়ারে (পালকি) করে বয়ে নিতে হত,—তিনি সমুদ্র-স্নানে যাবেন। সৈন্যরা সমুদ্রের মধ্যে একটা স্থান ঘিরে পাহারা দেবে—যাতে হাঙ্গর না আসে। স্বামী মৃত্যুশয্যায়, তাঁর সাজসজ্জাই শেষ হয় না।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "এই চার সর্দার কোন্ কাজ ক্ষতিকর হয়েছিল?" উত্তরে তিনি বললেন, "এরা দেশের মধ্যে একটা ভাগ করে দেবার চেষ্টা করছিল। আর্মিতে, কেডারে, সর্বত্র বিচ্ছেদ সৃষ্টি করছিল। ওরা বলছিল, অতীতের ভ্রম থেকে ভবিষ্যতে শিক্ষা নিতে হবে। কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে বিদ্বেষের বীজ রোপণ করা যায়। ওরা ঝগড়া লাগিয়ে তুলেছিল। মাও-সে-তুং বলেছিলেন, শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ (কন্‌ট্রাডিক্‌শান) নেই ; কাজেই যা কিছু মতবিরোধ আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে হবে। কখনো মারামারি করবে না। কিন্তু ওরা চাতুরী করে বললে, ঠিক আক্রমণ করার জন্য মারব না ; কিন্তু আত্মরক্ষার সময় সশস্ত্র যুদ্ধ চাই। এইভাবে তারা একটা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে তুলছিল। ওরা কেবলমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলত, উৎপাদন বাড়ানো বা বিজ্ঞানের উন্নতির কথা একেবারেই বলত না। একটি মিটিং-এ ওরা বলেছে যে, যদি এক কণাও শস্য না থাকে তাতে ক্ষতি নেই, সংগ্রাম থাকলেই হল। ওরা শাসনের সুব্যবস্থা নষ্ট করতে চাইছিল। তাই কেরানীরা কাজ করত না, কোনো কাজ সময়ে হত না—এমনকি, ট্রেনও সময়ে চলত না। তখন তারা একটা ধ্বনি তুলেছিল—'রিভিসনিজম'-এর ট্রেন সময়ে আসার চেয়ে 'রেভলিউশনারি' ট্রেন দেরিতে আসাও ভালো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছামত বড় চাকরি দিত দল পাকাবার জন্য। ওদের প্রধান নির্ভর ছিল হুজুতে ছেলের দল। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। ওদের পিছনে জনসমর্থন ছিল না। মাও-সে-তুং বলেছিলেন, "ওদের দুটো ফ্যাক্টরী আছে—একটা স্টীলের, একটা টুপীর।" স্টীল বলতে বোঝায় জবরদস্তি ; ক্যাপ বলতে বোঝায় ছাপ, যেমন আমাদের গান্ধীটুপি। বিশেষ করে কোনো দলের ছাপ। চীনেরা খুব উপমা দিয়ে কথা বলে, তাই সংক্ষেপে ও ব্যঞ্জনায় অনেক কথা বলা হয়।

এসব শুনে আমি লী-কে বললাম, "যাই হোক, মাদাম মাও-সে-তুং খুব সুন্দরী।"

সে তো আঁতকে উঠল, "তুমি দেখেছ নাকি ?"

"তোমরা আর দেখাচ্ছ কোথায় ? ছবি দেখেছি।"

"কোথায় ছবি দেখলে ?"

"আমাদের দেশের কাগজে।"

"অ্যাঁ, তোমাদের কাগজে মাদামের ছবিও বেরিয়েছে ?"

তার মুখের ভাবখানা হল—হায় ক্যাপিটালিস্ট প্রেস !

সাংহাই ইনডাস্ট্রিয়াল শহর। এর পুরনো অংশগুলো খুব ঘিঞ্জি। এখানে নানা ইয়োরোপীয় জাতি তাদের থাবা বসিয়ে বসিয়ে লুটপাট করেছে। গাড়ি চলতে চলতে ওরা দেখায়—এটা ব্রিটিশ কনসেসন, এটা ফ্রেঞ্চ কনসেসন ইত্যাদি।

প্রথম দিনই আমরা শহর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে হোয়াংডু বলে একটা কমিউন দেখতে গেলাম। আমরা সিজিয়াচুয়াং-এ যে কমিউন দেখেছিলাম, এ তার চেয়ে অনেক বড়। এখানে নানা ধরনের জিনিসের উৎপাদন হচ্ছে। এখানে পাঁচ হাজার গৃহস্থ বাস করছে—সর্বসমেত তেইশ হাজার লোক রয়েছে। এক শত তেত্রিশটি প্রডাকশন টিম ও ষোলটি প্রডাকশন ব্রিগেড রয়েছে। চাষযোগ্য জমি দু হাজার এক শত হেকটর। চাষ হয় শস্য, সবজি ও তুলোর। বারটি ফ্যাক্টরী চলছে। প্রতি হেকটরে চৌদ্দ হাজার কিলো শস্য উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭ সালে কমিউন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে যা ফলন হত তার চেয়ে এখন ২.৮ ভাগ বেশী হচ্ছে। চাষবাসে যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে। চারা তুলে লাগানো, গম কাটা, জল দেওয়া—সবই মেশিনে হচ্ছে। ষোলটি পাম্প স্টেশন আছে এবং সাঁইত্রিশটি খাল কাটা হয়েছে। গত পনের বছর ধরে 'বাম্পার হারভেস্ট' হচ্ছে। ফলে জীবনের মান অনেক উন্নত হয়েছে। পঁচিশটি মিডল স্কুল আর আঠারটি প্রাইমারী স্কুল আছে। মিডল স্কুলের পঁচাত্তর ভাগ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা পায়। একত্রিশজন ডাক্তার আছে। প্রত্যেক ক্লিনিকে তিন-চারটি বেয়ারফুট ডাক্তার আছে। তারা রোগীও দেখে, চাষও করে। কঠিন অসুখ হলে অবশ্য কাউন্টি মিউনিসিপ্যালিটি হাসপাতালে যায়। চিকিৎসার জন্য প্রত্যেকে বছরে দু ইউয়ান করে টাকা দেয়। পাঁচজনের পরিবারে বাৎসরিক আয় গড়পড়তা বার শ' ইউয়ান। বছরে তাদের খরচ হয় সাত শ' ইউয়ান। কাজেই, বছরে পাঁচ শ' ইউয়ান অনায়াসে বাঁচে। এই টাকা তারা জমিয়ে বাড়িঘর করে বা ছেলেমেয়েদের বিয়েতে খরচ করে।

এত তথ্য শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছি। ওরা সহজে ছাড়ে না। আমরা আরো শুনলাম—সিনেমা হাউস ছাড়া তিনটি ভ্রাম্যমাণ সিনেমা ঘুরছে। এ ছাড়া আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লাইব্রেরী—ভ্রাম্যমাণ ও স্থায়ী।

কাজের সময়ের স্থিরতা নেই। প্রয়োজন অনুসারে ঠিক হয় চাষের সময়। হয়তো কখনো দিনে দশ ঘণ্টা খাটতে হয়, আবার কখনো বা চার ঘণ্টার বেশী কাজ থাকে না। সেই সময় তারা নিজেদের বাড়িঘর বানায়, কাঠ ও বাঁশের কাজ করে ও সেসব জিনিস বিক্রি করে। খুব সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার বানানো হচ্ছে। আমরা কতগুলি কারখানা দেখলাম চাষের যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামতের। সবচেয়ে ভালো লাগল বাঁশের বাস্কেট ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানারকম জিনিসপত্তর, কুটিরশিল্প। কুটির অবশ্য নয়—বিরাট বড় দালানে বহু লোক কাজ করছে—যন্ত্রে বাঁশ চেরা হচ্ছে। খুব সূক্ষ্মভাবে চিরে ফেলা হচ্ছে। হাতে অত সরু করতে পারলেও তা সময়সাধ্য। এরা কটেজ ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সর্বত্রই ছোট ছোট মেশিনের সমন্বয় করেছে। কিন্তু বাঁশের কাজ এত অপূর্ব যে, আমার লোভীর মত সবই তুলে আনার ইচ্ছা। ওরা ডাঃ বাসুকে একটা ঝুড়ি দিয়েছিল। তিনি সেটা বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডেকে দিয়ে দিলেন। কারণ, তিনি দেরিতে আসায় সিজিয়াচুয়াং-এর উপহারদ্রব্যগুলো পাননি।

এখান থেকে আমরা কমিউনের বাড়িঘর দেখতে গেলাম। আমাদের দেখবার জন্য গ্রাম থেকে ছেলেপিলে বুড়োবুড়ি সব ভিড় করে এলো। আমি সে বাড়িতে ঢুকলাম সেখানে খালি ঠাকুমা উপস্থিত ছিলেন—অন্যরা কাজে গেছে। ঠাকুমার সঙ্গে ফুটফুটে বছরখানেকের নাতিও ছিল। বাড়িটি দোতলা—ইঁটের দেওয়াল, মেঝে বাঁধানো। নয়খানি ঘর—ছোট বড় রান্নাঘর মিলিয়ে। ছেলে বউ নাতি মেয়ে ও ঠাকুমা তো আছেই, মনে হল আরো একজন কেউ আছে। নিচের তলায় চাষের যন্ত্রপাতি, উপরে বসবাস। রেডিও আছে। পরিচ্ছন্ন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ির মত। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম—ভাত ও মান্দো তৈরী হয়ে আছে, সুপ ফুটছে। বধূমাতা এর মধ্যে কাজ থেকে এসে তরকারি কুটতে বসেছেন। ওদের চুলাও উঁচু—দাঁড়িয়ে রাঁধার ব্যবস্থা। এইখান থেকে আমি গ্রামের পায়খানার খবর নিতে শুরু করলাম। আমরা যেখানেই যেতাম, হঠাৎ হঠাৎ ধিংড়াজী ও মহাকবি অন্তর্ধান করতেন। দীনেশ বলত, ওঁরা দেশে ফিরে গিয়ে চীনের 'টয়লেট' সম্বন্ধে রিসার্চের ফল লিখবেন। ওঁরা না লিখলেও আমি লিখছি। আশা করি আমার পাঠকরা এই বিষয়ের অবতারণার জন্য ক্ষুণ্ণ হবেন না। অনেকে আমাকে শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে লিখতে বলছেন। তার আগে আমি এই নোংরা বিষয়টাই একটু লিখি।

দীর্ঘদিন ধরে চীনের চাষীর কাছে 'নরবর' বা নাইট সয়েল হচ্ছে একটি সম্পত্তি। সার হিসাবে চিরদিন এর ব্যবহার হয়েছে। আমি সাংহাইতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে বর্তমানে গ্রামে কি হচ্ছে তা শুনলাম। প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে যে পায়খানা আছে তার পাত্রটি প্রতিদিনই বাড়ির একজন ময়লা নেবার গাড়িতে নিজেই ঢেলে দেয়; কিংবা নিকটস্থ বড় একটি চৌবাচ্চার ঢাকনা তুলে ঢেলে দেয়। তারপর সেখান থেকে সেটি ক্ষেতে চলে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, এ কাজ অত্যন্ত ঘৃণাজনক মনে হয় না? তাতে ভদ্রলোক বললেন, একেবারে নয়। এ কাজের জন্য আমাদের কোনো মেথরজাতি নেই। যে যার নিজের ময়লা নিজে পরিষ্কার করে। সমস্ত গ্রামের ভিতরটা পরিচ্ছন্ন—কোনো দুর্গন্ধ নেই। দূরপাল্লার মোটরে যাবার সময় গ্রামের মধ্যে যখন আমরা নেমেছি, পথে কাছাকাছি সাধারণের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলো খাটাই; তবে ব্যবহার করতে শিক্ষা দেবার ফলে একেবারে নোংরা নয়। দুর্গন্ধ আমাদের কাছে কিছুটা লাগবেই। আর একটা কথা। সব শীতের দেশের মানুষের মতই তারা জল ব্যবহার করে না। টয়লেট কাগজ ব্যবহৃত হয়। এগুলি কর্মস্থল থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। জলের যেমন পরিষ্কার করার ক্ষমতা তেমনি নোংরা করার ক্ষমতাও কম নয়। জল-কাদা, জল-মল ও শ্যাওলা মিলে যে কাণ্ডটা হয় ওখানে তা হতে পার না। এইসব সাধারণ 'টয়লেটে'র ময়লাও ক্ষেতের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। যা হোক, খাটা পায়খানা সত্ত্বেও গ্রামের মধ্যে মাছি দেখলাম না।

২০ তারিখ বিকেলবেলা আমরা পাইওনীয়ার্স-এ গেলাম—শিশুভবন। মস্কোর পাইও-নীয়ার প্যালেস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ছেলেদের নাচগান, জিমন্যাস্টিক, ছবি আঁকা, কাঠের কাজ ইত্যাদি দেখে খুবই ভালো লেগেছিল। কিছুদিন আগে রুমানিয়াতেও পাইওনীয়ার প্যালেসে গিয়েছিলাম। বরফঢাকা বিস্তীর্ণ বাগানের মধ্যে একটি প্রাসাদে খেলাধুলো, ছবি আঁকা, মডেলিং প্রভৃতি হচ্ছে। কিন্তু চীনের পাইওনীয়ার্সের কাছে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেখেলা মনে হল। ছোট একখানি বাগানের মধ্যে পাঁচতলা বাড়ি। সাংহাই শহরের দশটি পাড়ায় দশটি এরকম শিশুভবন আছে।

প্রথমে ঢুকেই দেখলাম—বার-তের বছরের দুটি ছেলে একটি পাঁচ-ছ' ফুট লম্বা এরোপ্লেন রেডিও ওয়েভ দিয়ে ওড়াবার চেষ্টা করছে। এসব এখানেও ছেলেরা করে ; কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলে মুষ্টিমেয় বড়লোকের ছেলেরাই হবি বা এ শখের চেষ্টা করতে পারে। স্কুলের সুবিধা ও পিতামাতার সুবিধা অনুসারে ছেলেমেয়েরা আসে। নানারকম হাতের কাজ, নাচগান ও পড়াশুনা হয়। পড়াশুনোর বিষয়—মার্কস লেনিন কি বলেন, মাও-সে-তুং কি বলেন এবং ইণ্টারন্যাশনাল চিন্তাই বা কি। আমার অবশ্য এত ছোট বয়সে রাজনীতি শিক্ষা ভালো লাগে না ; যেমন ছোট বয়সে ধর্মশিক্ষাও আমার মতে ভালো নয়। আমাকে এক পাদ্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার স্কুলে কি ধর্মশিক্ষা দেন ?" আমি বলেছিলুম, "ওদের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সও পড়াই না, ধর্মও শেখাই না।" "নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আর ধর্ম এক হলো ?" তিনি ভ্রূ উত্তোলিত করেছিলেন। "এক নয়—ধর্ম আরও কঠিন। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং—এতটুকু-টুকু ছেলেমেয়ে তার বুঝবে কি ?" এত ছোট বয়স থেকে একটা খোঁদল-কাটা পথে মনকে নামিয়ে দিলে তার স্বাধীন চলার ক্ষেত্রটা অপরিসর হবে। মানুষের জীবনে সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েই অভিজ্ঞতা জন্মায়—অসময়ের পাকা ফল সুস্বাদু নয়। তা দেখি—যাদের যেদিকে ঝোঁক তারা আজকাল শিশুকাল থেকেই তার তালিম শুরু করেছে। চীনেরা পলিটিকস ভালোবাসে, তারা পলিটিকস শেখাচ্ছে। বালক-বালিকা এবং শিশুদের—তাদেরও গানে গ্যাং অব ফোর-কে ধিক্কার ! আর পাশ্চাত্য দেশে ওরা যৌন ব্যাপারের চর্চায় উন্মত্ত। ওরা ভুলে গেছে—যৌনতা জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপার ; তা সারা জীবনব্যাপী নয়। ইস্কুলে একেবারে শিশুদেরও যৌনশিক্ষা দিতে শুরু করেছে—সেটা নাকি দরকারী। কত যে সুফল ফলেছে তাতে, তা দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু শিশুমনের উপর এ জবরদস্তি প্রয়োজন তো নেই-ই—অন্যায়ও। শুনেছি একটি বালক তার মাকে স্কুল থেকে শিক্ষা পেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছে—"মা, ডু ইউ হ্যাভ সেক্স রিলেশানস ?" মা থতমত খেয়ে গেলেও শিখেছে শিশুদের কাছে মিথ্যা বলবে না। তাই বলেছে, "এঃ, এঃ, পারহ্যাপস ইউ হ্যাভ !" বালক উৎসাহিত—"বাট হোয়ের আর দোজ রিলেশানস—আই ডু নট সী দেম্ !" এর চেয়ে অবশ্য পলিটিকস শিক্ষা ভালো।

পাইওনীয়ার প্রাসাদে ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ অভাবনীয়। তার বর্ণনা লিখতে অনেক সময় লাগবে। যতরকমের শিল্পবিদ্যা আছে সবই যেন শেখানো হচ্ছে। পেপার কাটিং, কাঠের এরোপ্লেন, রাইশ ডল, ছবি আঁকা, সেলাই, এমব্রয়ডারি—এমন কি, পুতুল-মানুষের শরীরে আকুপাংচার। সেই ঘরে বসে ছোট ছোট ছেলেরা আমার ব্লাডপ্রেসার মেপে ফেলল। ব্যালেও দেখলুম চমৎকার। এদের ছোটরা খুব ভালো ব্যালে নাচে। এতে ইয়োরোপীয় ধরন আছে। খাঁটি চীনা নৃত্য বলে আমার মনে হল না। তবে আমার ভুল হতে পারে। ছেলেরা কাজ করছে বড়দেরই মতন সমগ্র মন দিয়ে। এলোমেলো কিছু নেই। তৈরী বস্তুগুলো নিখুঁত সুন্দর। কিন্তু শিক্ষার আর একটি দিকের কথা ওরা আমাদের বলেছিল। সেটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগল। ওরা বলল, "আমরা খুব ছোট বয়স থেকে ওদের দেশের মানুষকে সেবা করতে শেখাই। আমাদের মহান বিপ্লবের যারা উত্তরাধিকারী তাদের জানতে হবে কি করে মানুষের সেবা করতে হয়, মানুষকে সাহায্য করতে হয়।"

আমাদের একটি মূকাভিনয় দেখালে। বিষয়বস্তুটা এইরকম : চায়ের দোকানে একটি ছেলে ও মেয়ে চা বিক্রি করছে। সামনে রাস্তা। সেখানে সাইকেল চড়ে একটি লোক চলেছে। সাইকেলের পিছনে ঝুড়িতে সবজি। হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে সাইকেল থেকে লোকটি পড়ে গেল। তার পণ্যসামগ্রীও ছড়িয়ে পড়ল। চা-বিক্রেতারা ছুটে এল, লোকটিকে তুলল। দেখল—ওর পা ভেঙেছে। ধরাধরি করে সরিয়ে নিল। (এ-সবই নৃত্যভঙ্গিমায় হচ্ছে)। তারপর হাসপাতালে ফোন করল। অ্যাম্বুলেন্স এল। তাতে তুলে দিয়ে তারপর ওর বাড়ির ঠিকানা নিল। সবজিগুলি টুকরিতে তুলে মাথায় করে নিয়ে চলল তার বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেঁছে দিতে। সমস্ত নাটকটি অতি সু-অভিনীত। আমার মনে হয়—এ ধরনের নাটক আমাদেরও বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত। বিপদগ্রস্তকে সাহায্যের নীতি সম্প্রতি এ-দেশে বিস্মৃত। আক্রান্তের আর্ত চিৎকার শুনলে লোকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তার নিজেরও যে একসময় ঐ অবস্থা হতে পারে তা মনে পড়ে না। আর রাস্তায় পথচারী যদি গাড়ির ধাক্কা খেয়ে পড়ে তা হলে সেই আহত লোকটার দিকে না তাকিয়ে আগেই ড্রাইভারের বিচার ও 'এক্সিকিউশনের' দিকে ঝোঁক পড়ে। এবং এ কাজে প্রবণতা কলেজে-পড়া ছেলেদেরও কম নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা আশ্চর্য সুন্দর গল্প খুব সম্ভব রুই আলির কাছে শুনেছি। একটি চীনা ইউরেশীয়ান ছেলে কমিউনের ভিতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে একটি বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে। বৃদ্ধর পায়ে খুব চোট লাগে। তখন মুশকিল এই যে, তার ঘরে দেখাশোনা করার কেউ নেই—ছেলেটিও একা। তাই কমিউনের সভায় ঠিক হল—বৃদ্ধ যতদিন সেরে না ওঠে, ছেলেটি তার সঙ্গে থাকবে ও তার দেখাশোনা করবে। মাস দুই সে ছিল। তারপর পরস্পরের প্রতি এমনি স্নেহ জন্মাল যে, রয়েই গেল। পরে ছেলেটি বিয়ে করল ও ঐ বৃদ্ধ একটি পুত্র ও পুত্রবধূ লাভ করল। মানব-সম্বন্ধের ভিত্তিভূমি তৈরি করাই দেশের বুনিয়াদ তৈরি করা। এ বিষয়ে একদিন আমাদের দেশ অনেকখানি এগিয়ে ছিল। তা পুরানো জগতের পুরানো মতে। নূতন জগতে মানব-সম্বন্ধকে মসৃণ করার ঝোঁক কমই। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, চীনে এখনও পিতা-মাতা সম্মানিত। বিয়ে ওরা নিজেরা আলাপ করে স্থির করে, কিন্তু মা-বাবার মত নেয়। এই সাংহাইতেই একটি শ্রমিকের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিন্নী স্কুলে পড়াতেন, রিটায়ার করেছেন। ওগুলো ব্লক-বাড়ি—তিনখানি ঘর। গ্যাস ও ইলেকট্রিক সমেত সাত ইউয়ান, অর্থাৎ আটাশ টাকা, ভাড়া। দেখলাম—নূতন ফার্নিচার ও রেডিও কিনে তিনি ছেলের জন্য ঘর সাজিয়েছেন। ছেলে বিয়ে করে ওঁদের সঙ্গেই থাকবে। এখানে দেখলাম ইয়োরোপীয়ান স্টাইলে বাথরুম। কিন্তু ওদের পুরানো প্রথা 'স্কোয়াটিং' আমাদের মত।

একটি কিণ্ডারগারটেন দেখে বেরিয়ে আসবার সময় বাচ্চাগুলো আমাদের 'চাই চিয়েন নানা চাই চিয়েন' বলতে লাগল। ওরা দাদামশাইকে 'নানা' বলে ; দিদিমাকে কি বলে, ঠিক মনে নেই। চীনের শিশুরা অত্যন্ত সুপ্রতিভ। ফট্ করে কোলে আসে, আকারে-ইঙ্গিতে আলাপ করে, একটু ভয় বা লজ্জা পায় না। বড়দের চেয়েও ওরা 'এক্সট্রোভার্ট'। দেখতেও সব লাল টুকটুকে গোলাপফুল বা আপেল। বিশ্বম্ভর পাণ্ডে সব কিছু সম্বন্ধে বেশী উৎসাহিত নন। কমিউনিজমের সম্বন্ধে তো ননই। কিন্তু শিশুদের দেখে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। এত স্বাস্থ্য, এত আমুদে, চেনা-অচেনার চিহ্নমাত্র নেই—আমাদের মন ভরিয়ে দিত।

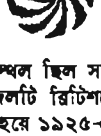

সাংহাই-তে আমাদের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল ছিল সাংহাই জেল। সাংহাই-তে দশ মিলিয়ন লোক আছে—জেল এই একটি। এই জেলটি ব্রিটিশদের তৈরী। তখন চীনের এই অংশে ব্রিটিশ রাজত্ব। ১৯১৮ সালে তৈরী শুরু হয়ে ১৯২৫-এ শেষ হয়। জাপান ও কুয়োমিনটাং-এর আধিপত্যের সময় অনেক কমিউনিস্ট এখানে বন্দী ছিল। আমরা জেলে ঢুকলাম। নীল পোশাক পরা পুলিস অল্পস্বল্প ছিল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দোতলায় উঠে আমরা প্রথম কয়েদীদের রাত্রিবাসের সেলগুলো দেখলাম। মেঝেতে পাটির গদি পাতা, তিনখানি লেপ পরিপাটি করে ভাঁজ করা, তিনটি ফর্সা তোয়ালে ঝুলছে। ঘর খালি—বাসিন্দারা অন্যত্র কাজে গেছে। আমার মনে হল, ঘরগুলো তিনজনের শোবার পক্ষে একটু ঠাসাঠাসি। সব ঘরই খালি। একটি ঘরে একজন বসে পড়ছিল। আমি লী-কে বললাম, "ঘরগুলো বড় ছোট।" ওরা বললে, "এটা তো খুব আরামের জায়গা নয়ই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা ওদের কাজের জায়গা দেখলাম। ঘড়ির পার্টস তৈরী হচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকে এরা শৃঙ্খলাবদ্ধ আসনে বসে যে যার কাজ করে যাচ্ছে। বেশ কম জায়গার মধ্যে কয়েক শত লোক কাজ করছে। সমস্ত ব্যবস্থা খুবই সুনিপুণ। ঘড়ির পার্টস তৈরির কারখানার পর আমরা একটা প্রেস দেখলাম। বিরাট প্রেস চলছে। প্রচুর লোক কাজ করছে। তারা যে বন্দী তা বোঝবার উপায় নেই। সকলের কাছে চায়ের জাগ রয়েছে। কিন্তু মুখ না তুলে একাগ্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর দেখলাম কাটা কাপড়ের ফ্যাক্টরী। কয়েক শত মেয়েপুরুষ কাজ করছে। কেউ সেলাইয়ের কল নিয়ে বসেছে, কেউ কাপড় কাটছে, কেউ প্যাক করছে।

জেলের কর্তা বললেন, "এই জেল যখন ব্রিটিশ জেল ছিল তখনকার সঙ্গে এখনকার পার্থক্য আছে। এই জেল সাধারণের আপদ নিবারণ ও দুষ্টের দমনের জন্য হলেও আমরা বাধ্যতামূলক কর্মের মাধ্যমে এদের চরিত্র বদলে দেবার চেষ্টা করি। জেলে সর্বসমেত দু হাজার আট শত বন্দী আছে। তার মধ্যে দুই শত নারী। নানারকম দোষের জন্য এদের শাস্তি হয়েছে—চুরি, দুর্নীতি, হুজ্জুতেপনা। তবে বেশির ভাগই কাউন্টার রেভলিউশনারি। এখানে রীতিমত মাও-সে-তুং-এর রচনা পড়ানো হয়—যাতে জেল থেকে এরা সুশিক্ষিত হয়ে বেরিয়ে পরবর্তী কালে সৎ জীবনযাপন করতে পারে। আমরা নানারকম আলোচনার মাধ্যমে সর্বদা সৎ আদর্শ ওদের সামনে আনি, ওদের মত বদলাবার চেষ্টা করি, খবরের কাগজ পড়াই, দেশবিদেশের খবর আলোচনা করি। ওদের আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে আনি। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে অনুরোধ করি বন্দী স্বজনদের বোঝাতে। যখন এইভাবে চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে তখন আমরা তাদের প্রশংসা করি, সুযোগ সুবিধা দিই। যারা জেলেও অসভ্যতা করে তাদের মেয়াদ বেড়ে যায়। আর একটু ভালো ভাব দেখালেই বহু প্রশংসা পায়। মাও-সে-তুং বলেছেন--বন্দীদের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহার করবে। কোনো বন্দীকে মারবে তো না-ই, গালিও দেবে না, অপমানও করবে না। ধৃত অসহায় বন্দী লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কোনো সুফল পাওয়া যায় না।" এদের ভালো খাবার দেওয়া হয়। হাত খরচও দেওয়া হয়। ইনসিওরেন্স করা হয়। আট ঘণ্টা কাজ, দু ঘণ্টা পড়া, তারপর বিশ্রাম। মাঝে খেলাধুলা বা আমোদপ্রমোদ।" সকালবেলাতেই একদল বাস্কেট বল খেলছিল। তারা শুনলাম রুগী। কিন্তু রুগীর মত দেখাচ্ছিল না। ফিল্ম প্রায়ই দেখানো হয়। জেল থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরির ব্যবস্থা করা হয়। সৎ ব্যবহার ও সুশিক্ষার ফলে বেশির ভাগ অপরাধীর পরিবর্তন হয়। নিজেদের ভেঙে গড়ে নূতনভাবে। কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা কিছুতেই বদলায় না। ডিরেকটর বললেন এবং দিনেশ, যিনি আইনজ্ঞ তিনিও, সায় দিলেন যে, দশ মিলিয়ন লোকের শহরে দু' হাজার আট শ' মাত্র বন্দী—এতে বোঝা যায়, অপরাধীর সংখ্যা বেশী নয়। শুনলাম গত ছয় মাসে মাত্র তিন শ' জন লোক অ্যারেস্ট হয়েছে। বেশির ভাগই নানারকম অপরাধের। কিছু পলিটিক্যাল। তারা ভিন্ন সেলে থাকে। সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে তারা থাকে না।

দিনেশ প্রশ্ন করলেন, বিচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে। এসে অবধি তিনি আইন ও আইন সংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে জানবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অপরাধ প্রমাণ-অপ্রমাণের ব্যবস্থা কি?" এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছিল। আমি যত দূর বুঝতে পেরেছি তা এই—ঐ দেশে উকিল ব্যারিস্টার লাগিয়ে দিনকে রাত করা চলে না। টাকা পেয়ে সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করবার উপায় নেই। সে উপায় ভালো নয়। তা হলে যার টাকা আছে তার সঙ্গে যার নেই সে পেরে ওঠে না, সুবিচার হয় না। এখানে আছে ল ওয়ার্কার্স। তারা আইন শিক্ষা করেছে, আইন জানে। তারাই বাদী ও বিবাদীকে নিজ নিজ অবস্থা বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করবে। পিপলস কোর্ট কতদিন কারা-মেয়াদ হবে তার সিদ্ধান্ত নিলে আসামীর আপীল করবার অধিকার থাকবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "কাউন্টার রেভলিউশনারি বলে এখানে যারা বন্দী তারা কি করেছে?" উত্তরে জানলাম, তাদের মধ্যে আছে আমেরিকার গুপ্তচর—যারা তাইওয়ানের স্বপক্ষে কাজ করছে। আর আছে দক্ষিণপন্থী ধনী চাষী—যারা বিরুদ্ধ মত প্রচার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেছে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াবার দিকে উৎসাহ দিচ্ছে এবং বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এ ছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ার স্পাইও আছে। ১৯৭৫ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত লি হুং সু গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে পিকিং-এ ধরা পড়ে বন্দী হয়ে আছে।

এই জেলে খুব ভালো হাসপাতাল আছে সবরকম আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। কর্মী আছে দু শ' জন। মেয়েদের ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনটি নারী বসে খবরের কাগজ পড়ছে। তাদের দেখে বিশ্রী লাগল। চেহারার মধ্যে একটা মন্দ ভাবের ছাপ ছিল—যা অন্য বন্দীদের মধ্যে দেখিনি। তাদের কি অপরাধ জিজ্ঞাসা করিনি।

জেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার মনে হল—একটা বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে এলাম।

সাংহাইতে আমার একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি মিউনিসিপ্যালিটিতে বড় কাজ করেন। তিনি ভালো ইংরেজী জানেন—বইও লিখেছেন। তাঁর বই আমেরিকাতে ছাপা হয়েছে। ইনটারপ্রেটার ছাড়া স্বচ্ছন্দভাবে একজনের সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুবই ভালো লাগছিল। সাংহাই শহর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্বন্ধে তাঁর কাছে খবর পেলাম। আমি পূর্বেই বলেছি—নূতন চীনের সবচেয়ে যা আমায় আকর্ষণ করছিল তা এদের পরিচ্ছন্নতা। আমাদের দেশে একমাত্র গান্ধীজী ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক নেতা সাফাইয়ের কথা চিন্তা করেননি। কিন্তু আমার মতে পরিচ্ছন্নতা একটা দেশের সভ্যতার ও অগ্রসরতার মাপকাঠি। দেশপ্রেমেরও। শহরের পরিচ্ছন্নতা দেখেই বোঝা যায়—আমরা দেশকে ভালবাসি, না দেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন। কলকাতার রাস্তায় জঞ্জালের স্তূপ দেখা অভ্যাস আমাদের। রাস্তায় ভিখারী দেখাও। অথচ এই দুটি দেখেই বিদেশীরা আমাদের সম্বন্ধে হীন ধারণা করে। তাতে দোষ দেওয়া যায় না। সাংহাই খুব ঘিঞ্জি শহর। পুরানো পুরানো ভাঙাচোরা বাড়িও দেখেছি গলির মধ্যে। বড় রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যেখানে যত গলি আছে দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করেছি, কোথাও এতটুকু ময়লা বা আবর্জনা চোখে পড়েনি। অথচ এখানে এক কোটি লোকের বাস এবং আগে অত্যন্ত নোংরা শহর ছিল। ইংরেজীভাষী এই ভদ্রলোকের নামটি ভুলে গেছি। ধরা যাক, তাঁর নাম মিঃ চিয়াও। তিনি বললেন,—অতি প্রত্যুষে শহরের সমস্ত জঞ্জাল বাইরে চলে যায়। শহরের সমস্ত মল ড্রেন দিয়ে গ্রামে চলে যায় ও সার করা হয়। রাস্তায় আর কেউ এক টুকরো ময়লা ফেলে না। প্রথমে মুভমেণ্ট করতে হয়েছিল ; এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে কখনো কখনো লোকে থুতু ফেলে। যদিও দেখেছি প্রত্যেক সাধারণের বড় বড় ব্যবহারের স্থানে চেম্বার পটের মত পাত্র রয়েছে কোণে কোণে। তার উপর লম্বা লাঠি লাগানো ঢাকনা। লাঠি দিয়ে ঢাকনা তুলে নিচু হয়ে থুতু ফেলে ঢেকে দিতে হবে। আমাদের এখানে যা ব্যবস্থা আছে তা যেমন কুদৃশ্য তেমনি নিরর্থক। বিশেষত পানের পিকের জন্য। আমি যদি কোনো দিন এ-দেশের ডিকটেটর হই তাহলে তাম্বুলচর্বণ বন্ধ করে দিই। মনে হয় একমাত্র হিটলার ছাড়া পানের পিক ফেলে সাধারণের ব্যবহারের জায়গা নোংরা করা আর কেউ বন্ধ করতে পারবে না। তাও কি জানি, বোধ হয় বরং গ্যাস চেম্বারে যাবে, তবুও ফেলবে। মিঃ চিয়াও বললেন, পরিচ্ছন্নতার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সচল রাখবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় কমিটি আছে। এদের বলে 'প্রতিবেশী কমিটি'। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এ কাজ করেন। তাতে তাঁদেরও উপকার, অন্যেরও। নিজেদের নিরর্থক বোঝা মনে হয় না। কাজের মত কাজ করেন। এঁদের তদারকির ফলে রাস্তায় ময়লা ফেলা, এমন কি নিজের বাড়ি নোংরা করা মশামাছির উৎপাদন-কেন্দ্র সৃষ্টি করারও উপায় নেই। একটা রাস্তায় রাস্তায় দৈর্ঘ্য অনুসারে অনেকগুলি প্রতিবেশী সংঘ থাকতে পারে। তাদের নিয়ে স্ট্রীট কমিটি। চীনের পরিচালন-ব্যবস্থা সর্বত্রই এইরকম। নীচ থেকে গড়ে উঠেছে। প্রতিবেশী সংঘ গ্রামেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। এদের কাজ নানারকম—প্রতিবেশীর সমস্ত সমস্যা দেখা, আলোচনা করা এবং সমালোচনাও করা। পথঘাট নোংরা করলে শিখিয়ে, আলোচনা করে, আত্মসমালোচনা করিয়ে জব্দ করে দেবে। অনাথালয় বলে কিছু নেই। এই বিষয়ে উৎসাহ থাকায় অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি। প্রয়োজন হয় না। কোনো বালক-বালিকা অনাথ হলে প্রতিবেশীরা ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ প্রতিবেশী কমিটি কিংবা কমিউন এসব সমস্যার সমাধান করে।

মিঃ চিয়াও তাঁর পরিচ্ছন্ন ইংরেজীতে বহু বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কালচারাল রেভলিউশনের পরে আপনিও কি কায়িক শ্রম করেছিলেন? কোথায় গিয়েছিলেন?" তিনি বললেন, "আমি একটা ফ্যাকটরীতে রোজ কিছুক্ষণ ধরে শ্রমিকের কাজ করেছি। এখনও করি।"

"পারছেন করতে?" উত্তরে তিনি বললেন, "কাজটা বড় কথা নয়—ওরা তা জানে। আমায় কোনো শক্ত কাজ দেয় না। প্রথম তো একটা স্ক্রু ড্রাইভ করতেই হিমসিম খেয়ে গেলাম। ওরা হেসে অস্থির! এখন একটু পারি।" তখন আমি ভাবলুম—ইন্টারপ্রেটার বাদ গেছে, ভালই হয়েছে। এঁকে একটু স্পষ্ট কথা জিজ্ঞাসা করি। "এই বার্ধ শ্রমে আপনার লাভ কি হচ্ছে?" তিনি বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি, আমি খুব বিদ্বান হলেও এমন অনেক কাজ আছে যা যাদের আমরা অবজ্ঞা করি তারা অনেক ভালো পারে। কোনো দিকে আমি কুশলী হলেও বহু দিকে বহু মানুষ আরো বেশী কুশলী। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা যেদিন বুঝলাম সেদিন জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ হল তা হচ্ছে—"হিউমিলিটি", বিনয়।"

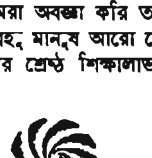

চীন সম্বন্ধে লিখতে শুরু করে অনেকের কাছে তিরস্কৃত হলেও পুরস্কৃতও কম হইনি। অনেকে বলেছেন সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে। সাহিত্য বিষয়ে বাঙালার আগ্রহ বিশ্বের সকল জাতিকে ছাড়িয়ে যায়। আমি তাই এঁদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে সীমিত জ্ঞান নিয়েই এই প্রসঙ্গে সামান্য কিছু বলব। প্রথমেই বলা ভালো, সীমিত জ্ঞান নিয়ে বেশী কথার ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। তাতে 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী'—এই শাশ্বত বাণীটির প্রমাণ হতে পারে।

আমি পূর্বেই বলেছি, আমি যাঁদের সঙ্গে ঘুরছিলাম তাঁরা কেউই সাহিত্যকর্মী বা সাহিত্যমর্মী নয়। সেজন্য আমরা ও-পাড়া বড় একটা মাড়াইনি। যা হোক, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে সাংহাইতে ২২শে ডিসেম্বর দুপুরবেলা ঘণ্টা খানেকের জন্য একজন মহিলা লেখিকা এসেছিলেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এঁর নাম হানৎসে। ইনি একটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন—উপরে চীনা আর্টিস্টের কৃত পোর্ট্রেট সজ্জিত। ইনি নিজে প্রসিদ্ধ লেখিকা নন। হানৎসে মাও-সে-তুং-এর একটি সুদীর্ঘ বর্ণনার কবিতা আমায় শোনালেন। আর নিজের কবিতার কথা না বলে যুদ্ধের সময় তিনি কি কি করেছিলেন সে কথাই বলতে লাগলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের একটি গান লিখেছিলেন সেটাও খানিকটা শোনালেন। এর কোনওটিই আধুনিক চীনা কবিতা নয়। আজকাল যেরকম কবিতায় রেভলিউশন, প্রোডাকশন ও ক্যাপিটালিস্ট রোডারদের কথা থাকে, তা নয়।

চীনা সাহিত্যে পারদর্শী অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে, মাও-সে-তুং বড় কবি নন। তিনি নিজেও বলেছেন যে, "আমাকে তোমরা অনুকরণ করো না। আমি কবি নই।" কিন্তু আমার মতে, মাও-সে-তুং খুবই বড় কবি। কারণ, তাঁর জীবনের কঠিনতম প্রয়াসগুলিও কবিতায় ঝঙ্কৃত। তাঁর বাণীতে মন্ত্রশক্তি উদ্বোধিত। বহু লোকের মুখে মুখে মনে মনে তা উচ্চারিত। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ—সকলকে উদ্দীপিত করবার আলোকশিখা তাতে আছে। তা যদি মহৎ কবিতা না হয়, তবে কবিতা কি কতকগুলি অসার উক্তি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাও-সে-তুং-এর কবিতায় রেভলিউশনের কথা কমই দেখলাম।

তাঁর বীর পত্নী শহীদ ইয়াং কাই হুই-কে কুয়োমিনটাং সৈন্যরা অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে পরে ফায়ারিং স্কোয়াডে মেরে ফেলে ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি 'চ্যাংকাইশেক নিপাত যাক', 'কমিউনিস্ট পার্টির জয় হোক'—এই ধ্বনি দিতে দিতে মৃত্যুর সম্মুখীন হন। মৃত্যুর পরে তাঁর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে কুয়োমিন্‌টাংরা শহর পরিক্রমা করে। এই পত্নীর মৃত্যুর পরে লেখা মাও-সে-তুং-এর কবিতা ও-দেশে বহু-আদৃত। কবিতাটি তাঁর বন্ধু লি সু ই-র পত্রোত্তর হিসাবে রচিত। "আমি আমার তেজস্বিনী পপলার-কে হারিয়েছি, তুমি হারিয়েছ তোমার উইলোকে।" মাও-সে-তুং-এর পত্নীর নামের অর্থ পপলার, লি সু ই-র পত্নীর নামের অর্থ উইলো। এই কবিতার ইংরাজী অনুবাদের পাদটীকায় মাও-সে-তুং লিখে দিয়েছিলেন—প্রাউড পপলার, অর্থ—শহীদ ইয়াং কাই হুই। কিন্তু পরবর্তী মুদ্রণে চিয়াং চিং তা তুলে দেন। যাতে বোঝা না যায় যে, কবিতাটি কার উদ্দেশ্যে লেখা। (এই সংবাদটি পিকিং রিভিউতে একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় আমরা চীনে থাকতেই) খুব দোষ দেওয়া যায় না। 'সতীন কেটে আলতা পরি'—সব দেশের মেয়েদেরই মনোভাব। যা হোক, মাও-সে-তুং-এর এই মধ্যমা পত্নী চীনের মানুষের কাছে বহু-আদৃত। মাও-সে-তুং-এর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ আছে এবং তাও বহুপঠিত। তবু তাঁর চাংসার 'অরেঞ্জ আইল্যান্ড' সম্বন্ধে লেখা কবিতাটির অনুবাদ দেওয়া দরকার মনে করছি এইজন্য যে, কর্মক্ষেত্রের চেয়েও কবিতায় মানুষের অন্তর্জীবন বেশী বোঝা যায়।

চাংসা—শারদ হিমে আমি একলা দাঁড়িয়ে
'কমলা' দ্বীপের চূড়ায়।
উত্তরমুখী সিয়াং নদী প্রবাহিত
সর্বত্র পর্বতচূড়া রঙীন
অরণ্য শ্রেণীর গভীর রঙে।
শতনৌকা পরস্পর স্পর্ধিত হয়ে
স্ফটিকস্বচ্ছ নীল জলে ভাসমান
ঈগল বাতাস চিরে উড়ে যায়
গভীর স্বচ্ছতায় মাছের পিছিল সন্তরণ।
বরফ-জমা আকাশের নিচে অযুত প্রাণীর
স্বাধীন লীলা
বিপুলত্বের চিন্তায় আচ্ছন্ন আমি ভাবি
এই সীমাহীন ধরায়
মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা কে?

মাও-সে-তুং নিশ্চয়ই অদৃষ্টবাদী নন। তিনি দুই হাতে নিজের ও দেশের ভাগ্যকে গঠন করেছেন—তাঁর মনে বীর্য, বাহুতে বল। কিন্তু কবিতায় এই প্রশ্নটি সুন্দর, করুণ ও বড় সত্য। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে গিয়েছে সে জানে মানুষ অনেক কিছু পারলেও অনেক কিছু পারে না। সেই না পারার বেদনা, সেই অপ্রাপ্য ধন তার কবিতার প্রেরণা। অলব্ধ আকাঙ্ক্ষা, অগীত সঙ্গীত, অজ্ঞাত ভাগ্য—এসবই তার মধ্যে এক প্রশ্নের উদ্রেক করে, যে প্রশ্নের সে উত্তর পায় না। কিন্তু প্রশ্নের মধ্যেই বেজে ওঠে কবিতার ছন্দ। যে প্রশ্ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে বিরাট নিরুত্তর।' মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা কে? এ প্রশ্নের কি কোনো উত্তর মেলে?

আমার মনে একটা শঙ্কা—শুধু কমিউনিস্ট দেশে নয়, আজকে বোধ হয় সব দেশেই সাহিত্য শুধু জানার জগতের সীমাটুকুর মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে বলে তার গভীরের দিকটা হয়তো শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তার ব্যাপ্তিও তাই সীমিত। কারণ, অজানার জগতও তো প্রতিমুহূর্তে আমাদের সত্তাকে স্পর্শ করছে। শুধু জানার জগতে কবিতার প্রবাহ সমুদ্র না হয়ে নালা হয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য জগতে প্রাধান্য পাচ্ছে যৌনতা, যা ব্যবসাভিত্তিক। কিংবা ক্রাইম বা দুষ্কর্ম—তাও ব্যবসার খাতিরে। আর কমিউনিস্ট দেশে কাজ বা চরিত্রগঠন —এই হচ্ছে সাহিত্যের প্রেরণা। সেজন্য কোনো কমিউনিস্ট দেশের সাহিত্যই আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রস দেয় না, দেয় না সেই জীবনস্বাদ, যা আমরা কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা করি। সোভিয়েট দেশে জারদের অত্যাচারের মধ্যেও যেসব সাহিত্যিক জন্মেছেন, যাঁরা সাম্যবাদের অগ্রদূত, তাঁদের পরে আর তাঁদের তুল্য একজনও পাওয়া গেল না। আর একজন টলস্টয়, গোর্কি বা চেকভ জন্মাল না। কেন? সাহিত্যের সঙ্গে কি তা হলে সুখে থাকা, সুব্যবস্থা—এর কোনো সম্পর্ক নেই? দুঃখেই কি জীবনের বাণী উচ্ছ্রিত হয়? আমাদের দেশেও পরাধীন যুগে যে ক'জন মহা মহা সাহিত্যিক জন্মে গেলেন, স্বাধীন দেশে তো তাঁদের তুল্য কেউ আর এলেন না। অবশ্য দুঃখেরও স্তরভেদ আছে। কি রকম দুঃখ সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করে? মহৎ দুঃখ, মহৎ ভাব, মহৎ প্রেরণা এসব তো কোনো অভাব অনটনের দুঃখ নয়।

যাক। চীন সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। চীনের ব্যালে, কনসার্ট ও ছবির উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এরা আবার কৃষক-শ্রমিকদেরও শিল্পরুচি বিকাশের চেষ্টা করছে। অবসর সময়ে আঁকা তাঁদের ছবিগুলি খুবই ভালো। তাতে লোকশিল্পের চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে। লোকশিল্প সর্বদাই আকর্ষণীয়। কারণ, সেটাই উৎস। প্রাকৃতজনের মনেই প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ লীলা। আমরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। বর্ণে, ছন্দে উদ্দীপ্ত ও উচ্ছল হলেও, বিষয়বস্তুগুলি শুনলে আমাদের দেশের রসিকরা অবশ্যই মুগ্ধ হবেন না। যেমন—১। ভারতীয় বন্ধুদের স্বাগত নৃত্য ; ২। সোলো বাজনা—গ্যাং অব ফোর-এর নিপাত ও হুয়া কুয়া ফ্যাং-এর অভিনন্দন ; ৩। সোল ফিডল—কমিউনে বসন্ত এলো ; ৪। আপেল-বাগানে ছুটির দিনে ; ৫। গান—রেল রোড দিয়ে অগণ্য জনগণের পিকিং আগমন ; ৬। নাচ—টেবিল টেনিস (এটি খুবই উপভোগ্য) ; ৭। সোলো গান—এক শত পাখির সঙ্গীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; ৮। ডুয়েট—তাচাই-এর অনুকরণ কর ; ৯। আমাদের নূতন তিব্বতের জয়গান ; ১০। দুর্গম পর্বতে ডাক্তারদের আগমন ; ১১। তাচাই-এর সিল্ক কুসুম সর্বত্র বিকশিত ; ১২। স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরছে (নৃত্য) ; ১৩। ছোট্ট রেড গার্ডরা টেকসটাইল মিল্লে এসেছে ; ১৪। ঘোড়সওয়ারের গান—পর্যাপ্ত শস্য ফলেছে।

নাচগুলি ভাল লাগলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও এমন কোনো উদ্দেশ্যমূলক বিষয় সচরাচর আমাদের ভালো লাগে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, প্রয়োজনের বাইরে যে ভূমি, বেটা অতিরিক্ত (সারপ্লাস্), সেখানেই শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ও ধর্মের ক্ষেত্র। এ কথাকে আমরা অনেক সময় ব্যাখ্যা করি যে, শিল্পের কোনো বক্তব্য থাকবে না, তা জীবনের কাজে লাগবে না, তা এলোমেলো উড়ো চিন্তার নির্বাধ ফসল। কিন্তু তাই কি এর মানে? রবীন্দ্রনাথ নিজে কি করেছেন? অচলায়তনের মূল কথা কি? আমরা যদি লিখি, অচলায়তন হচ্ছে পুরুত-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কুসংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম, তা হলে বড়ই চীনা-চীনা শোনায়। 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', এত বড় যে 'গোরা'—কোনটা বক্তব্যপ্রধান নয়? বক্তব্য না থাকলে সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন আকাশকুসুম বা কথার তুবড়ি কখনোই মহৎ সাহিত্য হয় না। লেখককে বলতে হবে কাজের কথাই, মানুষের কথাই। কিন্তু কেমন করে বলা হবে তার উপরই সব নির্ভর করে। মাও-সে-তুং নাকি বলেছিলেন, ভোটে সব কিছু ঠিক করা যায়, কিন্তু সাহিত্যের ভালো মন্দ ঠিক করা যায় না।

বোধহয় কুনমিনে আমরা একটি পার্বত্য উপজাতির জীবনে নূতন চীনের আগমন সম্বন্ধে সিনেমা ছবি দেখেছিলাম, কাজাক উপজাতিদের জীবন। ঘোড়সওয়ার উদ্দাম, জাতিতে মুসলমান, বরফ ঢাকা পার্বত্য প্রদেশে তাদের দুরন্ত বিচরণের ছবি বড় সুন্দর। এদের মেয়েদের ছিল মুখ ঢাকা—তাঁবুর ভিতরে বসে ঘোড়ার দুধ জ্বাল দেওয়াই যাদের একমাত্র কাজ—আজ সেখানে একটি মেয়ে টিম-লীডার নিযুক্ত হয়েছে—এ ছবি সেই বিষয়ে। নির্বাচনের ব্যবস্থাটি খুব সুন্দর, ভোটপ্রার্থীরা সারি সারি বসে আছে—আর ভোটাররা এসে প্রত্যেক প্রার্থীর পিছনে রাখা একটি সুন্দর পাত্রে একটি একটি ফুল রেখে যাচ্ছে। যার পিছনে ফুলের বোঝা বেশী গুণে দেখে সেই অনুসারে সে জিতেছে। এই গল্পটির কাহিনী একটি স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব—স্ত্রী যখন নেতৃত্ব পদ পেয়ে গেল তখন পুরানপন্থীরা উস্কানী দিচ্ছে স্বামী হয়ে স্ত্রীর নেতৃত্ব মেনে নেবে? স্ত্রী এসে ঘোড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুধ জ্বাল দিচ্ছে বটে কিন্তু হাল ছাড়ছে না। মিলনান্তক নাটক, শেষপর্যন্ত স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পারল। একটা অজ্ঞাত বন্য জাতির জীবনযাত্রার মধ্যে নূতনের প্রবেশের ছবিটা খুব মনোহারী।

ও-দেশে এখন যে কথা সর্বত্র সব প্রসঙ্গে শোনা যাচ্ছে—তা হচ্ছে গ্যাং অফ ফোর-এর অত্যাচার। এরা রেভলিউশনের নামে নাকি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে সেটা তান্ডব আকার ধারণ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রের তান্ডবটি মাও-সে-তুং নিপুণভাবে সুপথে চালিত করেন। মন্দকে ভালোতে পরিণত করেন। যতদূর মনে হয়, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বা সময় পাননি। যখন পাইওনীয়ার ছবি, যা তাচিং তেলের খনির উপর প্রায় ডকুমেণ্টারি, এরা দেখাতে দিল না তখন নাকি মাও-সে-তুং বলেছিলেন, তোমরা ওভার-ক্রিটিক্যাল হয়েছ—বড় খুঁত ধরছ। এ কথার সত্য মিথ্যা জানি না ; তবে যত দূর মনে হয়, মাও-সে-তুং শেষ বয়সে স্ত্রীর জবরদস্তির সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। আত্মীয়স্বজন বড় সাংঘাতিক জিনিস। সেখানেই ভালোবাসার উৎস, আবার সেখানেই বন্ধনদশা। সবচেয়ে মুশকিল, যাঁরা মহৎ মানুষ, যাঁরা অনেক কাজ করতে এসেছেন, তাঁদের আত্মীয়স্বজন যখন ক্ষমতালোভী বা বিপথগামী হয়। তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কম নেই। সম্প্রতি এ-দেশেও তো দেখা গেল। শাস্ত্রে আছে—মহাপুরুষেরা নির্বংশ হন। কিন্তু সে তো পরের কথা, আর আগেই যে ডালপালা গজায় তা কেউ ছেঁটে ফেলতে পারে না। এ বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন গান্ধীজী। কোনো পুত্রের বাহাদুরি বা কোনো আত্মীয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সমালোচনা, স্ত্রীর অনুনয়—কিছুই তাঁর ঈপ্সিত পথ থেকে তাঁকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি কবি ছিলেন না। ভালোবাসার যে দ্রব করবার ক্ষমতা, সম্ভবত তার অত্যাচারে তিনি পীড়িত হননি।

আমি পূর্বেই লিখেছি, চীনেরা জাতশিল্পী। আমরা শুনলাম, অনেক বড় বড় শিল্পীও নির্যাতিত হয়েছেন। হানসুয়ান লিখেছেন, 'আজও, কি করে যে রেভলিউশনারি ফুল বা প্রগ্রেসিভ পাখি আঁকতে হয় তা তাঁরা জানেন না।' লেখিকা হানৎসে আমাকে বললেন, কালচারাল রেভলিউশনের আগে তোলা অর্থাৎ চিয়াং চিং নিজের ক্ষমতা যেসব ফিল্মে জাহির করতে পারেনি, তার অনেকগুলোই বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য 'দি ইস্ট ইজ রেড', 'হোয়াইট হেয়ারড গার্ল', 'রেড গার্ডস অফ লেক হুংহু'—এ সমস্ত বন্ধ করেছিল। ঐ ছবিটি আমরা দেখলাম। ওখানে বিপ্লব ও যুদ্ধ ইত্যাদি সবই তো ছিল। কেন যে সেটা বন্ধ হয়েছিল, বোঝা গেল না। এ ছাড়া চৌ এন লাই-এর অন্ত্যেষ্টির ডকুমেণ্টারী দেখানোও তারা বন্ধ করেছিল। এসব শুনে মনে হল, চিয়াং চিং ও তার দল নিজেদের সর্বক্ষেত্রে সর্বময় করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। প্রিমিয়ার সর্বজনমান্য চৌ এন লাই ক্যানসার রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের আরো সুবিধা হয়েছিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডান্ডাবাজি সবচেয়ে মারাত্মক। চীনা সাহিত্য অনুবাদেও কিছু না পড়া থাকায় সে সম্বন্ধে মতামত দিতে যাওয়া অনুচিত হবে। কিন্তু সর্বত্রই দেখেছি, বিপ্লবের আগের রচনাগুলি অনবদ্য হয়। তার মধ্যে জোর থাকে, বাণী থাকে, সত্য থাকে এবং তা কালজয়ী বিশ্বসাহিত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরে তা গতানুগতিক একঘেয়ে হয়ে পড়ে—মানুষের মনকে তা আকর্ষণ করে না। রাশিয়া ও তার চারপাশের দেশগুলির সাহিত্য অনুবাদে পড়ে আমার এই ধারণা জন্মেছে। আমার অনুমান, চীন দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটবে। আসল কথা, সাহিত্য মুক্তি চায়। তবে জারের রাজত্বে কি মুক্তি বেশী ছিল ? তা ছিল। অত্যাচারের ফলে কিছু মানুষের মন মুক্ত হয়েছিল ; তাই তো বিপ্লব ঘটল। দুঃখদুর্দশা, সংগ্রাম ও বিদ্রোহ—এগুলিই সাহিত্যের জন্মভূমি। বাইরের বাঁধন তার সয়, অন্তরের বাঁধন সয় না। জেলে বসেও একজন মানুষ মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু বহুসমাদৃত হয়েও যদি কোনো মতের খোঁদল-কাটা পথে সে বন্দী হয়ে যায়, তবে তার দ্বারা বড় বড় প্রজেক্ট হলেও সাহিত্য হবে না। এ অন্য জগৎ—এখানকার আয়োজন ভিন্নতর। এই সঙ্গে এ কথাও বলতে হয় যে, জগৎ জুড়েই নানারকম বন্ধনে আজ সাহিত্যের গতিপথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বচ্ছন্দ নয়। তার বাধা নানারকম। রাজনৈতিক সামাজিক মতামতের বন্ধন যেখানে নেই, সেখানেও বন্ধন আছে। ঠিক কত বড় বই হলে পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে, ঠিক কোন ধরনের লেখা হলে সম্পাদক গ্রহণ করবেন, সাপ্তাহিকের একটি পাতায় চারটি কবিতা ছাপা হয়, কাজেই কবিতাটিকে সেই সীমার মধ্যে রাখতে হবে—এসবই বন্ধন। এই সব বন্ধন সাহিত্যের সফলা ভূমি থেকে শুষে নেয় রস—নিংড়ে ফেলে সুধা। সব দেশেই কোনো-না-কোনোরকমে লেখকের এ দুঃখ আজ আছে। কোন দেশে আজ টলস্টয়, গোর্কি, বার্নার্ড শ বা রবীন্দ্রনাথ আছেন? কোন কবিতা মানুষের মনকে রসবৈচিত্র্যে উল্লসিত, সত্য বাণীতে উদ্বুদ্ধ, সৌন্দর্যের বেদনায় দ্রব করছে? কিছুদিন আগেই আমি একজন ইংরেজ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখন তাঁদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি বললেন, কবি অনেক আছেন। তবে শ্রেষ্ঠ কে, কেউ জানে না। নানা কারণে নানা দেশে সাহিত্য আজ খণ্ডিত। চীনে কি তার ব্যতিক্রম হবে? আপাতত 'চাইনীজ লিটারেচার'এ যে ইংরেজী কবিতাগুলি পড়ছি সেগুলি সবই রাজনীতির কবিতা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কোনো একটা সময়ে এক এক দেশে সাহিত্যের আসরে এক এক দেবতা আসন গাড়েন। পাশ্চাত্য জগতে হয়েছে যৌনতা, এদিকে হয়েছে রাজনীতি। কিন্তু মানুষের মনের সৌন্দর্য কোনো দিনই নিঃশেষ হয় না। প্রমাণস্বরূপ ইংরেজীতে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠি অনুবাদ করে দিচ্ছি। চীন থেকে দেশে ফিরে আমাদের বন্ধুদের জানিয়েছিলাম, এ-দেশের মানুষ চীন সম্বন্ধে জানবার জন্য কত ব্যগ্র এবং কত জায়গায় আমায় বক্তৃতা করতে হয়েছে। উত্তরে ওদের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছিলাম। এখানে তা থেকে কয়েক লাইন তুলে দিচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টা যাদের কাছে রাজনীতির কচকচি শুনতাম তাদের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে সহর্ষ বিস্ময় অনুভব করেছি। এর মধ্যেও একটু রাজনীতি আছে—রসও আছে। মনে হয়, আজকের চীনা সাহিত্য হয়তো এইরকমই।

প্রিয় মিসেস দেবী,

যথাসময়ে আপনার ১৩ জানুয়ারীর চিঠি এসে পৌঁছেছিল। ঠিক যখন আপনাকে এক লাইন লিখব ভাবছিলাম, তখনই আপনার দ্বিতীয় চিঠি ও খবরের কাগজের ক্লিপিং পেলাম। আমরা আপনার ও অন্যান্য বন্ধুদের নিরাপদ পৌঁছসংবাদে কি যে আনন্দিত হয়েছি!

আপনার প্রীতিপূর্ণ চিঠি পেয়েও চীন সম্বন্ধে আপনার নিরপেক্ষ লেখাগুলি পড়ে আমরা অভিভূত হয়েছি। আপনার চিঠি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়েছে যেন আমরা কলকাতায় এয়ার পোর্টে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছি—ভারত-চীন মৈত্রীর প্রশংসাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আপনার চিঠি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়েছে, আমরা যেন কলকাতার স্কুলে বসে আপনার আত্মপ্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ স্বরে ভারত-চীন মৈত্রীর মূল নীতিগুলি উচ্চারিত হতে শুনছি। আপনার চিঠি পড়ে আমরা যেন আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। গভীর রাত্রি পর্যন্ত আপনি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে অক্লান্তভাবে লিখে চলেছেন চীনের মানুষের মনে ভারতীয়দের প্রতি যে প্রগাঢ় মৈত্রীভাবনা তার বর্ণনা। আপনার চিঠি পড়ে আমাদের সেই সুখের দিনগুলি মনে পড়ছে, যখন আপনার সঙ্গে ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আমরা দিনরাত্রি ভ্রমণ করেছি। কত প্রশ্ন উত্তর পেয়েছি, কত অকথিত রয়ে গেল। পাঁচ সপ্তাহ কিছুই না। কিন্তু একবার প্রীতি জন্মালে তা চিরদিনের ইত্যাদি...

এই প্রসঙ্গেই বলি, সাংহাই থেকে যেদিন ফেরবার কথা সেদিন বাদলা বলে রওনা হওয়া গেল না। ভাগ্যিস গেল না, কারণ সেদিন রাত্রে আমরা চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর অন্তিম শয়ন ও তাঁর অন্ত্যেষ্টির সিনেমা-ছবি দেখলাম। ছবিটি সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের হোটেলে এনে দেখানো হল। অন্যরাও সেই প্রথম দেখলেন। সে ছবির করুণ সৌন্দর্য বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই। চৌ অনুবাদ করছিল; কিন্তু তার কোনো দরকার ছিল না। ছবি নিজের কথা নিজেই বলছিল। মাও-সে-তুং অন্তিমশয়নে একটি কাচের আধারে শুয়েছিলেন ফুলের মধ্যে। 'গ্রেট হল অফ দি পিপল'এ। মাঝে মাঝে সেই ঘরের ও বাহিরের দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল। দেশ-বিদেশের মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে আসছিল। দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে সহস্র সহস্র লোক উঠছে—মাথা নত, শোকভারাক্রান্ত। ওদিকে দেখানো হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—চীন রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে শহরে গ্রামে গঞ্জে কারখানায় কমিউনে শিশু বৃদ্ধ যুবক তরুণ তরুণী যে যেখানে খবরটা শুনেছে তাদের শোকাশ্রু ঝরে পড়ছে। দেখাল—নদীতে জাহাজে নৌকোয় বনে জঙ্গলে খনিতে যেখানে যে মানুষ যে কর্মে রত আছে, খবরটা শুনে তাদের ব্যাকুলতা কি। কিন্তু তারা কেউ দৌড়াদৌড়ি করছে না, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করছে। এই ছবিতে আমরা চীনের উপজাতিদের ছবি দেখলাম। বিচিত্র পোশাকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাদের ক্রন্দন। এমন কান্নার দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। চৌ-এর গলা ধরে যাচ্ছিল। সকলেই রুমাল বার করছিল। তারপর দেখাল—শেষ শ্রদ্ধা জানবার জন্য সেই থিয়েনানমেন স্কোয়ারে জমায়েত। কি অদ্ভুত শৃঙ্খলার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্র হয়েছে। কোথাও শুধু অলিভ রঙের পোশাক—তারা সৈন্য। কোথাও শুধু সাদা—তারা ডাক্তার। কোথাও লালে লাল। কত পতাকা, কত ফুল আর রঙ্গীন ছবিতে রং যেন ঝলমল করছে। শুধু সকলের হাতে কালো ব্যাজ বাঁধা। কি করুণ শোকবাদ্য বাজছে! সব নিয়ে এমন অভিভূত করবার শক্তি ইতিপূর্বে আমি কোনো ছবিতে দেখিনি। প্রায় ঘন্টা দুই আমরা এক অতি উজ্জ্বল আলোকিত অথচ শোকসাগরে ভাসমান হয়ে রইলাম। আশ্চর্য করুণ রস উদ্রেক করেছিল সেই ছবিটি। অসাধারণ শিল্প, তাতে সন্দেহ নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে বৎসলা আমায় বললে, 'তোমারও কাঁদতে হল?'

আমি বললুম, 'কেন নয়? মাও-সে-তুং কি আমার কেউ নয়?' এ কথাটার অর্থ ওকে বোঝাতে হলে যে কবিতাটা অনুবাদ করতে হত তা করবার ইচ্ছা তখন আমার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য লাইনটি তখন আমার মনে যাওয়া-আসা করছিল—'যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞ যাগ/আমি তার লভিয়াছি ভাগ/যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে/স্থান মোর সেই ইতিহাসে।'

সাংহাই হোটেলের জানলার পরদা সরিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে আমার মন সে রাত্রে ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। আমি আবার তুলনা করছি। জানি, আমার দেশপ্রেমিক পাঠকরা ক্ষুণ্ন হন। তবু তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যেষ্টি কিভাবে হয়েছিল? আমার সৌভাগ্য, আমি সে দৃশ্য দেখিনি। কিন্তু যে বিশৃঙ্খলার বর্ণনা শুনেছি তাতে কি ধিক্কার জাগে না? রবীন্দ্রনাথ কি আমাদের কম প্রিয় ছিলেন? পুত্রের মাথা ধরল—সে আর মুখাগ্নিও করতে পারল না! দেশসুদ্ধ লোক উন্মাদের মত ব্যবহার করল। কিন্তু কোনো সুব্যবস্থা হল না। যাতে দেশের মানুষ চোখ ভরে শেষ দেখা দেখে নিতে পারে। এমন কি, একটা ভালো ছবিও তোলা হল না। কি দুঃখজনক পরিস্থিতি! কি পরিতাপের বিষয়! গান্ধীজীর শেষযাত্রাই বা কি? যিনি সারা জীবন অহিংসার কথা বলে গেলেন, তাঁকে সাঁজোয়া গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হল! নেহরু চিরকাল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলে গেলেন। তাঁর চিতার উপর ঐ বামুনের দল ঘি ঢেলে কোন স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করছিলেন? সর্বত্র ভিড় ঠেলাঠেলি, সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। একজন অন্যজনকে ঠেলে এগিয়ে গেলেই যেন পরম লাভ হবে। রবীন্দ্রনাথের দেহবাহী খাটটা নাকি ভেঙেই গেল। কি শোচনীয় কথা!

আর এ কি অপূর্ব দৃশ্যই চীন দেখাল! কাস্তে-হাতুড়ির নিশান দিয়ে ঢাকা মাও-সে-তুং-এর দেহ ফুলের প্রাচীরের মধ্যে শয়ান, আর সসম্মান দূরত্বে থেকে ধীর স্থির চলমান জনতা বেদনার রঙ্গে রঙ্গীন অশ্রু বর্ষণ করছে। আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের দেখা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনের জনসমাগমের দৃশ্য। কতগুলি রঙ্গীন দাবার ছকের মত যে যার নিজ নিজ স্থানে একেবারে জ্যামিতিক রেখায় সংবদ্ধ; রঙ্গীন পতাকাগুলি আন্দোলিত। এরা মৃত্যুকালেও শিল্পী। একটা সমাজের উন্নতির জন্য শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা সেদিন ভালো করে বুঝেছিলাম। শৃঙ্খলা ও মানবিকতা পরস্পরবিরোধী নয়।

সাংহাই থেকে আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে 'সিশোয়াংপান্না' (?)—উচ্চারণ এইরকমই মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। স্থানটা খুব দূরে—বর্মা ও লাওসের সীমান্তে। ওরা বলেছিল, ওটা বিশেষ দ্রষ্টব্য। কারণ, 'মাইনরিটি এরিয়া'। পরে অবশ্য পথে আরো দু-একটি 'মাইনরিটি এরিয়া' দূর থেকে দেখেছি।

'মাইনরিটি' কথাটা শুনেই বিশ্বম্ভরনাথ বললেন, 'ঐ দেখুন, ওদেরও হিন্দু-মুসলমান আছে। ধর্মের ভেদ না থেকে পারে!' একটা পরিচিত ব্যাপার এই সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে যেন তাঁকে কতকটা আশ্বস্ত করল। কিন্তু আমরা পূর্বেই শুনেছিলাম, মাইনরিটি অর্থ এখানে উপজাতি। হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াটা আমাদের উপমহাদেশে এমনই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, কোথাও হিন্দু-মুসলমান বাস করবে অথচ মারপিট হবে না—এ ভাবা যায় না।

আমাদের গন্তব্যস্থল অনেক দূরে। প্রথমে আমরা কুনমিন বলে একটা জায়গায় গেলাম। এটাও দক্ষিণে। পিকিং-এ শুনেছিলাম, যত দক্ষিণে যাব তত গরম হবে। তা গরমের চিহ্ন নেই, শীতে কনকনিয়ে দিচ্ছে সর্বক্ষণ। এই শহরের জনসংখ্যা আট লক্ষ। আগে কুনমিন থেকে বার্মা হয়ে ভারত পর্যন্ত সড়ক ছিল। যাতায়াত চলত। আর হ্যানয় পর্যন্ত রেল চলে এখনও। কুনমিন থেকে রেলে পিকিং পৌঁছতে দুদিন তিন রাত্রি লাগে। তিন হাজার কিলোমিটার যেতে হয়। এ বিষয়ে চীন আমাদেরই মত। ইউরোপের দেশগুলো এত ছোট যে, কয়েক ঘণ্টা চড়লেই অন্য দেশের সীমান্তে পৌঁছে যায়।

২৫ তারিখ কুনমিন থেকে একটি ছোট স্লেনে আমরা সিমোভ বলে একটা স্থানে নামলাম। সেখান থেকে চৌষট্টি কিলোমিটার দূরে সিশোয়াংপান্না। সিমোভে নেমে এয়ারপোর্টে বসে আছি—গাড়ির ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলাম। এখানে অনেক গাড়ি যোগাড় হয়নি। একটি বাস কয়েকটি গাড়ি। শরীর অত্যন্ত খারাপ লাগছে। গরমও এখানে।

যা হোক, চুপচাপ চায়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছি, মং একটি লোককে নিয়ে ঢুকলেন। —আপনাদের অনেকেরই বয়স হয়েছে, স্লেন প্রেসারাইজড্ ছিল না, ব্লাড প্রেসার নেওয়া দরকার।—সকলের ব্লাড প্রেসার দেখা হল। দীনেশ ও তারাচাঁদ গুপ্ত ঘণ্টাভরে প্রত্যাখ্যান করল।—কারণ, তাদের শরীর নাকি খুবই ভালো। শুধু বিশ্বম্ভরনাথের ১৭০, আর আমার একেবারে ২০০। এতক্ষণ যা না শরীর খারাপ লাগছিল—দু' শো প্রেসার শোনবার পর শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল, মাথায় যন্ত্রণা হতে লাগল। এর পর সাড়ে ছয় ঘণ্টা গাড়ির চড়াইপথ কি করে যাব তা ভাবছিলাম। পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে ভয় ছিল—আমাকেই বাসে চড়তে হবে। তা হলেই আমাদের পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় 'চিত্তির'। কিন্তু তা হল না। মং ঘোষণা করলেন, গাড়ি কম আছে, যারা অসুস্থ তারা গাড়িতে যাবে। শুনে বাঁচলুম। এডলফিন খেয়ে নিয়ে বিপদতারিণী দুর্গাকে স্মরণ করে রওনা দেওয়া গেল।

পাহাড়ে রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠছে। দুপাশের গাছপালা যেন চিরপরিচিত। মংপু-কালিমপং-এর রাস্তা ও গাছগাছালির কথা মনে পড়িয়ে গাড়ি পাক দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগল। একটা পাতাবাহারের মত সবুজ ও লাল পাতা মেশানো ঝাড়। একেবারেই সিনকোনার মত, কতকগুলি গাছ টুন তেলের, কতকগুলি রবার প্ল্যানটেশন মনে হল। কিন্তু সিনকোনা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। পরে শুনলাম, আমার অনুমান ঠিকই। ঐ স্থানে ম্যালেরিয়ার উৎপাত ছিল এবং সিনকোনা চাষ হতো। সম্ভবত বর্মা থেকে এসেছিল। বর্মা ও যবদ্বীপে সিনকোনা ও রবার চাষ হয়ে থাকে।

সাড়ে ছয় ঘণ্টা গাড়ি চড়ে শ্রান্ত ক্লান্ত আমরা 'থাই' উপজাতির দেশে এসে পৌঁছলাম। চমৎকার একটি বাগানে অনেকগুলি ছোট ছোট বাড়ি—ফুলে ফুলে সজ্জিত। ফুলগুলি সবই আমাদের একান্ত পরিচিত—বেগুনিয়া বেগুনিয়া, ফুসিয়া জিরেনিয়াম, জ্যাকারান্ডা ইত্যাদি। একটি জ্যাকারান্ডার এভিনিউ নীল হয়ে আছে। এখানে বাংলো বাড়ির খোলা বারান্দায় বসবার জায়গা। তত ঠান্ডা নেই, তবু শীত শীত করছে। কাটা পেঁপে ও সিঙ্গাপুরী কলা চেখে সকলেরই ভালো লাগলো। মং ঘোষণা করলেন, 'আপনাদের, মনে রাখতে হবে—এটা একটা গ্রাম বা মফস্বল। এখানে নূতন কল ও স্যানিটারি হয়েছে, সেটা নিখুঁত নয়। আপনাদের কষ্ট হবে।' কথাটা বিনয় নয়।

একটি ফুটফুটে থাই কন্যা এক বালতি ঠান্ডা ও এক বালতি ফুটন্ত জল এবং গামলা আমার ঘরেই দিয়ে গেল মুখ হাত ধোবার জন্য। আমি শুয়ে পড়লাম। সেদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ব্যাঙ্কোয়েটে যাবার কথা চিন্তা করতে পারলাম না। সুখাদ্যর সঙ্গে দুষ্ট চতুষ্টয়ের নিন্দা শোনার প্রলোভন ত্যাগ করলাম। ডঃ বসু বললেন, 'আপনার জন্য "চিকেন সুপ" পাঠিয়ে দিচ্ছি।' আর মং কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি এখানে থাকবে। এই থাইদের রাজ্যে তোমাকে রেখে সবাই চলে যাবে।' আমি বললাম, 'বেশ, তুমিও থাক।'

'থাকতে পারি, কিন্তু সু তো থাকবে না। কাজেই, আমার সঙ্গেও কথাবার্তা বন্ধ।'

মং চলে গেলে আমি ভাবছি, সত্যিই যদি এমন হয়—এই দেশে আমি একলা পড়ে থাকি, তা হলে কি রবিনসন ক্রুশোর মত অবস্থা হয়? সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দেশে অপরিচিত লোকদের মধ্যে কেউ যদি আবদ্ধ হয়ে যায় তা হলে সে কি করে? সে কি বাঁচতে পারে? বাঁচলেও কি আনন্দ থাকে? সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পেলাম। ব্যাঙ্কোয়েট সেরে লী ঘরে ঢুকল। পিছন পিছন সেই ডাক্তার। ঘরে ঢুকেই লী প্রীতিপ্রসন্ন তবু ঈষৎ বিমর্ষ হাস্য করে বললে, 'মিসেস দেবী, আই মিসড্ ইউ দিস হোল ইভিনিং। তোমার জন্য আমার সারা সন্ধ্যা মন কেমন করেছে।'

ডাক্তার এগিয়ে ব্লাডপ্রেসার যন্ত্র নামাল। লী-র কথায় আমার মনের ভিতরটার অসুখের অন্ধকার আকাশ অরুণোদয়ের মত সুখে ভরে গেল। এই চীনের মানুষ? এঁদের উপর আমাদের এত রাগ, আর ওঁদেরও আমাদের প্রতি সন্দেহ? মানুষে মানুষে প্রীতিবন্ধন কত সহজ, কত অনায়াসে স্নেহ জন্মায়। কিন্তু যেই মানুষ দল বাঁধে, 'নেশন' হয়, তখন আর ঝগড়া মিটতেই চায় না! আশ্চর্য!

আমরা যে গেস্ট হাউসে আছি ঐখান থেকে একটি নদী দেখা যায়। ঐ নদী 'মেকং' নদীর উৎস। আশ্চর্য এই যে বাগানে দাঁড়িয়ে "চঞ্চল বন্ধুর গতি" নদীটির দিকে তাকিয়ে আমার কেন যেন প্রথমেই মনে হয়েছিল, এই কি মেকং? পরে শুনলাম আমার অনুমান ঠিক। অর্থাৎ এখানে অন্য নাম কিন্তু এই নদীই থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশে গিয়ে মেকং হয়েছে, যা নাকি 'মা গঙ্গার' অপভ্রংশ। আবার অনেক আধুনিক উৎসাহী ঐতিহাসিক হয়তো বলবেন, 'মা গঙ্গাই' মেকং-এর অপভ্রংশ। রিসার্চ করে করে পুরাতন জ্ঞানবিদ্যাকে উল্টে দেওয়ার প্রবণতা আজকাল খুব বেশী। যা হোক, চীনের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য বনাঞ্চল থেকে থাই জাতির একটা অংশ থাইল্যান্ডে চলে গিয়েছিল।

সকাল বেলা এই স্থানটার সম্বন্ধে অনেক খবর দেওয়া হল। বারোটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট নিয়ে সিশোয়াংপান্না প্রদেশ। এটি ইউনান প্রদেশের দক্ষিণে। আয়তন—পঁচিশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার। বর্তমান জনসংখ্যা ছয় লক্ষ। নিমন্ত্রণকর্তা বলতে লাগলেন, ইম্পিরিয়ালিজম, ফিউডালিজম ও ক্যাপিটালিজম—এই তিন অপদেবতা এতদিন আমাদের ঘাড়ে চেপে ছিল। আর ছিল ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা ও স্মল পক্স। কোনো ডাক্তার ছিল না, রোগ হলে বুদ্ধ ও অন্যান্য দেবতার মন্দিরে দীপ জ্বালানোই ছিল ভরসা।' কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বৈদ্য ছিল, তার প্রমাণ পরদিনই পেলাম।

স্বাধীনতার সময়ে লোকসংখ্যা ছিল মাত্র দু' লক্ষ। ধীরে ধীরে লোকেরা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হল। পিকিং থেকে মেডিকেল টীম আসে নিয়মিত। তাদের সহায়তায় চিকিৎসার উন্নতি হয়েছে। জনসংখ্যাও বেড়েছে। এখন ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর প্রচার শুরু হয়েছে। নানা কর্ম উপলক্ষে, বিশেষত পথ, বাঁধ, ব্রিজ, বাড়ি ইত্যাদি তৈরির জন্য হান জাতির লোকরাও কিছু এসেছে। প্রতিবেশী বর্মা ও লাওসের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো।

এখানে দুটিই ঋতু—বর্ষা আর গ্রীষ্ম। বর্ষা খুব হয়; সেজন্য কাঠের দোতলায় আমাদের বসবাস। এই বাড়িগুলি কাঠের থামের উপরে ঠিক শিলিগুলি-জলপাইগুড়ির মত। দেশের অর্ধেকটাই অরণ্যভূমি। এখানে আছে নানা জাতের সাপ; পাইথন, বাঘ, ভাল্লুক, চিতা, বাইসন, আর হর্নবিল পাখি, রাইনোসেরাস, ময়ূর, কুমির ইত্যাদি। ফসল ফলে—চীনাবাদাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাল, ভুট্টা, সয়াবীন। এ ছাড়া হয় পুয়েরের চা, টুন্ তেল, সিনকোনা, কপূর, রবার, সুপারি, আনারস, লিচু। আর আছে পাম অয়েল। 'পাম অয়েল' গাছ নামে গাছের বিতানে আমাদের সংবর্ধনা হয়েছিল। সেই আশ্চর্য বৃক্ষ প্রায় নারিকেল বৃক্ষের মত দীর্ঘ আর তার কাণ্ড নূতন তালের মত খাঁজ কাটা, পাতাগুলি হিমালয়ের ট্রী ফার্নের মত ছত্রাকার। মনে হয় ঐ রকমই আদিম যুগের গাছ। এর ফল থেকে তেল তৈরী হয়।

এখানে দশ রকম উপজাতি বাস করে। থাইরা প্রধান, তারাই এক-তৃতীয়াংশ। অন্যদের মধ্যে হুইরা মুসলমান। আরো কিছু উপজাতি আছে, যারা এখনও এই ব্যবস্থার মধ্যে আসেনি। ওরা বললে, যখন ওরা জমিদারদের তাঁবে ছিল, অর্থাৎ ১৯৫৯ পর্যন্ত, তখন সব জমিই ছিল তাদের, চাষীরা শুধু কাজ করত। দেশের মাটি নদনদী অরণ্য—সবই ছিল জমিদারদের। তাদের প্রাণও ছিল জমিদারের। তারা ছিল একেবারে দাস। প্রভু যা বলত, তাই করতে হত—চাষ বা যুদ্ধ। বয়স হয়ে গেলে চাষ করতে পারত না, জমিও নেই। তখন একটিই উপায় ছিল—ভিক্ষা।

দেখলাম, থাই বক্তা ক্রিশ্চান মিশনারীদের খুবই বিরুদ্ধে। তারা নাকি বহু মূল্যের হাসপাতাল খুলে কুষ্ঠরোগীদের উপর পরীক্ষা চালাত। আর কুয়োমিনটাংদের রাজত্বে ছিল খালি শোষণ। বাচ্চা জন্মালে ট্যাক্স দিতে হবে, ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ হলে ট্যাক্স দিতে হবে। বাড়ি বানাতে ট্যাক্স, তামাক লাগাতে ট্যাক্স, শস্য তুলতে ট্যাক্স। তাই আমরা বলতুম, মোষের গায়ে যত লোম তত ট্যাক্স।

এখানে এদের ধর্ম ছিল হীনযান। এখনও বুদ্ধেরা নানা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। ধর্মবিশ্বাসের উপর কোনো জবরদস্তি নেই—যে যার ইচ্ছামত চলতে পারে।

দেখলাম, থাই ভদ্রলোক নিজেদের ইতিহাস, সমস্যা ও উন্নতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিতে খুবই উৎসাহী। কি করে মাও-সে-তুং-এর প্রভাব পড়ল, তাও বলতে লাগলেন। কি করে তিনি সমস্ত উপজাতিদের বন্ধুত্ব অর্জন করেছেন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কেন্দ্রের সঙ্গেই বা সম্পর্ক কি, পাতার পর পাতা নোট লিখিয়ে চলেছেন। আমি আর পারি না—পেনসিল আড় করে রেখে সামনের মহিলাকে দেখছি। চুল উলটিয়ে খোঁপা বাঁধা, খোঁপায় একটি চিরুনি গোঁজা, লম্বা হাতা ভেলভেটের জামা, পা পর্যন্ত রঙিন সিল্কের লুঙি। একেবারে বর্মী পোশাক। কোমরে রুপার বন্ধনী, কানে সোনার ফুল। স্বকীয় পোশাকে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তখনও জানি না তিনি একটি ডোমকন্যা।

দুপুরে একটি গ্রামে নিমন্ত্রণ। সেই গ্রামটার নাম মানচিলাং। এ গ্রামে যারা বাস করত তারা বড়লোকদের কবরের তত্ত্বাবধান করত। অর্থাৎ, ডোমদের গ্রাম। এই গ্রামে আমরা ভাগ হয়ে তিন-চারজন করে এক-এক বাড়িতে গেলাম। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাওয়া হল। নীচটা খালি, সেটা পশুদের থাকার জায়গা। বিশেষ করে শুকরের। উপরে কাঠের মেঝেতে নীচু টেবিলে মোটা মোটা আখ, টুকরো করা পেঁপে, মিছরি, কলা, চিনেবাদাম দিয়ে জলযোগের ব্যবস্থা। গৃহকর্তা বলতে লাগলেন, আগে গ্রামে সাতষট্টিটা পরিবার ছিল, তিনশো জনসংখ্যা। সাতটি পরিবার ছিল একটু বর্ধিষ্ণু আর সবাই দারুণ দরিদ্র। চাষবাসের অবস্থা ছিল শোচনীয়। আমরা ছিলাম 'ডেভিল এন্ড দি ডিপ সী'র মধ্যে. অর্ধেক দিন উপবাস ছিল। শস্য সামান্য জন্মাত। প্রতি বছরই ক্ষুধায় মৃত্যু ঘটত কয়েকজনের। প্রতি পাঁচদিন অন্তর হাট হত। সেই হাটে 'পান' বিক্রি করে নুন কিনত এরা। বারটি পরিবার ট্যাক্স দিতে না পারার জন্য বিতাড়িত হয়েছিল। সর্দাররা বললে, ওরা ভূত। ওরা জঙ্গলে বসবাস করছিল পশুর মতন। এখন আমরা ওদের ফিরিয়ে এনেছি। এখন ওরা চাষবাস করে, গরু-মহিষ পুষে আনন্দে আছে।

সিশোয়াংপান্নার অতীত ইতিহাস দারিদ্র্যের ও শোষণের ইতিহাস। নূতন জীবনে প্রবেশ তাই ধীরে ধীরে হচ্ছে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা সে কাহিনীর দীর্ঘ বিস্তার নাই-বা করলাম।

আমরা যে গৃহে আতিথ্য নিয়েছিলাম সেখানকার মধ্যাহ্নভোজনের কথা বলা দরকার। একতলায় দূরে রান্নাঘর। উপরে দোতলায় মাটিতে কুশনে বসে নীচু টেবিলে খাওয়া। ছোট ছোট চীনা মাটির বাসনে নানারকম মাছ মাংস। আমার কাছে সবই ছ্যাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোড়া মনে হল। চীনে রান্নার সুসংস্কৃত কৌশলের সঙ্গে কোনো মিল বিশেষ নেই। রান্নাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক্‌দর্শন। আমার কাছে আরো একটা জিনিস আছে—সেটা শৌচাগার ও স্নানের ঘর। এখানে আর সেটা পরীক্ষা করার সাহস হল না। অবশ্য আমাদের বহু হাজার বছরের সভ্যতার চিহ্ন আমাদের ঐ দুটি স্থানে কমই পাওয়া যায়।

এখানে একটি অদৃষ্টপূর্ব খাদ্য খেলাম এবং কেবল সেটাই ভালো লাগল। একটা বাঁশ চিরে তার মধ্যে চাল পুরে সেটা উনুনে পোড়ানো। বাঁশের রসে ঐ চাল, যেটাকে ওরা বলে 'স্যুটনাম রাইস' অর্থাৎ আঠা আঠা আতপ, সিদ্ধ হয়েছে। বাঁশটা চেরা—সেখান থেকে চিরে চিরে ভাত বের করে ওরা লম্বা লম্বা দলা করে ফেলে, তারপর শুকনো মাছ দিয়ে খায়।

আহারাদির পর সামান্য বিশ্রাম। সেই পরিচ্ছন্ন সুন্দর ঝকঝকে লেপের বিছানায় ডোমের বাড়িতে শুয়ে ও ডোমনীর সেবাশুশ্রূষা পেয়ে বুঝতেই পারছিলাম এদের জীবনমানের উন্নতির কথা। ভদ্রমহিলার কোমরে একটা রুপার বন্ধনী। সেটার প্রশংসা করতেই খুলে আমাকে দিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। আমি অনেক কৌশলে তাঁকে নিরস্ত করলাম। দেখিয়ে দিলাম আমি তাঁর মত ক্ষীণমধ্যা নই—ওটা আমার কোনো কাজে লাগবে না!

চীনে ভাষা-সমস্যা প্রায় ভারতের মতই। একট স্কুল দেখতে গেলাম। থাই ভাষা, চীনা ভাষা—দুইই শিখছে। অক্ষরগুলো দেখলাম গোল গোল তামিলের মত। ওরা বললে বর্মার লেখার মত। বর্মার সঙ্গে অনেক মিল—পোশাকে তো বটেই। তবে গয়নার ডিজাইনে নেপালী ভাব। দেশগুলো কাছাকাছি এলে অনেক কিছু একাকার হয়ে যায়। ইস্কুলের বাগানে এক পরমাত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাদের হলুদবর্ণ গাঁদা ফুল। এখানে নিয়ম—বিয়ে হলে ছেলে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। মাইনরিটি অর্থাৎ উপজাতিরা তাদের নিজের প্রথা, সংস্কার, সজ্জা ইত্যাদি বজায় রেখেছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার কাঠামো বদলেছে। এই দারিদ্র্যপীড়িত লোকদের প্রাণে এতই আরাম হয়েছে যে, কেউই বিরুদ্ধ কথা ভাবতে পারে না। তিব্বতের ব্যাপারও এই। যদি ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক জ্বলে, দোকানে সাজানো থাকে খাদ্য, যদি পুরানো বিদ্যায় নূতন করে পেট ভরে, তবে চাকা ঘুরিয়ে মণিপদ্মে হুঁ করে বেড়ানোর জন্য কেউ ব্যাকুল হয় না।

সিশোয়াংপান্নাতে অনেকরকম দ্রষ্টব্য দেখেছিলাম। তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল বিভিন্ন উপজাতিদের ব্যালে। ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে বিচিত্র নৃত্য ছিল মনোহারী। পোশাক, বর্ণাঢ্য ভঙ্গিমা, হাস্যে-লাস্যে অপরূপ। সব উপজাতিরাই শস্য উত্তোলন নৃত্য করে। রবীন্দ্রনাথও এর প্রচলন করেছিলেন—'আয় রে মোরা ফসল কাটি—'। এদের 'হারভেস্ট' নৃত্যের সময় পিছনে আলোতে রঙিন লেখা ভেসে উঠল—'সর্বত্র শস্য সঞ্চয় কর। পরের কাছে হাত পেত না।' আর একটি নৃত্য 'গ্রামে বেয়ারফুট ডাক্তার এসেছে'। এই নৃত্য-উল্লাসের সময় পিছনের ক্যানভাসে ভেসে উঠল—'জনসাধারণের সেবা কর।'

এই সিশোয়াংপান্নাতেই আমার সেই আশ্চর্য থাই বৈদ্যর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। খাওয়াদাওয়ার পরে সবাই চললো ক্লিনিক দেখতে। যেখানে মুরগী বলি দিয়ে চিকিৎসা হত সেখানে 'থ্রি ইন ওয়ান' চিকিৎসা চলছে। চৈনিক আয়ুর্বেদ, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও আকুপাংচার, বস্তুত এখানে 'ফোর ইন ওয়ান' হচ্ছিল, এর সঙ্গে পুরানো থাই বিদ্যাও মেশান হয়েছে। শরীর খারাপ বলে যাব কি যাব না এই দ্বিধায় ছিলাম, না গেলে জীবনের একটা দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম। পলিক্লিনিকের প্রথম ঘরে ডাক্তার একটি শিশুকে ইনজেকসন দিচ্ছিলেন এবং সে জগতের অন্যান্য শিশুর মতই তারস্বরে তার প্রতিবাদ করছিল। আর একটি ঘরে আকুপাংচারের সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে এবং তৃতীয় ঘরে রয়েছে চীনা আয়ুর্বেদীয় ব্যবস্থা। ঐ ঘরগুলি ছোট ছোট, যখন বেরিয়ে আসছি দেখলাম একটি প্রায় শূন্য ঘরে একটি টেবিল টুল ও চেয়ারে এক ব্যক্তি একটি থাই মহিলাকে পরীক্ষা করছেন। শুনলাম ইনি থাই জাতির মধ্যে প্রচলিত পুরানো চিকিৎসা করেন। এই বন্য জাতির ব্যবহৃত ঔষধির গুণাগুণ পরীক্ষা করা হচ্ছে, আমি আশ্চর্য হলাম যে, একটি পুরা-দস্তুর আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্রে এমন প্রাগৈতিহাসিক চিকিৎসা চলতে দেওয়া হচ্ছে। আমাকে দেখে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, রুগীও তখন যাবার মুখে, আমি তার পরিত্যক্ত টুলে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তারকে বললাম, আমায় পরীক্ষা করে বলুন আমি কেমন আছি। আমার নাড়ী দেখুন—ডাক্তার দু' হাত দিয়ে নাড়ী দেখলেন কব্জীতে এবং কনুইয়ের মধ্যে, তারপর থাই ভাষায় যা বললেন তা প্রথমে চীনায় তারপরে ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে আমার কাছে পৌঁছল। ডাক্তার বললেন, তোমার এখন ব্লাডপ্রেসার খুব বেশী, তোমার বাঁ হাত ব্যথা করছে, তোমার পিঠেও ব্যথা, ঘুরে বেড়ালে ব্যথা আরো বাড়বে—আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার ঊর্ধ্বতন বহু পুরুষ কবিরাজ। নিদানের অনেক গল্প শুনেছি আমি। তাঁরা নাড়ী দেখে সঠিক মৃত্যু সময় বলে দিতে পারতেন কয়েক মাস আগেই। সেই আশ্চর্য বিদ্যা কোথায় হারিয়ে গেছে—আমরা কুসংস্কারগুলি আঁকড়ে আছি কিন্তু মণিমুক্তো সব সময়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমি ভাবতে লাগলুম, এই নাড়ীজ্ঞান কি ভারত থেকে এসেছে না এখান থেকে ভারতে গেছে। তুলোর ফল যেমন ফেটে গিয়ে তুলোর পাখায় ভর করে বীজকে দেশ-দেশান্তরে পাঠিয়ে দেয় তেমনি কোন্ অদৃশ্য ডানায় চেপে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফসল অনাদি কাল থেকে চলাচল করছে কে জানে?

আঠাশে ডিসেম্বর সিশোয়াংপান্না থেকে আমরা আবার সিমোভে ফিরলাম। ফেরার পথে সিমোভে একটা 'অরনামেন্টাল' বাঁশঝাড় দেখলাম এখানে ওখানে। সমস্ত বাঁশটা গাঢ় হলুদবর্ণ, এনামেল-করা রঙের মত মাঝে মাঝে সবুজ দাগ। প্রথমটা মনে হয়েছিল বোধ হয় চিত্রিত ; পরে দেখলাম তা নয়—ঐ ওর স্বাভাবিক রূপ।

কুনমিন-এ ফিরে আমরা মহাকবির কবিকাহিনী শুনলাম। নানকিং-এ তাঁর প্রডিউসরের টেলিফোন এসেছিল। সেখান থেকেই তিনি ফেরবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিজয়বাবু দ্বিধাগ্রস্ত, আমি ও বৎসলা উগ্ররকমের বিরূপ। আমাদের মতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে অন্যের এতখানি খরচ করিয়ে মধ্যপথে ফিরে যাওয়া অভদ্রতা। দিনেশ মধ্যপন্থী। তারাচাঁদ গুপ্ত কবির পক্ষে। তিনি বলেন, এ তো যে সে ছবি নয়, রেভোলিউশনারি ছবি। না গেলে চলবে না। যা হোক, আমাদের উৎপাতে বিজয়বাবু তাঁকে কুনমিন পর্যন্ত টেনে এনেছিলেন। কথা ছিল—তিনি হংকং হয়ে ফিরবেন। কুনমিনে ফিরে শুনলাম, মহাকবিকে আবার পিকিং ফিরে যেতে হয়েছে। কারণ, হংকং হয়ে ফেরার তাঁর এনডোরসমেণ্ট নেই। তিনি আগে পাসপোর্ট দেখতে ভুলে গিয়েছিলেন। অতএব খরচ দ্বিগুণ হল। যাই হোক, আমরা মহাকবিকে পথিমধ্যে বিসর্জন দিয়ে মনঃকষ্টে ছিলাম।

কুন্‌মিনে দুটি প্রধান দ্রষ্টব্য উল্লেখযোগ্য। তার একটি 'মাইনরিটি ইনসটিটিউট'। এখানে বিভিন্ন উপজাতির ছেলেমেয়েরা নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে আসে। উপজাতিদের জন্য এরকম পৃথক বিরাট শিক্ষালয় প্রয়োজন। কারণ, যুগ যুগ ধরে তারা 'অশিক্ষিত পটুত্বের' উপরই জীবন চালিয়ে এসেছে ; এই প্রথম তারা বইখাতা হাতে নিয়েছে। এই ইনস্টিটিউটে যাদের সঙ্গে দেখা হল তারাই প্রথম শিক্ষিত প্রজন্ম।

বত্রিশরকম উপজাতি আছে—ই. থাই, পাই, হুই (মুসলমান), তিব্বতী, যাং, মিয়াও, ইয়াস. নু, হানি, লাহু, পুনি (মোঙ্গলিয়া) ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বসমেত আট মিলিয়ন মাইনরিটি। এদের অধিকাংশই পার্বত্য প্রদেশে থাকে এবং শতকরা আশি ভাগ জায়গায় পিপলস্ কমিউন প্রতিষ্ঠিত। এদের প্রত্যেকের 'ডায়লেকট' বা কথ্যভাষা পৃথক ; ধর্ম ও আচার-আচরণ, সমাজব্যবস্থা পৃথক। কারোর কারোর মধ্যে এখনও ক্যাপিটালিস্ট প্রথা আছে. দাস প্রথা আছে, ফিউডালিজম আছে। এগুলো উন্নতির পক্ষে বাধা, ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে। এদের মধ্যে ডেমোক্রেটিক রিফর্ম করা হচ্ছে। ইনডাস্ট্রি হচ্ছে। পাওয়ার স্টেশন ওরা নিজেরাই বানাচ্ছে। যারা আগে গুণতে হলে কাঠের টুকরোয় দাড়ি বেঁধে রাখত, রোগ হলে মুরগি বলি দিত, তারা আজ অনেক দূর বিজ্ঞানের বিদ্যায় এগিয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে এদের যুদ্ধ বাধত। লংকা পাঠিয়ে দিলেই যুদ্ধ শুরু, আর আখ বা চিনি পাঠালেই সন্ধি। বিভিন্ন উপজাতিরা নিজেদের পোশাকে এসেছিলেন। তাঁদের সাজসজ্জা, প্রথা, সংস্কার—সবই বিভিন্ন। ১৯৫১ সালের পর এঁদের বনজীবনে নূতন সভ্যতার ধারা প্রবেশ করেছে। চিকিৎসার উন্নতি ঘটেছে, বিদ্যালয় খোলা হয় মার্কস লেনিন মাও-সে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুং-এর চিন্তাধারায় পঠনপাঠন চলছে। ফলে, জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু ফ্যামিলি প্ল্যানিং এখনও জোরদার নয়। আমি এদের বললাম যে, হান চীনাদের অনুকরণে যেন এরা এদের সুন্দর পোশাক ও গহনা ত্যাগ না করে। তাদের সঙ্গে ছবি তোলা হল।

কুনমিনে আমরা যেসব আশ্চর্য দ্রষ্টব্য দেখলাম তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্টোন ফরেস্ট। কুনমিন থেকে একশো ত্রিশ মাইল দূরে সবুজ শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আমরা চললাম। এই পার্বত্য প্রদেশে 'ই' উপজাতির বাস। আমরা শুনলাম, সাতাশ লক্ষ মিলিয়ন বছর আগে এইখানে সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্রবক্ষ থেকে সুস্নান পর্বতশ্রেণী মাথা তুলেছে। সামুদ্রিক জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। আর দাঁড়িয়ে আছে পাথরের অদ্ভুতদর্শন স্তম্ভগুলি। মাইলের পর মাইল এই আশ্চর্য দৃশ্যের এক উল্টট শোভা আছে। একে বলে স্টোন ফরেস্ট।

কুনমিনে দুদিন থেকে আমরা আবার সেই ছোট প্লেনে চাংসা পৌঁছলাম। এবারে চাংসায় দু-একদিন থাকতে হবে। নিকটেই মাও-সে-তুং-এর জন্মভূমি। সেটা চীনাদের তীর্থে পরিণত হয়েছে।

প্রত্যেক এয়ারপোর্টে, বিদ্যালয়ে, লাইব্রেরীতে, কমিউনের ঘরে—অর্থাৎ, সাধারণের স্থানে—মাও-সে-তুং-এর ছবি, স্ট্যাচু স্থাপিত। কোথাও কোথাও মার্কস-এঙ্গেলসের পাশে। এখন তাঁর পাশে হুয়া কুয়া ফেং-এর চিত্র স্থান পাচ্ছে। সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু দেখলাম ইয়াং সিকিয়াং নদীর ব্রিজের টাওয়ারের ঘরে। প্রায় দোতলার সমান। শুনেছি, মাও-সে-তুং ব্যক্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। মাঝে মাঝে যখনই বিরাট কোনো জমায়েতে তাঁর শত শত ছবি উত্তোলিত হত তখন তিনি বিরক্ত হতেন। একবার এড্‌গার স্নো-র কাছে ক্ষোভও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিপূজা বন্ধ করতে পারেননি। হয়তো তেমন চেষ্টাও করেননি। জগতে যত মহাপুরুষ জন্মেছেন, সবাই ব্যক্তিপূজা নিষেধ করেছেন—কেউ সমর্থ হননি। একমাত্র মহম্মদ বোধ হয় কতকটা সফল হয়েছেন। তাঁর শিষ্যরা তাঁর ছবি রাখে না।

চীনেরা পূর্বপুরুষের পূজা বন্ধ করে থাকলেও এখন নূতন এক পূজার প্রবর্তন করেছে সন্দেহ নেই। যুগ যুগ ধরে চীনের মানুষ সম্রাটের সিংহাসনতলে মাথা নত করতে অভ্যস্ত। বড়র কাছে নীচু হওয়ার অভ্যাস এশিয়ার চরিত্র—ইয়োরোপের নয়। এখন চীনে সকলেই হ্যাণ্ডশেক করে, অন্য কোনো রকম অভিবাদন-রীতি দেখিনি। আমাকে কোনো পাশ্চাত্ত্য দেশের থিয়োলজির অধ্যাপক বলেছিলেন—ধর্মভাবনা, এমন কি পূজার ভাব, মানুষের সত্তার এমন অভিন্ন অঙ্গ যে, তার রূপ পরিবর্তন হতে পারে, উৎপাটন নয়। যুগে যুগে আচার-অনুষ্ঠানের রূপ পরিবর্তন হয় এইমাত্র। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সামনে পুষ্পমাল্য আর মাও-সে-তুং-এর মূর্তির সামনে স্তব গান—ব্যাপারটা একই। তবে সামান্য তফাত আছে। আপাতত শ্রীকৃষ্ণ আমাদের থেকে অনেক দূর, কিন্তু মাও-সে-তুং তা নন। তিনি কাছের মানুষ। মানুষ হিসাবেই তাঁর মূল্য—দেবত্ব আরোপ করলে তাঁর মূল্য কমে। সেজন্যই যখন কোনো গান্ধীভক্ত মন্দিরে গান্ধীর মর্মরমূর্তি তাঁর জীবিতকালেই স্থাপন করেছিল, গান্ধীজী বলেছিলেন, 'ওয়ার্স্ট ক্যারিকেচার অব মাইসেল্ফ।' তা সত্ত্বেও ক্যারিকেচার থামেনি। গান্ধী-টুপি মাথায় দিয়ে গান্ধীভক্তের দল তাঁর মতের সম্পূর্ণ বিপরীত কর্ম করেছে। মানুষ যদি দেবতা হয়ে যায় তখন তার প্রতি মানুষের আর দায়িত্ব থাকে না, তখন সবাই তাঁর দোহাই পাড়ে। যুদ্ধের দু পক্ষই যেমন বলে, 'আল্লা বাঁচাও। শত্রু নিপাত কর।' গ্যাং অফ ফোরও বলেছে, তারা মাও-সে-তুং-এর বাণীর যথার্থ ধারক। তাদের শত্রুরাও তাই বলছে। যুক্তি দিয়ে আমি বুঝি, ব্যক্তিপূজা উচিত নয়। আবার সেই অধ্যাপকের কথাও অস্বীকার করতে পারি না যে, মানুষের মনের মধ্যে একটি সিংহাসন পাতা আছে। যুগে যুগে তাতে মূর্তির বদল হবে, কিন্তু সে আসন শূন্য থাকবে না।

৩০শে ডিসেম্বর চাংসা-তে বিকেল তিনটেয় পৌঁছলাম। হুনান প্রদেশের এই রাজ্যে সাওসান নামে এক গ্রামে মাও-সে-তুং-এর জন্ম। সেইদিনই বিকালে ১০৪ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে আমরা সাওসান গ্রামে পৌঁছলাম। সিয়াং চিয়াং নামে নদীর উপর দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবার সময় সেই তরঙ্গমুখর নদী দেখিয়ে ওরা বলল, মাও-সে-তুং অল্প বয়সে এই নদীতে স্নান করতেন। মাও-সে-তুং খুব ভালো সাঁতারু ছিলেন—বৃদ্ধ বয়সে তার একবার প্রমাণ দিয়েছেন।

আমরা প্রথমে মাও-সে-তুং-এর পিতার বাসগৃহ দেখলাম। পাঁচ-ছয়খানা ঘর, রান্নাঘর, উঠোন ও শূয়োরের খোঁয়াড়। আমাদের যেমন গোরাল থাকে, ওদের তেমনি ঐ পশুটি অবশ্য পালনীয়। বাড়ি দেখে মনে হল, এঁরা দরিদ্র ছিলেন না। মধ্যবিত্ত। রান্নাঘরটি ভেঙে গিয়েছিল, নূতন করা হয়েছে। মাও-সে-তুং একবার এ বাড়ি দেখতে এসেছিলেন। তখন নাকি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সব ঠিকঠাক হয়েছে কি না। তিনি বলেছিলেন, রান্নাঘরটি একটু বেশী মডার্নাইজ করা হয়েছে।

পরের দিন আবার আমরা সাওসান গেলাম ও সারাদিন কাটালাম। ওখানে মাও-সে-তুং-এর স্মৃতি-ভবন তৈরী হচ্ছে। তাঁর অল্প বয়সের সময় থেকে দীর্ঘজীবনের ঘটনাবলী চিত্রে উপস্থাপিত হচ্ছে। এখনও কয়েকটি ঘর মাত্র হয়েছে। এইখানেই তাঁর শবাধার স্থাপিত হবে।

আমরা শুনেছিলাম, মাও-সে-তুং-এর চারবার বিবাহ হয়। প্রথম বিবাহ তাঁর মা-বাবার পছন্দমত অল্প বয়সে হয়েছিল। কত বয়সে জানি না। কারণ, এ বিষয়ে কিছু লেখা আমি পড়িনি। শুনেছি, সেই বিবাহ প্রায় অসমাপ্ত ছিল। সেই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মিলন হয়নি। এসব কথা অবশ্য চীনা বন্ধুরা বলেননি, এবং স্মৃতিভবনেও প্রথম বিবাহের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। দ্বিতীয় পত্নী ইয়াং কাই হুই—যাঁর সঙ্গে নর্মাল স্কুলে পঠনপাঠনের সময় আলাপ হয়েছিল, তাঁর জীবনীই বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছে। মাও-সে-তুং যখন গেরিলা যুদ্ধরত তখন তাঁর এই বীর পত্নীকে কুয়োমিনটাংরা মেরে ফেলে। মাও-সে-তুং-এর প্রসিদ্ধ কবিতা এই স্ত্রীর সম্বন্ধেই, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এর মৃত্যুর পরে তিনি আর একজন মহিলাকে সম্ভবত লং মার্চের সময় বিবাহ করেন। তিনি যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে চিকিৎসার্থ যান ও সেখানেই মারা যান। তারপর বিয়ে করেন চিয়াং চিং-কে। মা-সে-তুং-এর দু'জন পত্নী অন্তত রাজনীতি-সচেতন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তাতে সন্দেহ নেই। আমার আশ্চর্য লাগল যে, একজন এত বড় মানুষের জীবন সম্বন্ধে যদি কিছু লিখতে, বলতে বা জানতে হয়, তাতে সংশোধনের প্রয়োজন কি? প্রথম পত্নীর উল্লেখ করলে দোষ কি হত? এবং যতদূর জানি, চিয়াং চিং-এর কোনো উল্লেখ ওখানে থাকবে না। আমার এটা ভালো মনে হল না। কারণ, মাও-সে-তুং যা ছিলেন তার চেয়ে তাঁকে ভালো করবার দায়িত্ব কারু নেই। এদিকে অবশ্য আমাদের দেশের জীবনীকারদেরও একই ঝোঁক। আমরা রক্তমাংসের মানুষকে দেবতা বানাতে চাই। তাতে মানুষের ক্ষতি হয়। সত্য খণ্ডিত হয়। সত্যই ধ্রুব তারকা, একটা কল্পিত আদর্শ রঙ্গীন ফানুস।

ডিসেম্বরের শেষ দিনটা সাওসানে কাটল। প্রচণ্ড শীত। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় তোমাদের গরম? দক্ষিণ আর উত্তর প্রায় একইরকম। হাড়কাঁপানো শীত চাংসায়। আমরা বললাম, এর পরের গন্তব্যস্থল কুপলীনে কি গরম হবে? লী বললে, 'আর আমি কথাটি কব না! ওরেদার বিশ্বাসঘাতকতা করছে।'

মাও-সে-তুং-এর স্মৃতিমন্দির সারা দেশময় ছড়ানো। সাংহাই-তে দেখেছিলাম ফ্রেঞ্চ কনসেসনের মধ্যে কোথায় তাঁদের গোপন বৈঠক হত। সেই বাড়ি, সেই টেবিল চেয়ার সাজানো আছে। তাঁদের মধ্যেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দেবার উপক্রম করলে ফরাসী সৈন্য আসবার পূর্বেই একটি নৌকাতে করে তাঁরা পালিয়ে যান ও স্থায়ী কোথাও সভার স্থান না রেখে ভাসমান নৌকায় নূতন নূতন জায়গায় তাঁদের গুপ্ত পরামর্শ করেন। ১৯২১ সালে যে কর্মের সূচনা হয়, ১৯৪৯ সালে তার সফলতা ঘটে—পিপলস রিপাব্লিক অফ চায়না প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস সমস্তই বিধৃত আছে, এবং থাকবে। থাকবে না মাও-সে-তুং-এর প্রথমা পত্নীর বেদনা, যিনি দিগ্‌বিজয়ী স্বামীকে হারিয়েও হয়তো তাঁর শ্রদ্ধা বজায় রেখেছিলেন; কিংবা অধুনা নিন্দিত চিয়াং চিং-এর কোনো বিশেষ আকর্ষণের কথা—কি গুণে তিনি এত বড় মানুষকে প্রভাবিত করেছিলেন। হয়তো এসব জানার কোনো প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই অন্য কারু, কিন্তু সাহিত্যিকদের আছে। এইসব প্রশ্নের সঙ্গে সাহিত্যের নাড়ী-চলাচলের যোগ আছে। যদি সে যোগ ছিন্ন করা যায় এবং কেবলই অনুমোদিত বিষয়ে লেখার ঝোঁক যায় তা হলে কাব্যের প্রাণরস শুকিয়ে যায়। তা মরে যায়।

১লা জানুয়ারী আমরা নর্মাল স্কুল দেখতে গেলাম। সেদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আমরা ভিজে ভিজেই ঘুরতে লাগলাম। এ স্কুলের একেবারে বিলিতী ধাঁচের বাড়ি, ইংরেজদের করা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাও-সে-তুং-এর মিলগুলো মনে এল ; অমিল এত যে, তার ফিরিস্তি খুব বড় হবে। দুজনেই কবি, দুজনেই নর্মাল স্কুলে পড়েছিলেন, দুজনেই অতি প্রত্যুষে হিমশীতল জলে স্নান করতেন, দুজনেই ভালো সাঁতার কাটতেন—আর কত মিল চাই ?

এই নর্মাল স্কুল আবাসিক। মাও যে ঘরে ছাত্র হিসাবে থাকতেন সে ঘরে ঢুকে গাইড বললে, এখানে ছাত্রদের সঙ্গে তিনি দিবারাত্র আলোচনা করতেন—রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বলেছিলেন, অর্থসম্পদ, ব্যক্তিগত বিষয় ও প্রণয় ব্যাপারে আলোচনা করবে না।

নর্মাল স্কুলে তিনি সাড়ে পাঁচ বছর পড়াশুনো করেন ও দেড় বছর পড়ান। কাছেই যেসব ফ্যাক্টরী ছিল তার শ্রমিকদের জন্য নাইট স্কুলও চালাতেন। তিনি বলতেন, জনগণের শিক্ষক হতে চাইলে আগে তাদের শিষ্য হতে হবে। ১৯২০ থেকে ২২ সাল পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন তলে তলে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করতেন।

এই স্কুলে তিনি অধ্যাপকের কন্যার সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁরা পরস্পর কর্মের সহযোগী হন। পরে তিনি তাঁকে বিবাহ করেন। ইনিই মাও-সে-তুং-এর দ্বিতীয় স্ত্রী এবং আজকের চীনে ইনিই সর্বাধিক স্বীকৃত শ্রীমতী ইয়াং কাই হুই। আমি লীকে বললাম, 'বেশ তো কথা ! মাও-সে-তুং "লাভ অ্যাফেয়ার্স" আলোচনা করতে বারণ করে নিজে তো বেশ প্রেমে পড়লেন !'

লী বললে, 'তিনি প্রেমে পড়বেন না—এ রকম তো বলিনি !'

মাও-সে-তুং একজন পূর্ণ মানুষ—যেমন মনে সম্পূর্ণ তেমনি শরীরে বলীয়ান। একটা কুয়ো দেখিয়ে ওরা বললে, কলেজে থাকা কালে অতি প্রত্যুষে এই কুয়ো থেকে জল তুলে সেই হিমজলে তিনি স্নান করতেন। রৌদ্র হলে প্রচণ্ড গরমে রৌদ্র স্নান, ঝড়ো বাতাস দিলে বাতাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বায়ু স্নান, তারপরে দৌড়, পর্বতারোহণ, বরফ-গলা জলে সাঁতার। বর্ণনা শুনে বুঝলাম, তিনি তাঁর শরীরটাকে পিটিয়ে একেবারে মজবুত করে নিয়েছিলেন আসন্ন সংগ্রামের জন্য। সেজন্যই অবিশ্বাস্য লং মার্চ সম্ভব হয়েছিল। সুস্থ শরীরের ও সুস্থ মনের আদর্শ এই মানুষটির কথা যতই শুনছি ততই আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। সেজন্যই তাঁর অন্তর্জীবন জানবার জন্য আগ্রহ। তিনি কি অন্তরে আমাদেরই মতন সুখদুঃখকাতর একজন মানুষ ছিলেন ? তরুণী ভার্যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি তাঁকে পীড়িত করেছিল ? আমাদের সঙ্গে পিকিং রেডিওর একজন ভদ্রলোক ঘুরছিলেন। তিনি হিন্দী বলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে বল চিয়াং চিং-এর কি গুণ ছিল ? দোষ তো শুনেছি। কেন এত বড় মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—তাঁদের "মোহব্বত" তো হয়েছিল ! হা-হা করে হাসতে লাগলেন সেই হিন্দীভাষী। ওঁর কথায় কথায় হাস্য। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'মোহব্বত ! ও একটি শয়তানী !' নাও ঠেলা !

গাড়িতে উঠে আমি লী-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবার তোমার কথা বল। তোমরা কি নিজেরা বিয়ে করেছ ?' সে বললে, 'হ্যাঁ। আমরা যখন গ্রামে গিয়েছিলাম তখন তার সঙ্গে দেখা হয়। সে গ্রামেরই মেয়ে তবে আমার বাবা-মার সম্মতি নিয়েছি। তাঁদের না বলে কিছু করা আমি ভাবতেই পারি না। পশ্চিমে ওরা কি করে যে মা-বাবাকে এত কষ্ট দেয় !'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লী, তুমি তো হার্ভার্ড পড়া ছেলের মত—চলনে-বলনে শহুরে। গ্রামে ফিরে তোমার কি রকম লেগেছিল, সত্যি কথা বল।

প্রথমে ভালো লাগেনি। কারণ, চাষীরা বড্ড বকাবকি করত। এবং ওরা যখন রেগে যায় তখন সভ্যভাবে গাল দেয় না। পরে দেখলুম, ওরা ভালোবাসে—খুব ভালোবাসতে পারে। প্রথম আমরা একদল গিয়ে মে সেভেন স্কুলে উঠলাম। চাষীরা আমাদের ক্ষেত দেখিয়ে দিল। দেখিয়ে দিল, গমের চারার মধ্যে থেকে কি করে ঘাস তুলে ফেলতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা ঘাস ও গমের পার্থক্য চিনতে না পেরে গমই তুলে ফেললাম। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ওরা দেখে, শহরের এই বিচিত্র পল্গপাল ক্ষেত ভালোমত মুড়িয়ে দিয়েছে! তখন তাদের রুদ্রমূর্তি দেখে কে!

লী বললে, 'দেড় বছর ছিলাম আমি। চলে আসার সময় আমার মনের অবস্থা হয়েছিল ঠিক এখন তোমার যা হয়েছে সেইরকম।'

'তাই নাকি? সে কিরকম?'

'যেমন দেশে ফেরবার দিন এগিয়ে আসাতে তোমার ভালোও লাগছে, আবার আমাদের ফেলে যেতে দুঃখ হচ্ছে। তাই না? আমাদেরও হয়েছিল তাই, ওদের ফেলে আসবার সময় আমাদের চোখে জল এসেছিল।'

'আমারও আসবে লী, আমারও আসবে, আমি বুঝতেই পারছি।'

চাংসা-তে আমরা আবার একটি কবর দেখতে গিয়েছিলাম। তিন হাজার বছরের পুরানো রাজারানীর কবর। ১৯৭২ সালে তিনটি স্তূপ থেকে রাজারানী ও তাদের পুত্রের কবর খুঁড়ে প্রচুর সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে—যেমন ঈজিপ্টে পাওয়া গিয়েছে। আশ্চর্য লাগে যে, এক-এক যুগের একরকম ভাবনা কিরকম সর্বব্যাপী হয়। চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টির অন্য কি কোনও অজ্ঞাত নিয়ম কাজ করছে? কে জানে। সুদূর ঈজিপ্টে যা করা হত এখানেও ঠিক তেমনি করা হয়েছে। একটি মমি অবিকৃত আছে। এরকম আশ্চর্য মমি কোথাও দেখিনি। কাপড় পেঁচানো নয়—একেবারে খোলা সাদা মর্মরমূর্তির মত শুয়ে আছে। তার পেটের নাড়িভুঁড়ি এমন অবিকৃত যে, তার থেকে পরীক্ষা করে মহিলা কি রোগে মারা গিয়েছিলেন তাও নির্ণীত হয়েছে। জিনিসপত্র দেখাতে দেখাতে যথারীতি গাইড বলতে লাগল, এ-সমস্ত শিল্পই তখনকার সাধারণ দুঃখজীবী মানুষের হাতের কাজ, শ্রমের ফসল। ঐ সব পুরানো জিনিসের মধ্যে একটা টেপেস্ট্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাতে অনেকগুলি মনুষ্যমূর্তি পশুদের অনুকরণ করে একসারসাইজ করছে। ওরা খুব একসারসাইজ করতে ভালোবাসে। অতি প্রাচীন কালে দেশবিদেশে কি করে একইরকম আচার-আচরণ ঘটে, এ কথা আমায় ভাবাচ্ছিল।

গাড়িতে আমি চাংসা-র একজন ইনটারপ্রেটারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের একটি অতি পুরাতন এপিক আছে, তার নাম মাংকি। সেটির সম্বন্ধে কিছু জানো কি না।'

সে বললে, 'না।' আমি জানতাম, মহাভারতের মত বৃহৎ বহু পুরাতন একটি এপিক কাব্য আছে। এখন প্রফেসার ই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ইংরেজী অনুবাদ শুরু করেছেন—বহু দিন লাগবে। বিশ্বম্ভর পাণ্ডে সে গাড়িতে ছিলেন। তিনি টিপ্পনি করলেন, 'পুরানো কিনা, তাই জানে না। নূতন হলে জানত!' যাক, পরে আমি বুঝেছি, আমার প্রশ্নেই ত্রুটি ছিল। কাহিনীটার নাম 'মাংকি' নয়, 'মাংকি কিং', অর্থাৎ বানর-রাজা। বানর-রাজার কাহিনী আজও চীনে খুব প্রচলিত এবং বিশেষ প্রিয় উপভোগ্য রূপকথা। এর সচিত্র শিশুপাঠ্য সংস্করণ দেখেছি। একটা ছবি দেখেছি—গভীর পার্বত্য জঙ্গলে মানুষমুখো বাঁদর লাফ দিচ্ছে। ঠিক যেন হনুমান গন্ধমাদন আনছে। ভারত-ফেরত গৃহকর্তা আমাকে বললেন যে, এই কাহিনীর সঙ্গে অবশ্যই রামায়ণের হনুমানের যোগ আছে। বানর-রাজাও পুণ্যবান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরহিতকারী। ভাবলুম, তাঁকে বলি—স্কলারশিপ দিন, এখুনি বহু রিসার্চ ওয়ার্কার পাওয়া যাবে, যারা দুই দেশ ঘুরে ঘুরে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবে যে, অমর হনুমান চীনে গিয়েছিল!

১লা জানুয়ারী বিকেল চারটেতে আমরা চাংসা থেকে ট্রেনে কুইলীন রওনা হলাম। চাংসা-র প্রচণ্ড শীতে স্টেশনে কাঠকয়লার আগুন পোয়াতে পোয়াতে প্রায় ট্রেন ছেড়ে দেবার উপক্রম। তখন রীতিমত দৌড়ে ট্রেনে উঠতে হল। বরফও পড়ছিল, বৃষ্টিও পড়ছিল।

মধ্যরাত্রে কুইলীন পৌঁছানো গেল। বৃষ্টি, বরফ আর কনকনে হাওয়া মাংস ভেদ করে যাচ্ছে। আমরা একটা বাগানের মধ্যে গেস্ট হাউসে এলাম। মনোরম বাগানে ও ফোয়ারায় সাজানো গেস্ট হাউস। নাম বেনিয়ান ট্রি গেস্ট হাউস, সামনে বহু পুরানো বটগাছ আছে। কিন্তু শীতের চোটে কোনো দিকে তাকাতে পারি না। কোনোরকমে সারি সারি ঘরে ঢুকে পড়া গেল। বৎসলা অত্যন্ত শীত-কাতুরে—হীটারে গা লাগিয়ে বললে, 'কিছু গরম হচ্ছে না।'

লাউঞ্জে মাল জমা হচ্ছে। আজকাল আমরা আর মাল বই না। কেউ-না-কেউ পৌঁছে দিয়ে যায়। কিন্তু চিনিয়ে দিতে তো ঘর থেকে বেরুতে হবে! দরজা খুলেছি, হাওয়ায় দাঁড়াতে পারছি না। লী এগিয়ে এসে আটকাল, 'এই ঠাণ্ডায় চলেছ কোথায়? আমি বাক্স এনে দিচ্ছি।'

'কিন্তু আমার সুটকেস তো চিনিয়ে দিতে হবে।'

'আমি দশটা সুটকেস নিয়ে আসব এই ঘরে, তোমারটা বেছে নাও।' আমার সেই ইটালীয়ান মহিলার লেখা মনে পড়লঃ চীনারা বাজে মাল বয় না! বোধ হয় ভারতীয়দের জন্য বয়।

কুইলীন একটা ফুলের নাম। এই ফুলের গাছে শহরটা সাজানো। এখন ফুল নেই। যখন থাকে তখন সুগন্ধে শহর ভরে থাকে, চারিদিক যেন মাতাল হয়ে যায় সুগন্ধে। এখানে আমাদের শুধু বেড়ানো—কোনো মিটিং নেই। অদ্ভুত জায়গাটা। এখানে ওখানে ছোট ছোট পাথরের পাহাড়, তার ভিতরে গুহা। স্ট্যালেগলাইট স্ট্যালেগমাইটের ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নমুখী ধারায় গুহার ভিতরে বিচিত্র দৃশ্য। পুরানো চায়নায় এসব দ্রষ্টব্য সাজানো ছিল না। এখন একেবারে ইয়োরোপের মত সাজিয়ে ফেলেছে—কালচারাল রেভলিউশনের পরে। কালচারাল রেভলিউশন যে কি মন্ত্র পড়েছিল এ-দেশের উপর, আজও তা ভালোমত বুঝতে পারিনি।

এখানে গুহা দেখা, নদীতে ভ্রমণ—এইসবে তিন-চার দিন খুব আনন্দে কাটল। আর একটু অবসর নিয়ে ছুটির আবহাওয়ায় আমাদের বন্ধুদের আরো কাছে পেলাম, বন্ধুত্বের আস্বাদ আরো মধুর হল। গুহার ভিতর উঁচুনীচুতে ঘোরা যথেষ্ট কষ্টকর, কিন্তু সমস্তক্ষণ কেউ-না-কেউ আমার পিছন পিছন টুল নিয়ে ঘুরেছে। অস্বস্তি হয়েছে খুবই, কিন্তু দর্শনীয় বস্তুর আকর্ষণের চেয়েও প্রীতিসুধা আমার কাছে মধুরতর হয়েছে। আর, আমি কতকটা অক্ষম বলেই এটা হয়েছে আমার উপরি পাওনা। টুল-বাহককে বললাম, 'কমরেড, তুমি অনেকক্ষণ বয়েছ—এবার আর একজনকে দাও।' সে বললে, 'আই অ্যাম ডুয়িং ইট ফর মাই প্লেজার'—আমার এই টুল বওয়াতেই আনন্দ। এর পর আর বলার কিছু নেই।

৩রা জানুয়ারী আমরা পার্বত্য পথ দিয়ে পার্বত্য গ্রামের বিচিত্র শোভা দেখতে দেখতে পঞ্চাশ কিলোমিটার গিয়ে লিকিয়াং নদীর উপত্যকায় পৌঁছলাম। পাহাড়কে ঘিরে ঘিরে এই নদী নৃত্যময়ী। সেখানে মোটর বোট অপেক্ষা করছিল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে প্রচুর খাদ্য সহকারে জলভ্রমণ অতি সুখকর হয়েছিল। এইখানে প্রথম চৌকো চৌকো মুড়ির মোয়া খেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন কুইলীনের বৈদেশিক মন্ত্রকের একজন অফিসার ভদ্রমহিলা। তাঁর নাম মিসেস ওয়াং হ্যাংৎসে। নামটা উচ্চারণ করতে হোঁচট খেলেও তাঁর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার অবিস্মরণীয়। সমস্তক্ষণ তিনি আমার কাছে ছিলেন। মাঝে মাঝে কাউকে ধরে আমরা বাক্যালাপ করছিলাম। সেটাও খুব সামান্য। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁকে আমি কোনো দিনই ভুলতে পারব না। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। জীবনের পথে মানুষের ভিড়ে কত মানুষ হারিয়ে যায় ; কিন্তু আশ্চর্য যে, এক-একজনের কাছে এক-একজন চিরচেনা হয়ে থাকে।

ফেরী বাসে আমরা অন্য পারে গিয়ে উঠলাম। তারপর পথে চার শ' বছরের একটি পুরানো শহরের ভিতর দিয়ে এলাম। এই শহর মিং ডাইনেস্টির সময় স্থাপিত। শহরটি পুরানো হলেও শস্যক্ষেত্র নূতন প্রাণে পূর্ণ। নূতন পদ্ধতিতে চাষ চলছে। বাষট্টি কিলো-মিটার নানা গ্রাম পার হয়ে আমরা আমাদের 'বেনিয়ান ট্রি গেস্ট হাউসে' ফিরে এলাম।

চীন থেকে আসার পর অনেকে আমাদের বলেছে, আমাদের চোখ বেঁধে ঘুরিয়েছে। এইসব দুর্গম গ্রামের পর গ্রাম পার হবার সময় কেউ আমাদের চোখ বাঁধেনি। কিন্তু কোথাও আমরা শস্যহীন ক্ষেত্র, ছিন্নবস্ত্র মানুষ, ঘেয়ো কুকুর-বেড়াল, আবর্জনার স্তূপ, মশা-মাছি, ভিক্ষুক দেখিনি।

৪ঠা জানুয়ারী সকালে আবার একটা গুহা দেখতে যাওয়া। যাব না ভেবেছিলাম ; আবার লোভে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস গেলাম। কাছেই একটা বনসোয়ে বাগান আছে। জাপানীদের মত এরাও বিরাট বিরাট বৃক্ষকে বামন করে রাখে। এক-একটা গাছ দুশো আড়াই শো বছর বয়স। আমি চৌ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের যখন যুদ্ধ চলছিল বছরের পর বছর তখন এগুলোকে কে যত্ন করছিল—কি করে বেঁচে রইল ?' চৌ বললে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। জানি, যুদ্ধবিগ্রহ মানুষের অনেক কীর্তি ধ্বংস করে ; তবু বাকি কিছু রয়ে যায়।

৪ঠা আমাদের হাতে বেশী কিছু করবার ছিল না। আর অনেক দিনের বৃষ্টিবাদলার পর সেদিনই প্রথম রোদ উঠেছে। আমরা কয়েকজন বারান্দায় রোদ পোয়াচ্ছি। ঐ দিনই রাত্রি এগারোটায় আমরা ক্যানটন রওনা হব। মং বললেন, 'কাল ক্যানটনে বাংলাদেশের প্রধান জেনারেল জিয়া আসবেন।' কথাটা আমি আগেই শুনেছি। পিকিং-এ থাকবার সময় আমাদের পাশের ঘরে একটি বাংলাদেশের পরিবার ছিল। মেয়েটি বড় মিষ্টি। কথায় জড়তার জন্য মনে হয় বেশী কথা বলত না। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'শুনেছি ডালিম এখানে ছিল। সে কোথায় ?' মেয়েটি একটু ইতস্তত করে বললে, 'ছিল। তবে এখন কোথায় জানি না।'

স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা জিয়া কাল আসবেন—এই কথাটা আমার মধ্যে অনেক স্মৃতির তোলপাড় লাগিয়ে দিল। এই সর্বেসর্বাকে আমি বেশ কাছ থেকে কয়েকবার দেখেছি। একবার একসঙ্গে আমরা জাপে কলকাতা থেকে কল্যাণী যাই। রোগা শ্যামবর্ণ স্বল্পভাষী একটি ছেলে। তার বিশেষ অভিযোগ তখন ছিল—ভারত সরকার মুক্তি ফৌজকে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে না—যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র যে অন্য পথে ভারতে ফিরে আসে তা তাদের বোঝায় কে। সেদিন আমাদের সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে আমরা দূরপাল্লায় গাড়ি ছুটিয়েছিলাম। জিয়া চলে যাবেন রণক্ষেত্রে ; আমরা যাব শরণার্থী শিবিরে—যেখানে জলে কাদায় নোংরায় গৃহত্যাগী সহস্র সহস্র মানুষ একটা পশুর পর্যায়ে নেমে এসেছে। যাদের সামনে আর কিছু নেই, আছে কেবল রেশন কার্ড। জিয়া স্বাধীনতা ভোগ করছেন, ভালোই। কিন্তু তাদের দুর্গতি এতটুকু কমল কি ? এইসব ভাবতে ভাবতে আমার বুকের মধ্যে এক কোটি লোকের পায়ের শব্দ বাজতে লাগল।

এদিকে রোদ্দুরে আরাম করে বসে বিশ্বম্ভরনাথের ধর্মকথা মনে পড়ছে। তিনি আত্মা, সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, দৈব ইত্যাদি বলছেন। আমি উঠে পড়লাম। এসব খবর নেবার জন্য চীন দেশে আসিনি। দেশেই যথেষ্ট সুযোগ আছে। চীন দেশের সাধু-সন্ন্যাসী হলেও বা হত। তা এরা তো সব তাদের বিদায় করে 'চল কোদাল চালাই, ছেড়ে মানের বালাই' শুরু করেছে। আমি উঠে পড়লাম। মং বললে, 'কোথায় যাচ্ছ !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোসো, বোসো।'

'না।'

'প্লীজ, বোসো।' আমি অনুরোধ শুনলাম না। পাশের বারান্দায় চলে গেলাম। সেখানে কুইলীনের নূতন বালিকা ইনটারপ্রেটারকে বললাম, 'মং-কে গিয়ে তোমাদের ভাষায় বলো যে, তাঁর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে—অন্য ঘরে চলে আসতে। আমি এখন সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক কাণ্ডকারখানা শোনবার জন্য আগ্রহী নই।' এই মেয়েটি আমায় চেনে না, কি কথা হচ্ছিল তাও জানে না, তাই বেশ একটু বিস্মিত হয়ে তারপর 'আচ্ছা' বলে আদেশ পালন করতে চলে গেল।

একটু বাদে মং উঠে এলে আমরা ঐ দোভাষী মেয়েটিকে নিয়ে পাশের ঘরে বসলুম। 'তোমার কি প্রশ্ন আছে বল।' আমি বললুম, 'আমি আজকে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব। জিয়া ক্যানটনে আসবে শুনে আমার বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে গেছে।' বিতর্ক শুরু হতে ইনটারপ্রেটার মেয়েটি বিপদে পড়ে গেল। ইংরেজী জানে না যে, তা নয়। কিন্তু বিষয়বস্তু অপরিচিত আর আমার বাচনভঙ্গীও জানা নেই, তাই সে বললে 'আমি বরং লী-কে ডেকে দিই।' লী পিকিং-এ ফোন করছিল। এসে আমাদের দু জনের মাঝখানে বসল। প্রায় ঘণ্টা দুই মং ও আমার বিতর্ক চলল। কেউ কারু মত থেকে টলব না। আর লী দ্রুত মেশিনের মত অনুবাদ করে চলেছে। সে বিতর্কে অংশ নিচ্ছে না। তার কোনো মত আছে কি না তাও প্রকাশ পাচ্ছে না। সে কারু পক্ষে নয়, শুধু ইনটারপ্রেটার। অনুবাদ যে ভালো হচ্ছে তা উত্তর থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সেদিন যত কথা হয়েছিল তার সব এখানে লেখা যাবে না। মনেও নেই। মোটামুটি তার ভাবটা দিচ্ছি।

'কমরেড মং, বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় তোমরা আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছিলে। কি করে তোমরা পাকিস্তানের পক্ষে বললে?'

'মিসেস দেবী, আমরা জানি, ধর্মের কারণে দেশভাগ হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু একবার যখন হয়েই গেছে, পঁচিশ বছর তারা একটি স্বাধীন দেশ, তখন তাদের অভ্যন্তরীণ গোলমাল হলে তোমরা সৈন্য পাঠালে কেন?'

'অভ্যন্তরীণ গোলমাল? বলেছ ভালো। আমাদের দেশে যে এক কোটি লোক ঢুকে এল তাদের কি করা হত?'

'তাই বলে তোমরা অন্যের দেশে সৈন্য মার্চ করাবে? ধর, ঐ থাই উপজাতিদের উপর যদি আমরা অত্যাচার করি তা হলে থাইল্যাণ্ডের লোকরা কি বলবে, ওরা আমাদেরই জাতভাই, অতএব আমরা চীনে সৈন্য পাঠাব!'

'তোমার যুক্তির অর্থ নেই। তা ছাড়া থাইরা কি করবে জানি না; তবে তোমরা যদি বেচারা থাইদের উপর অত্যাচার কর তা হলে আমিই সৈন্য পাঠাব। অর্থাৎ, আমার সৈন্য থাকলে পাঠাতাম। যেখানেই মানুষের উপর অত্যাচার হোক, অন্য মানুষের অধিকার আছে সেটা রুখবার। তা ছাড়া বাংলাদেশের মানুষ আমাদের পর নয়, তাদের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ আছে। সেখানে আমাদের আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের দুঃখে আমরা নীরব থাকতে পারি না। আর তোমরা কিনা আমেরিকার দলে গেলে। আমেরিকা আমাদের বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে দিল।'

'কিন্তু কক্ষনো গুলি ছুঁড়ত না।'

'তবে কি ভয় দেখাচ্ছিল? সেও যথেষ্ট খারাপ। তুমিই বলেছ এগ্রেশন খারাপ। সেই জন্যেই আমাদের রাশিয়ার সাহায্য নিতে হল। রুশ নৌবহর পিছনে না থাকলে কি হত, কে জানে। সেই জন্যই বলতে হবে, রুশরা আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।'

'তাতে ওদের স্বার্থ আছে। সাহায্য নিঃস্বার্থ নয়। আর সৈন্যগুলোকে ধরে এনে তোমরা অত দিন রেখে দিলে কেন?'

'অত্যাচারীদের বিচার হওয়া উচিত ছিল। সৈন্যদের যুদ্ধ করার দায়িত্ব—অত্যাচার করার অধিকার নেই।'

'তুমি বেশ মিসেস গান্ধীর সাপোর্টার।'

'বাংলাদেশের প্রশ্নে মিসেস গান্ধীই আমাদের সাপোর্টার। মিসেস গান্ধীর সবচেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় বিরোধী যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, যিনি পাকিস্তানের বন্ধু, তিনিও উচ্চৈস্বরে বলেছিলেন, বাংলাদেশ ও অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। দেশসুদ্ধ লোক তাই চেয়েছিল। আর একমাত্র রাশিয়া আমাদের সাহায্য করেছিল। দেখো কমরেড, আমি পলিটিকস বুঝি না। মানবিকতার দিকটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় মনে হয়। আর সেই জন্যেই ক্রুশ্চেভকে আমার বেশ সহৃদয় মানুষ মনে হত। তারই পলিসি তো আজও চলছে।' এইবার মং-এর রাগবার পালা।—ক্রুশ্চেভ সহৃদয়! বলেছ ভালো! সোস্যালিজমের সাইন-বোর্ড লাগিয়ে ইম্পিরিয়ালিজমের শোষকবৃত্তি। পাকিস্তান অন্তত সাইন-বোর্ড ঝোলায়নি। সহৃদয় বটে! তাই আমাদের ঐ অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের দিনে আমাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। এক তরফা সমস্ত কন্ট্রাক্ট ছিঁড়ে ফেলে কর্মীদের তুলে নিয়ে গেল শুধু নয়, জাহাজ পাঠিয়ে দিল জিনিসপত্র নিয়ে যাবে—নয়তো তখুনি ঋণ শোধ করতে হবে।

'কমরেড মং, সত্যি বলছি, এই ব্যাপারটা এতখানি দেশে থাকতে আমি জানতাম না। কিছুটা শুনেছি। তবে তোমরা ঠিক কতটা কষ্ট পেয়েছ তা আন্দাজ করতে পারিনি। তাই বলছি, এক দেশের ব্যাপারে বাইরে থেকে অন্য দেশের মানুষ বুঝতে পারে না, যতই না কেন তাদের সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা নিপুণ হোক। তুমি কি জানতে যে, আমাদের কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা থাকত—চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান?'

'জানতাম।—কিন্তু জানো—সে স্লোগান আমাদের কোনো কাজে লাগেনি। মাও-সে-তুং সমগ্র মানব জাতির শ্রদ্ধার পাত্র, তাই বলে তিনি কিছুতেই ভারতের চেয়ারম্যান হতে পারেন না। ঐ উক্তিটা তাই ক্ষতিই করেছে।'

'সেটা ঠিক।'

আমরা রাত্রি এগারোটায় কুইলীন ছেড়ে মধ্যরাতে ক্যানটন পৌঁছলাম। এয়ার পোর্টে ডাঃ কোটনিসের বন্ধুপত্নী ও তাঁর দুই কন্যা বৎসলা ও মঙ্গেশের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা দূরে থাকেন, কিন্তু আমাদের গেস্ট হাউসে তাঁদের জন্যও ঘর ঠিক করা ছিল। যে ক'দিন আমরা ক্যানটনে ছিলাম তাঁরাও আমাদের সঙ্গে রইলেন। ডাঃ কোটনিসের বন্ধুটি কবে কিভাবে মারা গেছেন ঠিক মনে নেই, তবে তাঁর স্ত্রীর মুখে যে একটা সকরুণ ছাপ আছে তাতে তাঁকে আজও সদা-বিধবা মনে হয়। মেয়ে দুটির ব্যবহারও খুব আপনজনের মত। এঁরা বৎসলাকে যেন নিজের লোকের মত কাছে টেনে নিল। যেন একই পরিবার, যেন বহু দিনের চেনা। ভারত-চীন সংঘর্ষের সময় এইসব ভারত-বন্ধুদের বড় মনঃকষ্ট হয়েছিল।

ক্যানটনের গেস্ট হাউসটি পুরানো ধরনের বাড়ি। বিরাট প্রাসাদ, কিন্তু 'সেন্ট্রাল হিটিং' নেই। ঘরে একটা হীটার দিয়ে গেল। তাতে ঠাণ্ডা কমে না। শীত যেন তাড়া করে ফিরছে। এখানে পৌঁছে সেই মধ্য রাত্রে কলকাতার চিঠিগুলি পেলাম। লী পাঁচখানা চিঠি প্রথম দিয়ে গেল, তারপর আবার নিয়ে এল আরো দুখানা। বললে, 'বাম্পার হারভেস্ট।' এ পর্যন্ত দেশের একখানা চিঠি পাইনি। বিজয়বাবু বলতেন, আপনাকে কেউ লেখেনি। লিখলে ঠিকই পেতেন। ভ্রাম্যমাণ পথিকদের পিছনে ছুটে চিঠিপত্র হারিয়ে যাবে বলে চিঠিপত্র সব এসে ক্যানটনে জমা হচ্ছিল। আর এগুলির জন্য আমার কত বিনিদ্র রাত গেছে। মং বললে, 'তুমি তো কখনও বলোনি তুমি ভাবছ, তা হলে তখুনি খবর এনে দিতাম।'

ক্যানটনের' পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে 'পার্ল রিভার'। তার উপর মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করছে। পুরানো শহর। খুব ঘিঞ্জি জায়গাও দেখলাম। একটি গোল পার্কে হাতের নাগালের মধ্যেই প্রস্ফুটিত ফুলের টবের সারি সাজানো রয়েছে। অত জনবহুল জায়গাতেও কেউ ছিঁড়ে নিচ্ছে না। ক্যানটনে এসে আমাদের খুব বাজার করবার তাড়া পড়ে গেল। যে ক'টি ইয়েন আছে, খরচ করে ফেলতে হবে।

৬ই জানুয়ারী আমরা একটি স্বাস্থ্যনিবাসে গেলাম। সেখানে গরম জলের উৎস। তবে উৎসে স্নান করবার জন্য রাজগীরের মত বাইরে লাইন করে যেতে হয় না—ঘরেই

AMARBOI.COM

নল দিয়ে জল আসে। তবে বাইরেও পাইপ আছে এবং সেখানে অনেকে স্নান করছে দেখলাম। পঞ্চাশ কিলোমিটার মত গাড়ি চালিয়ে আমরা ঐ স্বাস্থ্যনিবাসে পৌঁছলাম। পথে একটি বাড়ি দেখিয়ে ওরা বললে, এই গেস্ট হাউসে জিয়া আছেন। চার পাশে পতাকা উড়ছিল। দেশগুলো ভাগ হলে নূতন নূতন লোক উচ্চপদে যাবার সুযোগ পায়। সেটা তাই কারু কারু পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত। পাকিস্তানের কবল থেকে বেরিয়ে এর থেকে আর এদের বেশি কি লাভ হয়েছে! মং আমাদের গাড়িতে ছিল না, নইলে ওর সঙ্গে আর একটা বিতর্ক শুরু করতাম। গাড়িতে সর্বদা তিন জন থাকে। ভিতরে দু-জন অতিথি, বাইরে একজন ইনটারপ্রেটার। আমি, বৎসলা আর লী চলেছি ঘোরানো পার্বত্য পথ দিয়ে ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে, ইচ্ছে করে নেমে গিয়ে দুটো কথা কয়ে আসি। আমি বললাম, 'লী, যাবার দিন তো এগিয়ে এল। এখন মনে হচ্ছে কিছুই জানা হল না, দেখা হল না।'

'আবার এস। তোমার জন্যে চীনের দরজা সর্বদা খোলা।'

'যদি যুদ্ধ বাধে আবার?'

'তাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি?'

'তা ঠিক। তবে আবার এসে লাভ নেই। আমি যা শুনলাম দেখলাম তার চেয়ে বেশী কোনো দিনও শুনতে বা দেখতে পাব না। কারণ, আমি ভাষা জানি না। স্বাভাবিকভাবে কথা বলবার ক্ষমতা আমার নেই। জানো, আমাদের কবি বলেছেন, কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া আর ইনটারপ্রেটারের মাধ্যমে কোর্টশিপ করা একই। অতএব তোমার দেশের লোকের সঙ্গে মন জানাজানি হল না, হবে না।' এ কথাটা ওকে কিভাবে লাগবে খেয়াল করিনি। সামনের সীট থেকে লী ফিরে তাকাল। মুখে একটু মলিন হাসি—সো ইউ আর ইউজিং মি অ্যাজ এ ফর্ক—আমায় তা হলে একটা কাঁটার মতনই ব্যবহার করছ!

স্বাস্থ্যনিবাসের নামটা বোধ হয় চুংহোয়া। পাশ দিয়ে একটা খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে—। পড়ে পড়ে গরম জলে স্নান করে নেওয়া গেল।

পরের দিন সেখান থেকে আমরা একটা হাইড্রলিক পাওয়ার স্টেশন দেখতে গেলাম। পার্বত্য নদীর জলসম্ভারকে বাঁধ দিয়ে তৈরী করেছে এই পাওয়ার স্টেশন ১৯৫৮ সালে, 'গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড'-এর বছরে। সমস্ত প্রজেক্টটা দু বছর তের দিনে সম্পন্ন হয়েছে। এই যন্ত্রলালার গুণ ও গতি চমৎকার। সমস্ত প্রকল্পটি তৈরির জন্য তিন বছর সময় নির্ধারিত ছিল; কিন্তু উৎসাহী কর্মীরা তার অনেক আগেই কর্ম সুসম্পন্ন করেছে। চৌদ্দ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার স্থানে এই পাওয়ার স্টেশনে উৎপন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছয়। বাইরে বেরিয়ে দেখি পর্বতচূড়ায় বড় বড় অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে মাও-সে-তুং-এর অনুশাসন—'গো অল আউট, এইম হাই, ওয়ার্ক ফাসটার অ্যান্ড বেটার সো অ্যাজ টু এচিভ মোর ইকোনোমিকাল রেসাল্টস্ টু বিল্ড সোসালিজম'।

এ রকম কথা সব জায়গায়ই যে-কেউ লিখতে পারে। সে লেখার পাশ দিয়ে উদাসীন জনস্রোত বয়ে যায়। কিন্তু পাহাড়ে উৎকীর্ণ ঐ অক্ষরগুলো প্রাণ পেয়েছে। পাথর থেকে নেমে এসে ওরা হাইড্রলিক যন্ত্রে ঘূর্ণ্যমান। নির্দিষ্ট সময়ের ন-মাস পূর্বে কাজ শেষ করে ফেলা সহজ কথা নয়।

ঐ পার্বত্য এলাকায় অনেকগুলো ছোট ছোট নদী। সেগুলোকেও কাজে লাগানো হয়েছে। গ্রামের লোকেরা মিলে ছোট ছোট পাওয়ার স্টেশন বানিয়েছে। একটা নদীর মুখকে বাঁকিয়ে একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে ন-শো কুড়ি কিউসেক জল নিয়ে এসেছে দেখলাম। ফলে দুশো ক্ষেত জমির বন্যা বন্ধ হয়েছে, আলো তো এসেছেই। এইটাই চীনের বড় আশ্চর্য ব্যাপার। বিরাট বিরাট প্রজেক্ট না করে যেখানে সুবিধা পাওয়া যায় কাজে লাগানো। নিজেরাই পাওয়ার স্টেশন বানিয়েছে। স্ট্রাইক করবে কে? সাবোটাজ করবে কে? গো-স্লো করবে কে? গ্রাম্য চাষীরা এই 'প্ল্যান্ট' কি করে বানাল জিজ্ঞাসা করে জানলাম, কালচারাল রেভলিউশনের সময় শহর থেকে ছেলেরা এসেছিল—তাদেরই সাহায্যে এই যন্ত্রপাতি বানানো হয়েছে। এ-রকম ছোট ছোট বাহান্নটি পাওয়ার স্টেশন আছে এই এলাকায়। উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎশক্তি শহরের জন্য চলে যায়। শুনলাম কাছাকাছি আরো আঠারটি এ রকম স্টেশন হবে। ওরা গল্প করছিল? পাহাড়ের উপরে এক বৃদ্ধা একাকী বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত। প্রকৃতির এই দান পাহাড় থেকে দ্রুত পতনশীল জলধারাকে সে নানা কাজে লাগাত। তাই দেখে গ্রামের লোকেরা উৎসাহী হল। সরকার থেকে তারা আর্থিক ও বৈজ্ঞানিকের সাহায্য পায়, কিন্তু তৈরি করেছে নিজেরাই। আমরা একটি মাঝারি গোছের পাওয়ার স্টেশন দেখলাম। এটা অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা চালাচ্ছে। একটি ফুটফুটে মেয়ে—ইংরেজী বলে—তাকে বড় ভালো লাগল। সবচেয়ে আনন্দ হল যে, কারু সাহায্য ছাড়াই তার সঙ্গে গল্প করতে পারলাম। সে বললে, তাদের আদর্শ হচ্ছেঃ 'ডেয়ার টু স্কেল দ্য হাইটস, ডেয়ার টু ফলো দ্য রোড, ডেয়ার টু ওয়ার্ক হার্ড, টেক ক্লাস-স্ট্রাগল অ্যাজ কীলিঙ্ক টু মেক ইউজ অফ লোকাল কনডিশনস্, ইউজ দ্য লোকাল পিপল্।'

উচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করতে সাহস কর, সাহসী হও সামনে এগিয়ে যেতে, কঠিন শ্রম করতে সাহস কর, শ্রেণী সংগ্রামের সূত্রটি মনে রেখে স্থানীয় সুযোগের ব্যবহার কর, স্থানীয় মানুষদের সাহায্য নাও। বাস্তব ও কবিতায় মেশামেশি এই মাও-সে-তুং। এইজনাই তাঁর বাণীতে প্রেরণা।

নদীর ধারে সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাসে বেশ বিশ্রামে দু দিন কাটল। ফেরার আগের দিন খাওয়ার পর আমরা চার জন—আমি, বৎসলা, লী ও মং আলোচনায় বসলাম। বহু রাত পর্যন্ত চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। আলোচনা অর্থ আমি প্রশ্ন করি সে উত্তর দেয়। এই প্রশ্নোত্তর সকলের সামনে করা যায় না। কারণ, অন্যরা যত জানেন আমি তা জানি না—আমি ওদেরই মুখ থেকে শুনব ; তারপর দেশের লোককে জানাব এই আমার ইচ্ছা। আমি প্রশ্ন করি, মং উত্তর দেয়। বৎসলা নীরব শ্রোতা। আমাদের প্রশ্ন ছিল লিউ শাও চি সম্বন্ধে। অত উচ্চ পদে থেকে মাও-সে-তুং-এর অনুগত হয়েও তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাধল কেন? উত্তরে যা শুনলাম তার সত্যাসত্য নির্ধারণের মত উপকরণ আমাদের হাতে নেই। মং-এর বক্তব্য, তিনি বরাবরই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি একবার 'রাইট কুয়োমিনটাং'-দের কাছে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি তখন একটা নূতন থিয়োরী বলতেন—'পীস অ্যান্ড ডেমোক্রেসী'। মুক্তির পরও তিনি ডেমোক্রেসীর কথা বলেছেন। ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রভাব খুবই ব্যাপ্ত হয়েছিল সারা দেশে। যদিও লিউ শাও চি নয়, চেয়ারম্যান মাও-ই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেন। কিন্তু তিনি মাও-সে-তুংকে অগ্রাহ্য করে একটি গোপন বিরাট চক্র গড়েন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হলে আমরাও সোভিয়েট ইউনিয়নের পথে যেতাম। তাই মাও-সে-তুং একেবারে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সূচনা করলেন অর্থাৎ কালচারাল রেভলিউশন। লিও শাও চি-র ঘাঁটি (হেডকোয়ার্টার্স) ধ্বংস করাই শুধু তার উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনের পরিবর্তন, যাতে তারা পুরানো পথে ফিরে যাওয়ার ভ্রমটা বুঝতে পারে। কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় অনেক বাজে লোক তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা এই গোলমালের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থ সাধনে লেগে যায়। এই সময় পর্যন্ত চ্যাং চিং একজন সাধারণ কমিউনিস্ট পার্টি মেম্বার ছিল। এখন তারা সেন্ট্রাল কমিটিতে ঢুকল এবং খুব বিপ্লবের কথা শুরু করল। ডিফেন্স মিনিস্টার লিন পি আও চ্যাং চিং-কে খুব প্রশংসা করলে। ক্রমে অন্য তিনজনও ঐ সময়ে দারুণ বিপ্লবী হয়ে ঢুকে পড়ল। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়তে লাগল। নবম পার্টি কংগ্রেসে ১৯৬৯ সালে তারা পলিট ব্যুরোর মেম্বার হল। জনসাধারণ বুঝতে পারত না, চ্যাং চিং যা বলছে তা মাও-সে-তুং-এর বক্তব্য কি না। তারা যাকে খুশি বরখাস্ত করে দিত, বদনাম দিত এই বলে যে, এরা ক্যাপিটালিস্ট লিউ শাও চি-র অনুগত। যাতে অন্য লোককে সরিয়ে নিজেদের লোক দিয়ে ঘিরে ফেলতে পারে। মাও-সে-তুং-কে কেবল বলত, একে সরাও, ওকে সরাও। যাতে সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে রেখেও তাঁর সমস্ত শক্তি অপহরণ করতে পারে। যাকে বলে ঠুঁটো জগন্নাথ করা। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা ছিল প্রিমিয়ার চৌ এন লাই। তাই ওরা মাও-সে-তুং-এর কাছে তাঁর নিন্দা শুরু করে। তিনি বিশ্বাস করেননি। তখনই তিনি বলেছিলেন—'ডু নট কনস্পায়ার, বি ওপেন, ডু নট বিহেভ লাইক দ্য গ্যাং অফ ফোর, ইউনাইট উইথ দ্য টু হান্ড্রেড মেম্বারস অফ দ্য পলিট ব্যুরো'।

১৯৭৪ সালের অকটোবরে, জাতীয় কংগ্রেস ডাকা হবে। ঐ সভায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠন হবে। তখন চৌ এন লাই খুব অসুস্থ। ওয়াং হো (চার জনের একজন) মাও-সে-তুং-কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে, উনি অসুখের ভান করছেন। তিনি তাদের বিশ্বাস করলেন না। থাং সিও পিং প্রধান ও উপ-প্রধান মন্ত্রী হলেন। ১৯৭৪ সালে গ্যাং অফ ফোর তাঁর কোনো ত্রুটির দরুণ তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। ১৯৭৬ সালের আটই জানুয়ারী চৌ এন-লাই মারা যান। মাও-সে-তুং তাই হুয়াকে প্রধানমন্ত্রী ও প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে বলেন, হুয়ার হাতে দেশের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। গ্যাং অফ ফোর হুয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকে। মাও ক্রমে ক্রমে বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওরাও সুযোগ পায়। মাও-এর মৃত্যুর পরে ওরা তাড়াতাড়ি ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। কাগজ, রেডিও ইত্যাদি (মাস্ মিডিয়া) ওদের দখলে ছিল। ওরা মাও-সে-তুং-এর একটা উইলও জাল করেছিল। কিন্তু হুয়া এবং ইয়ে চিয়ে চিন ওদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে ৭ই অক্টোবর ১৯৭৬ সালে ওঁদের বন্দী করেন। তিনি তাই বলেন, এক বিন্দু রক্তপাত হয়নি, চারজনকে বন্দী করেই কার্যোদ্ধার হয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তবে যে শুনি গুরুতর যুদ্ধ হয়েছিল, হাজার হাজার লোক মরেছে।"

মং বললে, "কোথা থেকে খবর পাও? হংকং থেকে বোধ হয়। আমাদের কি শত্রু কম?"

রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। লী ঘুমে ঢুলছে। নিচ থেকে নদীর মৃদু কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমাদের চীন দেশে আর দুটি রাত্রি বাকি আছে।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে পরের দিন আমরা গাড়িতে ক্যানটন ফিরলাম। আমার আশ্চর্য লাগছিল যে, এই মানুষগুলির জন্য আমার বেশ একটু স্নেহ জন্মেছে, কিন্তু এদের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না। আমার যা বয়স, আমার কি আর আসা হবে? যদিও লী বলছে, তুমি আরো চল্লিশ বছর বাঁচবে অর্থাৎ শতং জীব। আর কোনো ডেলিগেশন যদি এ-দেশ থেকে ভারতে যায়, এরা কি আর যাবে? মং বললে, "স্নেহ জন্মানো আশ্চর্য নয়—আজ পাঁচ সপ্তাহ আমরা সব সময় একসঙ্গে আছি। মানুষ এইরকমই।"

আমার মুশকিল হয়েছে এই যে, এদের কিছু উপহার দিতে চাই, কিন্তু আমার কাছে আর কিছুই নেই। পিকিং-এই সব দিয়েছি বোঝা হাল্কা করবার জন্য। কিন্তু সে দিন যাদের দিয়েছিলাম তারা ছিল অন্য মানুষ। সে ছিল ভদ্রতার দেওয়া। আজ পরিচয়ের বন্ধনে তারা আত্মীয়। একই মানুষের মূল্য কত বদলে যায়। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই। "জানো লী, তোমাকে প্রথমে আমার একটুও ভালো লাগেনি। আমি ভেবেছিলাম এই উদ্ধত ছেলেটাকে সামলাব কি করে?"

"অ্যাঃ, কেন?"

"কারণ, তুমি আমার কবিতাটা টাইপ করোনি।"

"ও, তারপর কখন থেকে সামলাতে পারছ?"

"সে ঠিক মনে নেই। যাই হোক, তোমার স্ত্রীকে আমার অনেক ভালোবাসা আশীর্বাদ জানিয়ে এই শাড়িটা দিও। সে যেন পর্দা করে ব্যবহার করে।"

"কেন তুমি জিনিসপত্র নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছ? জিনিস ছাড়া কি স্নেহ ভালোবাসা বোঝা যায় না?" আমার ব্যস্ততার কারণ আরো যে, বৎসলা অনেক জিনিস এনেছে—সকলকে দিতে লাগল। সে শেষ দিন পর্যন্ত জমা করে রেখেছিল।

৭ই জানুয়ারী ক্যানটনে আমরা একটা 'বোবা-কালা' ছেলেমেয়েদের স্কুল দেখতে গেলাম। আকুপাংচারের সাহায্যে চিকিৎসা হচ্ছে। সবাই যে সম্পূর্ণ সারে তা নয়। তাদের চিকিৎসা ও শিক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দেব না। তবে তারা যে নাচগুলো দেখাল তার বিষয়বস্তুগুলো লিখছি—রাস্তায় একজনের একসিডেন্ট হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও রেডগার্ডরা তাকে সাহায্য করছে। আর একটি—সাধারণের জিনিস নষ্ট হচ্ছে দেখে প্রাণ বিপন্ন করেও একটি ছেলে ভেসে যাওয়া কাঠ রক্ষা করল। তৃতীয় নাচ হচ্ছে—নিষ্পত্র বৃক্ষে ফুল ফুটছে। এর নিহিতার্থ হচ্ছে বোবা-কালারাও কথা বলছে। চতুর্থ নাচ হচ্ছে—রেডগার্ডরা একজন পথভ্রান্ত বৃদ্ধকে বাড়ি খুঁজে দিল। পঞ্চম নাচটি সবচেয়ে সুন্দর—মৈত্রী নৃত্য। ভারতের ত্রিবর্ণ ও চীনের পতাকা নিয়ে স্টেজ জুড়ে ছেলেমেয়ে টেবিল টেনিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃত্য করল। সঙ্গের গানের কথা ছিল—'ফ্রেন্ডশিপ ফার্স্ট কম্পিটিশন সেকেন্ড'। এই নৃত্যগীতে আমরা সম্মানিত ও অভিভূত বোধ করলাম।

৭ই জানুয়ারী থেকেই আমরা লক্ষ করছি রাস্তায় ছেলেমেয়েরা কাগজের পুষ্পস্তবক নিয়ে চলেছে। কিছু কিছু আসল ফুলও আছে। ৮ই জানুয়ারী আমরা পঞ্চাশ বছর আগে মাও-সে-তুং-এর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান দেখতে গেলাম। এটি ছিল চাষীদের শিক্ষা-কেন্দ্র। এখানে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ক্যাডার তৈরি করত। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এর পরমায়ু ছিল কয়েক মাস কিন্তু এর মধ্যেই দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে তিন শত ছাত্র এসেছিল। তাদের জন্য বইও লিখতে হয়েছিল মাও-সে-তুং-কে। ছত্রিশটা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। শস্য এবং শাস্ত্রে শিক্ষিত হয়ে তারা নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে শিক্ষণকেন্দ্র খুলেছিল। এটা বোর্ডিং স্কুল ছিল। ছুতোর দেওয়া সারি সারি খাটে মাদুর পাতা সাজানো রয়েছে। চৌ এন লাইও একজন শিক্ষক ছিলেন এখানে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি ; আর চত্বরের উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা হল-ঘর—সেখানে মালা নিয়ে দলে দলে লোক জমায়েত হচ্ছে। ঢুকে দেখি সেখানে চৌ এন লাই-এর ছবি রয়েছে। সেদিন ৮ই জানুয়ারী—চৌ এন লাই-এর প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী। এ এক বছর গ্যাং অফ ফোরের অত্যাচারে চীনাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য তারা শোকই জানাতে পারেনি। এবারে তাই উচ্ছ্বাস বাঁধ ভেঙেছে। আমরা এক পাশে দাঁড়ালাম। মৃত্যুর একটা মহিমা আছে। শোকেরও শক্তি আছে। তা অপরিচিতকে কাছে আনে, তা কঠিনকে গলিয়ে দেয়। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ সুশৃঙ্খল জনতার শান্ত অভিবাদন দেখতে লাগলাম। দলে দলে স্কুলের কিন্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়ে এল। সকলের হাতে মালা। আমরা এত বড় একটা ডেলিগেশন—আমাদের হাতে কিছু নেই। আমরা বললাম, ভারতীয় প্রথায় শ্রদ্ধা জানাই। আমি ও বৎসলা হাতজোড় করে স্বর্গত আত্মাকে বা স্মৃতিকে নমস্কার জানালুম। আমাদের সঙ্গে বিজয়বাবু ও ইন্দিরা দেবী ছিলেন না। তাঁদের এসব আগে দেখা। বৎসলা খুঁতখুঁত করতে লাগলেন—আমাদের মালা দেওয়া উচিত। সকলেরই মন ভারাক্রান্ত ছিল। বড় সুন্দর ছিল সেদিনের মৃত্যুৎসব। গাড়িতে উঠবার সময় আমি বললাম, কমরেড মং, বৎসলা চায় আমরা একটা মালা দেব। আমিও চাই। সময় হবে? ব্যবস্থা হবে? মং-এর গলা ভারি ছিল। বললে, "তোমাদের ইচ্ছা ভারি সুন্দর—ব্যবস্থা হবে।" আমি বললাম, এবারে দাম আমরা দেব—তোমরা দিও না।—মং রাজী হল। আসল ফুলের মালা এল। দাম চল্লিশ ইউয়ান। বিকেলবেলা আমরা সবাই মিলে সেই স্মৃতিমন্দিরে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে এলাম। বাইরে তখন লোকারণ্য। ছেলেরা মিটিং করছে, বক্তৃতা করছে। সেদিনটা বেশ মনে রাখার মত।

৮ই জানুয়ারী এদিকে শোকের দিন হলেও সেদিন আমাদের শেষ রাত্রি। তাই ভোজের আয়োজন ছিল ভালোমত। আমার টেবিলে লী ছাড়া আর একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি খুব ভালো ইংরেজী বলেন। তাই আলাপ জমে উঠেছিল। আর একটি লোক ছিলেন খুব ফুর্তিবাজ, বলিয়ে-কইয়ে। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি ইংরেজী জানেন?' তিনি বললেন, 'ভালোমত চীনাই জানি না—তা ইংরেজী। লড়াই করেই জীবন কাটল তো ভাষা শিখব কখন? তিনি আমাকে খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করছিলেন। আমি বললুম, "চীনে এসে খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছি।"

"তাই নাকি? চীনে খাবে কী? রাশিয়া বলে আমাদের খাদ্য নেই।"

আমার মোটা হবার যে এ রকম একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে তা জানলে না-হয় আর একটু খেতাম। তারপর শুরু হল রুশদের গল্প—"তোমরা কখনো ওদের কাছে আপেল বিক্রি করেছ? আমাদের সঙ্গে চুক্তি হল—আপেল কিনবে ওরা। একটা মাপমত বড়সড় রিং দিল। সেইটার মধ্যে ঠিকভাবে ঢুকে যাবে এই রকম আপেল চাই। তার চেয়ে ছোট হলেও হবে না, বড় হলেও না। তখন আমরা বললুম থাক, আমাদের আপেল আমরাই খাব। তোমাদের এ রকম কিছু করেনি?"

ভদ্রলোক তিক্ততাশূন্যভাবে এ রকম বহু নিন্দাবাক্য হাসিয়ে হাসিয়ে বলতে লাগলেন। ইনি বিশ্বভাষার কথা বলেন। ভাষা না জানা থাকলেও এ রকম লোকের সঙ্গে ভাব জমতে দেরি হয় না। আমাদের টেবিলে যখন গল্পগুজব জমে উঠেছে তখন বিজয়বাবু তারাচাঁদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুস্তকে কিছু বলতে বললেন। আগেই নিশ্চয় বলা ছিল। তারাচাঁদ পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে রেভলিউশন সম্বন্ধে গালভরা অনেক কথা বলতে লাগলেন। লী আমার মনের কথা বুঝেছে। ও জানে, এসব বাঁধা গৎ শুনলে আমার হাসি পায়।

"লী, রুশদের তো অনেক দোষ। কিন্তু ওরা চিঠি লেখে। তোমরা চিঠি লিখতে পার? তোমাকে আমাদের কাছে চিঠি লিখতে অনুমতি দেবে?"

"অনুমতি কেন দেবে না। কিন্তু আমি লিখব না। তুমি লিখবে কিন্তু আমি উত্তর দেব না।"

"কি আশ্চর্য! কেন?"

"কারণ, আই অ্যাম জাস্ট এ ফর্ক অ্যান্ড নট এ পেন (আমি একটা কাঁটা মাত্র, কলম নই)।" আমি অবাক হয়ে লী-র দুষ্টুমিভরা মুখের দিকে চেয়ে আছি। আমার সেই কথাটা একেবারে মনে বসে গেছে, আর কোপ বুঝে কোপ মানে চতুর উত্তর দিয়েছে।

"লী, তুমি এত চালাকি করে কথা বলতে কি চাষীদের কাছ থেকে শিখেছ, না পার্নার্ড শ?"

সেদিন রাত্রে আমাদের সিনেমা দেখানো হল—চৌ এন লাই-এর শববাত্রা ও অন্ত্যেষ্টি। এই ছবিটা নাকি চিয়াং চিং ও তার দল দেখাতে দেয়নি। তাই আমাদের সঙ্গে আমাদের চীনা বন্ধুরাও প্রথম দেখলেন। আমরা সামনের সীটে সারি সারি বসলাম—সঙ্গে ক্যানটনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আর পিছনে সারি দিয়ে ইংরেজী-বলিয়ে ইনটারপ্রেটারের দল। এই ছবিতে মাদাম চৌ এন লাই-কে বেশ ভাল করে দেখা গেল। মাদাম সান-ইয়াৎ-সেনকেও। দুজনেই খুবই স্থবিরা হয়ে পড়েছেন।

ঐদিন সকালে ও বিকালে যখন আমরা চৌ এন লাই-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মাল্যদান দেখি ও করতে যাই তখন লী আমাদের সঙ্গে ছিল না। তাকে তাই বললাম, বৎসলা ও আমি কিরকম ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করেছি। ও বললে, "জাপানীরাও বোধ হয় এইরকম করজোড় অভিবাদন করে।"

আমি বললুম, "আর তোমরা খালি ইংরেজদের মত হ্যান্ডশেক কর?"

"আমাদের আগে কাউ টাউ ছিল, এখন উঠে গেছে। ওটা ভালো নয়। তোমাদের নমস্কার সুন্দর।"

সিনেমা দেখে এসেও আমরা করিডোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক গল্প করলাম—বৎসলা, মণ্ডেশ, দীনেশ, আমি, মং, সু ও চৌ। মং ঘণ্টা হিসেব করে বললে, আর এগার ঘণ্টা সময় আছে। সু ব্যাকুল হয়ে পড়ল আমায় কিছু দেবার জন্য। কারণ, পিকিং ছাড়বার পর থেকেই তার যে মাফলারটি ব্যবহার করছিলাম তখন সেটি ফেরত দিলাম। ও ভারি ক্ষুণ্ণ হল—'তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন, নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।' কিন্তু আমি নাচার—আর আমাদের মালের ওজন বাড়ানো চলে না, বইতেও পারি না। তাই ওর লাল ডট পেনটা নিয়ে ওকে শান্ত করলাম। একটা নূতন বাটা'র চটি নিয়েছিলাম, সেটা চৌর পায়ে হল, তাকে দিলাম—তার চোখ মুখ বিজ্ঞ।

স্টেশনে পৌঁছে শুনলাম, আমাদের পাঁচ সপ্তাহের বন্ধুরা সীমানা পর্যন্ত যাচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে ক্যানটনের একজন ইনটারপ্রেটার যাবে। সে এদিকের সব কিছু জানে। ওরা তো ক্যানটনিস ভাষাও জানে না। তবে সকলেই ম্যানডারিন বলে, এইজন্যে রক্ষে। লেখা এক হলেও ভাষা আলাদা। আমাকে সুনীতিবাবু বলেছিলেন, বিড়ালের ছবি দেখে সবাই যেমন বিড়াল পড়বে না—কেউ পড়বে বিল্লী, কেউ মেকুর, কেউ হয়তো ক্যাট। ওদের লেখা তো ছবি।

স্টেশনে বিদায় নেবার সময় মং বললে: 'আবার দেখা হবে—এদেশে কিংবা ও-দেশে।'

চৌ-এর চোখ ছলছল করছিল। ওর মন বড় নরম। সু আমার হাতটা জড়িয়ে ছিল। তারও চোখে অশ্রুবাষ্প. কি আশ্চর্য ব্যাপার! ক'দিনেরই বা চেনাশোনা! লী অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে দীনেশের সঙ্গে কথা বলছিল। দীনেশ চলে এলেও ও দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। সেখান থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেঁচিয়ে বললে, 'তোমার বইটার জন্য অপেক্ষা করব।' ভিতরে উঠে গাড়ির বন্ধ জানালায় আমরা একেক জন দাঁড়ালাম—বিশেষ করে জ্ঞানসিং ও আমি। জ্ঞানসিং খিংড়ার চোখ ছলছল করছিল। ছয় ফুট লম্বা দাঁড়ি-গোঁফওলা জবরদস্ত পাঞ্জাবী, কিন্তু নরম মন। যখন গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে তখন লী দূর থেকে হাতে ইশারা করে দেখাল যেন কলম ধরে লিখছে, অর্থাৎ চিঠি লিখবে। তারপর আমাদের মত হাতজোড় করে আমাকে নমস্কার করল—গত রাত্রির নবলব্ধ বিদ্যার প্রণাম-স্বরূপ। চীনভূমির সেই শেষ দৃশ্য আমার চিরদিন মনে থাকবে—তরুণ বন্ধুর করজোড়ে সশ্রদ্ধ বিদায়-নমস্কার।

গাড়ি চলতে শুরু করলে লক্ষ করলাম বেশী দুলিয়ে একটি ফুটফুটে মেয়েকে। সে জানালা মুছছিল—পরে এসে চা দিয়ে গেল। আমাদের ইনটারপ্রেটার বললেন, ঐ মেয়ে আমাদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গল্প করতে চায়। ট্রেন ঝাড়ামোছা শেষ করে সে এসে বসল। তার কাছেই জানলাম, সে সানিয়েৎ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর ছাত্রী ; এখন বাইরে শিক্ষালাভ করছে। ক্যানটন থেকে বর্ডার পর্যন্ত, আবার বর্ডার থেকে ক্যানটনের পথেই বিদেশীদের চীনে ঢোকা ও বেরুবার ব্যবস্থা। কাজেই এই ট্রেনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ইংরেজী আলাপ-আলাপন শিক্ষার সুবিধা। মেয়েটির কাজ তাই, ইউনিভার্সিটি এখানে নির্দিষ্ট করেছে। ওর মাইনে ইউনিভার্সিটি দেবে। আগেই বলেছি, একবার ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলে তার সমস্ত খরচ সরকার বহন করে। এই মেয়েটি মিডল স্কুল অবধি পড়ে দু বছর ট্র্যাক্টর ফ্যাকটরীতে কাজ করেছে। সেখানে মাইনে পেত। তারপর তিন বছর কলেজে পড়েছে। কলেজে অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন বিদেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস-হচ্ছে। এর পর সেই ফ্যাক্টরীতে ফিরে যাবে। ন্যূনা কাজের সঙ্গে অনুবাদের কাজ করবে। হিসাব করে মনে হল এর তের বছর শিক্ষার কাল—তার মধ্যে দু বছর প্র্যাকটিক্যাল।

নূতন চীনের সীমারেখায় সুমচেন নামে শহর—সেখানে হেঁটে একটা ব্রীজ পার হয়ে ট্রেনে চড়া। সুমচেনে শেষ চীনা বন্ধু বিদায় নিলেন আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্সির একজন ক্যানটনবাসী চীনার হস্তে সমর্পণ করে। ট্রেন চলতে লাগল মধ্যবর্তী স্থান পার হয়ে। আমাদের গন্তব্য কাউলুন। ট্রাভেল এজেন্ট ভদ্রলোকটি নূতন চীনের প্রশংসা করতে লাগলেন। আমরা শুনেছিলাম, হংকংবাসীরা কমিউনিস্ট চীনের বিরোধী। পরে সেরকমও কিছু লোক দেখলাম। অবশ্য তারা নূতন চীনকে চেনেই না। অপরিচয়ই বিদ্বেষের জন্মভূমি। ইনি সর্বদা চীনে যাতায়াত করেন। ইনি নূতন চীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বললেন, আমরা চীনের জন্য গর্ব বোধ করি। এর কাছেই শুনলাম—স্বাধীনতার আগে চীনে কেবল আমদানিই হত, এখন প্রচুর দ্রব্য রপ্তানী হয়। একটা মালগাড়ি দেখিয়ে বললেন, চীন থেকে কয়লা যাচ্ছে। চীন আমদানি এখন কমই করে। নিজের চাহিদা নিজেই মেটাচ্ছে। আগে সারা বছরে একশো-দুশোর বেশী লোক যেত না। এখন এক মিলিয়ন ট্যুরিস্ট নূতন চীন দেখতে যায়। এর মধ্যে নানা দেশের লোক আছে। শুনে ভালো লাগল। তা হলে চীন বেড়াতে যাওয়া যত অসম্ভব মনে করেছিলাম তত নয়। এঁরা তা হলে বাঁশের পর্দা বা 'চিক' গুটিয়ে নিয়েছে।

ট্রেন যত চলছে ততই দু'ধারে দৃশ্য-পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষের বেশভূষা-রকম-সকমের পার্থক্য দৃশ্যমান হচ্ছে। আবর্জনার স্তূপ, কুঁড়ি এবং স্কাই-স্ক্র্যাপারের সহাবস্থান ছাড়াও বিচিত্র পোশাক ও সাজগোজের ছটায় বোঝা যাচ্ছে, এরা অন্য চীনের মানুষ।

আমরা কাউলুনে একটা হোটেলে উঠলাম। হোটেলটি বোধ হয় পঞ্চতারকা। ঘরে একটি বিরাট টেলিভিশন এমনভাবে রাখা আছে যে, আমরা দু'জনে দুটি বিছানায় শুয়ে তা একসঙ্গে দেখতে পাব।

আসবার আগের দিন আমার বিনিদ্র রাত্রি জুড়ে একটি কথাই মনে হচ্ছিল—কিছুই দেখা হল না। তাই একটা অতৃপ্তি ছেয়ে ছিল সমস্ত মন। মাত্র পাঁচ সপ্তাহ স্থান-কালে বহুব্যাপ্ত এই মহাদেশকে কতটুকু জানলাম। কত দীর্ঘদিনের ইতিহাস এই দেশের। সেই প্রাচীন কি করে নবীন হল, তার বহুভাষাভাষী বহু প্রদেশবাসী মানুষ কি করে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধা হল, তার কতটুকু বুঝলাম? পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখেছি, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মনে কি এক অশান্তি দাপাদাপি করে ফিরছে। সজ্জাবস্ত্র, ফ্যাশান, অর্থ, যৌনতা ইত্যাদিতে বাসনাতাড়িত জীবনের উগ্র চেহারা আগে এমন করে কখনো মনে পড়েনি। কারণ, যতই ভারতের ত্যাগধর্ম উপনিষদের বাণী, আধ্যাত্মিকতার কথা আলোচনা হোক না কেন, পশ্চিমের অনুকরণ এবং লোভের তাড়না এখানেও তো ক্রমে ক্রমে 'উৎকট' হয়ে উঠছে। তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা তো বিশেষ দেখিনি। তাই চীনে এসে বিস্মিত হয়েছি। চীনেরা চীনেই. তারা ইয়োরোপের সঙ্গে ভোগবিলাসিতার পাল্লা দিচ্ছে না। রকমে-সকমে ধরনে-ধারণেও তাদের ইয়োরোপীয় হবার ইচ্ছা নেই। 'বিলাতী ধরনে হাসি বিলাতী ধরনে কাশি—' এ ভাবটা লক্ষ করলাম না। এই স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস তাদের অনেকের চরিত্রে একটা স্থৈর্য এনেছে। এমন কি অল্পবয়সীদেরও। যদিও উত্তরে-প্রত্যুত্তরে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, চরিত্রমাধুর্যে ঘাটতি পড়েনি। দেশের কি আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে মানুষের পরিবর্তন ঘটিয়েই। অন্তত আমার এইরকম মনে হচ্ছিল।

কুইলীনে ব্যাঙ্কোয়েটে আমি বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন আমি এ কথাই ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওরা যে নিজেদের ধর্মে বিশ্বাসী নয় বলে, সেটা সত্য নয়। জিজ্ঞাসা করেছিলাম ধর্মের যে মূল কথা—ত্যাগ, নির্লোভতা ও সৌভ্রাত্র্য, তাই যদি তোমাদের আদর্শ হয়, তবে তোমরা ধর্মহীন কেন? দশ অনুশাসনের যে অনুশাসনটি সর্বজনগ্রাহ্য, তা হচ্ছে 'দাউ শ্যাল্ নট স্টীল,' তাই যদি তোমরা এমন করে প্রয়োগ কর, তবে তোমাদের ধর্মহীন বলা চলে না।

ক্যানটনে আসার আগের দিন এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার বেশ একটু মন কেমন করছে তাই আশ্চর্য হয়ে গিয়ে ডাকলাম—বৎসলা। তিনি বললেন—'ক'টা বেজেছে?' আলো জেলে দেখি রাত চারটে—এতরাত্রে ঘুম ভাঙাচ্ছ কেন?—দলের মধ্যে বৎসলার সঙ্গে আমার সখ্য হয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলুম, 'আমার এ-দেশ ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে। মন কেমন করছে এই বন্ধুদের জন্য। মানুষই তো দেশ। কাল আমরা অন্য জগতে চলে যাব।' তিনি তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, সেই জগৎ আবার হংকং। আমাদের যা বদ অভ্যাস হয়ে গেছে—যেখানে-সেখানে জিনিস ফেলে রাখা!'

হংকং-এর জগতে প্রবেশ করেছি হোটেল এস্টরে। ঘরে ঢুকে মাল-পত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময় লম্বা চওড়া স্মার্ট ইউনিফর্মে দুটি অল্পবয়সী ছেলে বাক্স এনে রাখল। তারপর একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'আমরা বকশিশ আশা করতে পারি কি?'

একেবারেই পারে না। কারণ, সার্ভিস চার্জ ধরাই আছে। বৎসলা বললেন, 'আমরা তো টাকা চেঞ্জ করিনি।' আমি ভাবলুম, শুরু হল আর এক জগৎ। চীনে যারা হোটেলে পরিচর্যা করত তারা ছিল ঘরের ছেলেমেয়ের মত। কেউ কোনো কলেজ থেকে এসেছে, কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে। তাদের বকশিশ দিতে গেলে তারা অপমানিত হবে। এরকম অন্য কোনো কমিউনিস্ট দেশেও নয়। চীনে এরা ভৃত্য নয়। ভৃত্যোচিত মনোভাবই নেই কারু—না যারা সেবক না যারা সেবিত।

বৎসলা টেলিভিশন চালিয়ে দিলেন। অমনি পর্দায় অর্ধোলঙ্গ নর-নারীর নৃত্যলীলা ভেসে উঠল। একটুক্ষণ দেখে আমি বললাম, বৎসলা, এতদিন আমরা রেজিমেন্টেড আর্ট নিয়ে অনেক নিন্দা করেছি: এবার তোমার আনরেজিমেন্টেড আর্ট একটু থামাও তো।' বৎসলা আর একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে দিলেন। সেখানে বিজ্ঞাপনের ধুমধাড়াক্কা শোনা গেল। অদম্য বৎসলা এবার তৃতীয় চ্যানেল দিলেন। সেখানে একটি খুনের গল্প চলেছে। টেলিভিশন বন্ধ করে আমরা চুপ করে বসে রইলাম। আমার আর বাজারে যাবার ইচ্ছা রইল না। ভারত সরকার আমাদের আটান্ন আমেরিকান ডলার দিয়েছিলেন। সেগুলো সকলেই আঁকড়ে ছিলাম—যাতে হংকং-এ কিছু জিনিস কিনতে পারি।

'বৎসলা, আমি আর দোকানে যাব না। আমার প্রবৃত্তি নেই। এখন আমার চীনের জন্য মন কেমন করছে।' আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বৎসলা স্নান করে তৈরী হতে গেলেন। ওঁর দাদাকে নিয়ে বেরুবেন। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—এবার কি আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন দেখব—যেন একটা স্লেনের সিঁড়ি বেয়ে জামাকাপড়ের বোঝা সামলিয়ে নড়বড় করতে করতে উঠছি, আর পিছনে লী আমার কনুইয়ের কাছটা ধরে উঠতে সাহায্য করতে করতে বলছে—বি কেয়ারফুল মিসেস দেবী, দেয়ার ইজ এ স্টেপ ডাউন—সাবধানে নাম, নিচে একটা সিঁড়ি আছে।

আর ঠিক তখনই আমি নিচে না তাকিয়ে উপরে তাকিয়ে দেখি, সেটা একটা মন্দিরের সিংহদ্বার। তার ওপাশ বেয়ে আমি নেমে চলে গেছি একটা বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে। সেখানে সবুজের বন্যার মধ্যে আবালবৃদ্ধ নরনারী নীল কোট পরে মাথায় স্কার্ফ বেঁধে কাজ করছে। কিংবা একটা আপেল-বাগান—যেখানে একটি বৃদ্ধ চাষীর নির্দেশে একটা গোটা স্কুলের ছেলেমেয়ে ফল পেড়ে ঝুড়িতে ভরছে। কিংবা একটা গ্রাম—যেখানে দু-একটি কলেজের ছেলের তত্ত্বাবধানে গ্রামের লোকেরা নিজেদের গ্রামে বাতি জ্বালাবার জন্য হাইড্রলিক যন্ত্র বসাচ্ছে। না, স্বপ্ন নয়। কারণ, তখন আমার প্রসুপ্তির মুহূর্ত নয়—জাগরণ ও মননের সময়। আমি জানি—মন্দিরের সৌধ একই, শুধু বিগ্রহের বদল হয়েছে। হয়তো আরো বদল হবে। কারণ, চলাই সংসারের রীতি। শুধু ভাবছি, সামনের দিকেই চলবে তো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~